উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

২৩শ বর্ষ।

(১৩২৭ মাঘ হইতে ১৩২৮ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক [illegible] টাকা।

বন্ধ লেখিকা পৃষ্ঠা

উ

।—'ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্য ৫৭৩

ললিত ৯২

ক

।প্রসঙ্গে—২২, ৬৫, ১২৯, ১৯৩, ২৫৭, ৩২১, ৩৮৫, ৪৪৯, ৫১৫, ৫৭৭, ৬৪৬, ৭০৫

। কার্পাস চাষ স্বামী কেশবানন্দ ৬৯১

. কে তুমি (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু ৪৬৪

। কেশব সেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ ৫৫৯

গ

। গকুল তনয়া দেবী ঠাকুরান্ দাসী (কবিতা)—শ্রীম— ১০৪

। গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া—ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্, বি—৯৩

। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার ৬৯৮

। গৌতম বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য—শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার ৫৮৪

জ

জীবন্মুক্তি-বিবেক—পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় (অনুবাদক) ৩০৭, ৩৬৫, ৫৬৪, ৬২৫, ৬৭৮, ৭৫১

ঝ

। ঝড়ের তরী (কবিতা)—ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য ৩৪১

ত

তপস্বিনী রাবেয়া (জীবনী)—ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্য ৭৪২

তুমি ও আমি (কবিতা)—ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্য ৩৪৮

দ

দিব্য দর্শন (কবি .) শ্রীসাহাজি ৫৮৭

ধার গর্ব্ব (ক ,)—শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় ৫৩

শের কথা—স্বামী . কশবানন্দ ও ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্, বি—১৫৪

সূচী

(উদ্বোধন ২৩শ বর্ষ—মাঘ ১

বিষয় লেখক-লে

অ

১। অচেনা বন্ধু শ্রীসাহাজী
২। অদ্বৈতবাদ ও ব্যবহারিক প্রামাণ্য—অধ্যাপক শ্রীসুধেন্দুকুমার এম, এ—
৩। অনন্তের পথে (কবিতা) ধ্রুব ২
৪। অস্তবালের কথা (কবিতা)—বিমলানন্দ ১
৫। অন্তর্দেবতা (কবিতা)—স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ ৫
৬। অবতরণ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় ১
৭। অন্তিম কামনা (কবিতা)—শ্রীমতী মলিনাবালা দাসী
৮। অবাঙ্মনসোগোচরম্ (কবিতা)—ব্রহ্মচারী অনন্দচৈতন্য ৩
৯। অব্যক্ত (কবিতা) ধ্রুব ৮
১০। অভিনন্দন শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়
১১। অশ্রুর আক্ষেপ (কবিতা) বিমলানন্দ
১২। অসীম ও সসীম (কবিতা) শ্রী—

আ

১৩। আগমনী (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়
১৪। আমরা ও আমাদের ধর্ম্ম পথিক
১৫। আলো কবিতা)—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
১৬। আহ্বান স্বামী জ্ঞানানন্দ

ই

১৭। ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস—শ্রীক্যান[illegible] পাল, এম. বি, এ
১৮। ইচ্ছা সৃষ্টি (কবিতা)—ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্য

বিষয়	লেখক লেখিকা	
	ধ	
৩৬। ধর্ম্মপথ	শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৬
৩৭। ধর্ম্মের নবযুগ—শ্রীমতী সত্যবালা দেবী		৪৮৩
	ন	
৩৮। নববর্ষ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৩১
৩৯। নবীনের কথা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	১০৭
৪০। নেপোলিয়ন	শ্রীসুব্রহ্মণ্য মিত্র, বি, এ	৬৬
	প	
৪১। পথের কথা	শ্রীমতী সত্যবালা দেবী	২৪৪
৪২। পড়ে থাক (কবিতা)—ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্য		৩২৫
৪৩। পরমহংস দেবের সহিত স্বামীজির সাক্ষাৎ—স্বামী অদ্ভুতানন্দ		২২৬
৪৪। পূজার আনন্দ—শ্রীঅজিতকুমার সরকার		৬৪৮
৪৫। প্রত্যাবর্ত্তন (গল্প)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ		৩৫৬
৪৬। প্রেমানন্দের পত্র		৬১
৪৭। প্রহেলিকা (কবিতা)	বিমলানন্দ	৭১
	ব	
৪৮। বদরী পথে শঙ্কর (জীবনী)—শ্রীমতী—		৭৯, ১৭৮
৪৯। বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বাসুদেবানন্দ—৭২, ১৪৪, ২০৫, ২৬৫, ৪৫৫		
৫০। বাউল সঙ্গীত (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু		৬৫৭
৫১। বাঙ্গালা সাহিত্যে সংযম—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ		৬২৭
৫২। বিবেকানন্দের মানসী নারী—শ্রীমতী সত্যবালা দেবী		৪৪
৫৩। বিবেকানন্দের পত্র—৫৪, ৬৯, ১৬১, ২১৩, ২৬২, ৩২৯, ৪১০, ৪৬৫, ৫৪১, ৫৯৯, ৬৫৮, ৭০৯		
৫৪। বিবেকানন্দ স্মরণে (কবিতা)—শ্রী[illegible]নল মুখোপাধ্যায়		১৬৪
৫৫। বিবেকানন্দ	শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার	১৬৬

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
৫৬। বিবেকানন্দ (গান)	প্রসাদ	২৩০
৫৭। বিবেকানন্দ	শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার তত্ত্বনিধি, বি, এল্	৪৭১, ৫৩১
৫৮। বিবেকানন্দ স্মরণম্ (স্তোত্রম্)	শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য	৫৯১
৫৯। বিশ্বজনীনতা	শ্রীসুব্রহ্মণ্য মিত্র, বি, এ,	৫৯৩
৬০। বিবেকানন্দ স্তোত্রম (স্তোত্রম)	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বি, এ,	৬০৩
৬১। বিবেকানন্দ ও ধর্ম্ম	ব্রহ্মচারী অখণ্ডচৈতন্য	৬০৫
৬২। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম	শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	৪১৫
৬৩। বেদান্তচর্চ্চা	অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	৫২১
৬৪। বেদান্তচর্চ্চা (প্রতিবাদ)	শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী	৭৪৪
৬৫। বৈদিক ভারত	বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন	২৭০, ৩৩৪
ভ		
৬৬। ভারতের আদর্শ	স্বামী নির্ব্বাণানন্দ	৫৫৪
৬৭। ভারতীয় সমস্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ	বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন	৬৫২, ৭১৪
৬৮। ভূমার সন্ধানে	পথিক	১৯৭, ২৮০
৬৯। ভ্রম সংশোধন		১২৮
ম		
৭০। মনুষ্যত্বের সাধনা	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী	৪১, ৮৩, ১৭৫, ২৩৬, ২৯৫, ৩৪২, ৪৩০, ৪৭৮
৭১। মহিলা শিক্ষা-গোষ্ঠী	শ্রীমতী সত্যবালা দেবী	৩৮১, ৪৮৪
৭২। মায়ার খেলা	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	২২৩, ২৮৯
৭৩। মাতৃজাতির প্রতি (কবিতা)	দুলাল	২৫০
৭৪। মুক্তির খেয়াল (কবিতা)	বিমলানন্দ	৮৬
য		
৭৫। যোগমায়া	শ্রীসাহাজি	১৫৬

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
র		
৭৬। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য		১৮৩, ৪৪৮, ৫১২, ৫৭৫. ৭৬৫
শ		
৭৭। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্	শ্রীশস্ত্রপাণি শর্ম্মা	৭২১
৭৮। শান্তি (কবিতা)	স্বামী বিবেকানন্দ অনুবাদক শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১৩২
৭৯। শান্তি-অন্বেষণে	স্বামী নির্ব্বানানন্দ	৬৯৪
৮০। শিক্ষা-মন্দির	স্বামী বাসুদেবানন্দ	২৯
৮১। শিক্ষাদান প্রণালী (উদ্ধৃত)		১১৮
৮২। শিশুর অকাল মৃত্যু	ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম, বি	১০০
৮৩। শ্রীশ্রীসারদা মন্দির প্রতিষ্ঠা ও জন্মতিথি পূজা		৭৪৪
স		
৮৪। সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়		১২০, ১৯১, ২৪৯, ৩১৭, ৩৭১, ৩৪৪, ৪৯৭, ৫৬৮, ৬৩২, ৭০১, ৭৬২
৮৫। সৎ কথা	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	৫৬১, ৬২১ ৭৫৮
৮৬। সাধু সঙ্গ	দুলাল	৪৩১, ৪৯২
৮৭। সিষ্টার নিবেদিতা-বালিকা বিদ্যালয়		৬৩৭
৮৮। সুখের কথা	শ্রীমতী সত্যবালা দেবী	৪২৪
৮৯। সেবা	বিশোক	৮৬, ১৮২
৯০। সংবাদ ও মন্তব্য		৬১, ১২৭, ১৯২, ২৫৪, ৩২০, ৩৮৩, ৪৪৭, ৫৭২, ৭০২
৯১। স্বপ্ন ভঙ্গ	শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত, বি, এ	২৩৯, ৩৪৯
৯২। স্বপ্নভঙ্গ (প্রতিবাদ)	শ্রীঅজিতনাথ সরকার	৫৪৭, ৬৭০
৯৩। স্বরাজ্য-পথিক	শ্রীননীগোপাল ব্রহ্মচারী	৭৩৫

নববর্ষ।

ভারতীয় সনাতন সাধনার বহুধাবিভক্ত মত বৈচিত্র্যে ও সাধনা-বৈচিত্র্যের দ্বন্দ্বসংঘর্ষে জাতির ম্রিয়মান স্বধর্ম্মের আদর্শ যখন হীনপ্রভ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহাশঙ্কটের সময় শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই মহাযজ্ঞের মহাভাগ ঋত্বিক্ স্বামী বিবেকানন্দ,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—এই বেদবানী উচ্চারণ করিয়া 'উদ্বোধনের' প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন—সে আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বের কথা! ভারতের তথা জগতের সর্ব্বপ্রকার সাধনা ও মতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে রক্ষা করিয়া এক উদারতম প্রশস্ততম মহাদর্শকে মানব-জাতির সম্মুখে স্থাপন করিবার এই সুমহান্ প্রয়াসের জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া বিবেকানন্দ 'উদ্বোধনের' প্রস্তাবনায় বলিয়াছিলেন—

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ!"

বাহ্য দৃষ্টিতে প্রতিভাত ভারতের জরাজীর্ণ স্থবিরত্বের আবরণখানি ভেদ করিয়া বিবেকানন্দের ধ্যানস্তব্ধ অধ্যাত্ম দৃষ্টি তাহার ভিতরের রূপটী দেখিয়াছিল, তাই ভাবানন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতেছি ভারতবর্ষ যুবাবস্থ!" তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ভারতের অন্তর্নিহিত এই যৌবনশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়াছে, ইহার জাগরণ আসন্ন। তরুণ যৌবনের এই দুর্নিবার গতিবেগ যদি অদম্য কর্ম্মচাঞ্চল্যকে ধারণ করিতে না পারিয়া বিকৃতপন্থায় আত্মঘাতী অভিসারে যাত্রা করে, তাহা হইলে এই নব অভ্যুদয়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।—তাই জাতির এই প্রস্ফুরিত শক্তিপ্রবাহকে

তিনি সেবাধর্ম্মের বিলুপ্তপ্রায় সনাতন খাতে প্রবাহিত করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অপরিহার্য্য নেতৃত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চাহিয়াছিলেন এক সহস্র ত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক—যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উত্তেজনা-শূন্য হইয়া জাতির এই বলদর্পিত জাগরণের উশৃঙ্খল ও উদ্দামবেগকে সংযত ও সংহত করিয়া প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিবেন।

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনায়' জাতীয়-জীবন-সমস্যার কথা প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব, পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনের' জীবনোদ্দেশ্য।"

* * * *

"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নিস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান দিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া, সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।"

এই নিরহঙ্কৃত কর্ত্তব্যের সাধনায় ব্রতী হইয়া 'উদ্বোধন' আজ ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। যতই দিন গিয়াছে, সমস্যা ততই জটিল হইতে জটিলতর হইয়াছে। চারিদিকে বিভিন্নপ্রকার ভাব ও আদর্শের কর্কশ বাদানুবাদ ও বিতণ্ডা—অথচ [illegible] দেখিতেছি, লেখনী ও জিহ্বা প্রকৃত কর্ম্মকে পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বহ্বাড়ম্বরের এই প্রাচুর্য্যের দিকে আমরা সকল মতের সকল সম্প্রদায়ের সুধীবৃন্দের দৃষ্টি স্বামীজির উপরিধৃত বাক্যের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি, তাঁহারা অগ্রসর হউন—[illegible]

বিপর্য্যয়ে বিভ্রান্ত না হইয়া জাতি যাহাতে দৃঢ়পদে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। তাহা হইলেই "উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য" সফল হইবে।

নববর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই 'উদ্বোধন' এই পুরাতন কথা নূতন করিয়া শুনাইতে চায়—কেননা, পুরাতন ছাড়া আর কিছু নূতন পাইবার উপায় নাই! যে দিন ভারতীয় সাধক ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া অদ্বৈতানুভূতিরূপ মহাতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই নূতন শেষ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার কবিগুরুও তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু,
কোন দিন কোন গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।"

—তাই নূতনের আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলে চারিপাশে অন্ধকার গাঢ়তর হইবে মাত্র। বৃথা সন্দেহের জঞ্জাল ও চিন্তার জটিলতা আনিয়া জাতীয়-জীবন-সমস্যাকে ভারাক্রান্ত করিয়াও কোন লাভ নাই। কেননা, সাদা চোখেই দেখিতে পাইতেছি, একটা জাতি ক্ষুধার জ্বালায় মরণোন্মুখ। কোটী কোটী মানুষ তাহাদের কঙ্কালসার অস্তিত্ব লইয়া, দৈন্যের দায়ে, পেটের জ্বালায় পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে,—অভাবের পীড়নে জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। খাইতে না পাইলে মানুষ বাঁচে না—সর্ব্বাপেক্ষা সহজবোধ্য এই সত্যটী বুঝিতে হইলে কোন তর্কযুক্তির আবশ্যক হয় না।

এক্ষণে প্রতীকার কি? সার্ব্বজনীন ধ্বংসের এই মহাশ্মশানে কোন্ বীরহৃদয় সাধক সৃষ্টি-ক্রীড়ায় নিযুক্ত? কে আছ বাঙ্গালায় দুঃখব্রত সাধক। জাতির এই মহাদুর্দ্দিনে একবার, দরিদ্র, অজ্ঞ, উৎপীড়িত, পতিত সকলকে ভাই বলিয়া আশ্বাসবাণী শুনাইবে? দুঃখের জন্যই দুঃখভোগ মানুষকে দীন হীন কাপুরুষ করিয়া ফেলে—কিন্তু যেখানে দুঃখ ত্যাগের অটল-নির্ভর কাঠিন্যের পাষাণ বেদীর উপর দাঁড়াইতে পারে, সেইখানেই দুঃখের যা কিছু মহিমা, যা কিছু

সার্থকতা ! অতএব এই দেশব্যাপী দুঃখের পদতলে আত্মসুখলিপ্সা বলি দিয়া প্রমাণ করিতে হইবে—বাঙ্গালীর লক্ষ্য মহৎ, তাই দুঃখও মহৎ।

জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাত হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কথাই 'উদ্বোধন' নানাভাবে বলিয়া আসিতেছে। 'সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট কোটী কোটী নরনারীর' পক্ষ সমর্থন করিয়া 'উদ্বোধন' কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। দেশের নানা ভাব-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও শ্রীভগবানের কৃপায় এ পর্য্যন্ত 'উদ্বোধন' লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। দেশের ও দশের সেবায় এই অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের বার্ত্তা লইয়া উদ্বোধন নববর্ষে পদার্পণ করিল,—সমভিব্যাহার সহায়—নিঃস্বার্থ সেবা, ভরসা—শ্রীভগবানের করুণাকর সম্পাত।—তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক ॥

ওঁ সহনাববতু সহনৌভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈঃ ।
তেজস্বিনা বধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ । হরি ওঁ ॥

"শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন ?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। * * আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। * * শক্তির কৃপা না হলে কিছুই হবে না।"

"এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর,—এইত সবে আরম্ভ।"

"আমাদের সর্ব্বদাই জানা উচিত যে পরোপকার করিতে পাওয়া এক মহা সৌভাগ্যের কার্য্য। * * যে প্রতিগ্রহ করে সে ধন্য হয় না—দাতাই ধন্য হয়।"

"সমুদয়ই ঈশ্বরে সমর্পণ কর।"

"এই সংসাররূপ অগ্নিময় তপ্তকটাহে—যেখানে কর্ত্তব্যরূপ অগ্নি সকলকে ঝলসাইয়া ফেলিতেছে—তথায় এই ঈশ্বরার্পণ-রূপ অমৃতপাত্র পান করিয়া সুখী হও।"

আমরা ও আমাদের ধর্ম্ম।

(পথিক)

সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, উৎসবে ব্যসনে, মানুষের যখন যাহা ঘটে তৎসমুদয়ই সর্ব্বগ্রাসী কালের বিপুল আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায়। মানুষ আবার হাসে কাঁদে নাচে গায়, জগৎটা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকে। সবই যায়, সুখের দিন যাইয়া দুঃখের দিন, আবার দুঃখের দিন কাটিয়া সুখের দিন আসে। কালের অচিন্ত্য প্রভাবে লক্ষপতিও পথের ভিখারী হয়, আবার চিরদুঃখিতের কাতর নয়নেও সুখের চঞ্চল হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু মানুষের এই সমস্ত অবস্থা বিপর্য্যয় কালের যবনিকার অন্তরালে অপসৃত হইলেও উহারা তাহার হৃদয়ফলকে অভিজ্ঞতার যে সুগভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া যায় তাহা লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া যাহার 'আক্কেল' হয়, সংসারে সেই মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। কিন্তু দেখিয়া বা ঠেকিয়াও যাহার শিক্ষা হয় না, নিজের বা পরের অতীত ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারাও যে নিজের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না—স্রোতের তৃণের মত জগতের বিচিত্র ঘটনাস্রোত দ্বারা তাড়িত হইয়া জড়ের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াই যে সন্তুষ্ট হয়, তাহাকে 'মানুষ' বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় মাত্র। কারণ, যে বিচার শক্তি বলে মানুষ ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা আর কিছুই নহে—অতীত ও বর্ত্তমান দশটা ঘটনা দেখিয়া-শুনিয়া তাহার তত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক কার্য্য-কারণ সহায়ে তাহাদের অন্তর্নিহিত মূল তথ্যটি আবিষ্কার করিয়া তদবলম্বনে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করা। সেই মূল সত্য অবলম্বনে জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই মানুষ ক্রমে মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

আমাদিগের নিজের ও জগতের অন্যান্য জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে আমরা যে মূল তথ্য

আবিষ্কার করিতে পারি, তাহার সহায়ে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে—আর যাহা কিছু হইবার আগে আমাদিগকে হইতে হইবে 'মানুষ'। ব্যষ্টিকে অবলম্বন করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব জাতির ভিতর গড়িয়া না উঠিলে আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিবার নহে। ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ, পুরুষ স্ত্রী, সকলকেই আজ যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের জন্য নীরব সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। স্বার্থপরতার গভীর তিমিরজালে যাহার হৃদয়কন্দর চির-আচ্ছাদিত—প্রেম, সমপ্রাণতা ও একাত্মবোধের অমৃতবারি সিঞ্চনে যাহার দেহ-মন পবিত্র হয় নাই—দেশের, দশের বা জগতের কল্যাণ সাধন করিবার কথা তাহার পক্ষে একটা কথার কথা মাত্র। তাই আগেই আমাদিগকে হইতে হইবে 'মানুষ'।

অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মনুষ্যত্বের উচ্চতম ধারণা আবার সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ভোগ-সুখের চূড়ান্ত পারিপাট্য, দৃশ্য প্রপঞ্চের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণপটুতা, উচ্চ দার্শনিক চিন্তার চমৎকারিত্ব, অথবা ক্ষমতার লোকভয়ঙ্কর দৃপ্ত আস্ফালন—কিছুই এদেশে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও কখন পারিবে না। আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে, স্মরণাতীত কাল হইতে, সর্ব্বভূতে সেই এক পরমতত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভব লাভ করিয়া সর্ব্বভূতে আত্মবোধ করতঃ সকল প্রকার অবস্থা-বৈচিত্র্যের ভিতর প্রশান্ত সাগরের মত অক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থান করাই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মুকুটমণিস্বরূপ গীতাশাস্ত্রে সর্ব্বত্র মনুষ্যত্বের এই সর্ব্বোচ্চ আদর্শটিকে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করিয়া সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করতঃ নানা ভাবে তাহা লাভ করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন :—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ (১৩৷২৮,২৯)

অতএব কায়মনোবাক্যে এই অধ্যাত্মদৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে তেজস্বী, বীর্য্যবান্, নিঃস্বার্থ ও উদারস্বভাব হইতে হইবে। ইহাই আমাদের ধর্ম্মের মূল সূত্র; এই সমদর্শিতার উপরই আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই চরম মনুষ্যত্ব—এই মনুষ্যত্বের উপর ভর করিয়াই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে।

এইরূপ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিলে যে ভাল হয়—তাহা যে আমরা একটু একটু না বুঝিতেছি এমন নহে, কিন্তু সর্ব্বত্র সেই একই সমস্যা, একই প্রশ্ন—'ধর্ম্মকর্ম্ম করি কখন? পেটের চিন্তা, কন্যাদায়, রোগ, মহামারী প্রভৃতি মৃত্যুর অনুচরগণ যে সর্ব্বদাই ঘিরিয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কি আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা চলে?—কে আজ এ বিষম সমস্যার সমাধান করিবে? কে বলিয়া দিবে—উদরান্নের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মীলে, কলে, আফিসে, আদালতে, কারখানায়, আড়তে, ঘুরিয়া বেড়াইব—অথবা পুত্র-কন্যা-স্বজন-বান্ধবের রোগক্লিষ্ট, অনশনকাতর, ক্ষীণ কণ্ঠের অস্ফুট আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া মহাযোগীর মত যোগাসনে বসিয়া থাকিব? কে আছ বলিয়া দাও—এবার প্রাণ বাঁচাই, কি ধর্ম্মে মন দেই?' আধ্যাত্ম-বাদী স্বদেশ প্রেমিক গম্ভীরভাবে বলিলেন—'আত্মস্থ হইয়া, অর্থাৎ কি না, আত্মার প্রেরণায় কর্ম্ম করিয়া যাও।'—'কিন্তু এমন যে সম্পূর্ণ 'উদরস্থ' হইয়া পড়িয়াছি। আত্মার প্রেরণা কাহাকে বলে তাহা ত বুঝি না, উদরের প্রেরণাই বিশেষ করিয়া বোধ করিতেছি—আত্মস্থ হই কেমন করিয়া?' জড়বাদী স্বদেশ-হিতৈষী স্পষ্টভাবে আদেশ করিলেন—'ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই দেশটা রসাতলে যাইতে বসিয়াছে; ধর্ম্ম-কর্ম্ম চুলায় যাক্, যেমন করিয়া পার অবস্থার উন্নতি কর, চাষ কর, কারখানা কর, বাণিজ্য কর—ধর্ম্মের বন্ধন, সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেল, সভা-সমিতি, আন্দোলনের চূড়ান্ত কর, তবেই বাঁচিবে।'—'ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সে ত অনেক-দিনই আপনা হইতেই চুলোয় গিয়াছে,—দোল গিয়াছে, দুর্গোৎসব গিয়াছে, দান গিয়াছে, ব্রত গিয়াছে, হিন্দুয়ানীর একটু শেষ সম্বল যা' ছিল

গৃহদেবতার সামান্য নিত্য পূজা—তাহাও গিয়াছে। ভগ্ন দেউল পুনঃ-সংস্কার করিবার ও নিত্য চাল-কলা যোগাইবার অর্থাভাবে, অগত্যা গৃহদেবতাকেও মা গঙ্গার বক্ষে মহাসমাধিতে মগ্ন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি! ব্রাহ্মণের ছেলে, পুত্র-পরিজনের কাতর ক্রন্দনের প্রভাতি সুরের করুণ মূর্চ্ছনা কানে পৌছিবার পূর্ব্বে ভোর না হইতেই উদরান্নের চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িতে হয়, গায়ত্রী জপটাও হইয়া উঠে না—আর পেটের চিন্তায় বিশ্বাসও পালাইয়াছে।—তার পর চিন্তাক্লিষ্ট, অনশন-কাতর ভগ্ন-শীর্ণ দেহ রাত্রিতে জীর্ণ কন্থায় লুটাইয়া পড়ে ও দুঃস্বপ্নের দারুণ বিভীষিকায় রাত্রি কাটিয়া যায়। আর সমাজের বন্ধন!—আমি সমাজের কে যে আমি ছিন্ন করিতে চাহিলেই তাহা ছিন্ন হইবে? গরীবের আর্ত্তনাদ সমাজের কাণে পৌছায় কৈ? তারপর কাজকর্ম্মের কথা—তারও চেষ্টার বিরাম নাই; চাষের জমীর চেষ্টায় জমীদারের পাইকের গলাধাক্কা খাইয়া আসিয়াছি, চাকুরির চেষ্টায় আফিসে, দপ্তরে অথবা বড়লোক ব্যবসায়ীর দ্বারে ঘুরিয়া লাভ হইয়াছে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, আবার কখনও বা বঞ্চনা! ব্যবসায় করিবারই বা মূলধন কোথায়? গরীবের দিকে মুখ তুলিয়া চায় এমন ধনী মহাজন একটিও দেশে নাই। সভা সমিতিতেও কখনও কখনও যোগদান করিয়াছি, প্রসিদ্ধ প্রায় সকল নেতারই বক্তৃতা শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি—উদরেন্দ্রিয় (দার্শনিক, মার্জ্জনা করিবেন, উদরকে ইন্দ্রিয় বলিয়া ফেলিলাম!) কিন্তু তাহাতে কুপিতই হইয়াছেন। নেতাদের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করিয়া উদরান্নের একটা সংস্থান করিয়া লওয়া যায় কিনা সে চেষ্টাও যে না করিয়াছি এমন নহে—কিন্তু তাঁহারা দেশের কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, আমার দুঃখের কথা শুনিবার তাঁহাদের অবসর কোথায়?'

এই ত হইল দেশের অবস্থার সংকিঞ্চিৎ। এমতাবস্থায়, ধর্ম্মকে অবলম্বন না করিলে আমাদের উন্নতি অসম্ভব—এ কথা মনে বুঝিলেও কার্য্যতঃ তাহার অনুষ্ঠান যে কতদূর সম্ভব, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তবে যদি এমন কোনও ধর্ম্ম থাকে—যাহা ক্ষুধার্ত্তের দারুণ জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতে সহায় হয়, তাহা,

দীনের প্রতি ধনীর সহানুভূতি সঞ্চার করিতে পারে, যাহা দুর্ব্বলের প্রতি সমাজের উৎপীড়ন নিবারণ করিয়া সমাজকে যথার্থ মনুষ্যত্ব গঠনের যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়, যদি এমন ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়—যাহা নিরাশায় দগ্ধহৃদয়, রোগ-শোক-দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত, উপেক্ষা অত্যাচারে প্রপীড়িত ও মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্য প্রসারিত বাহু কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ে আশা, উৎসাহ, সাহস ও বলের সঞ্চার করিতে পারে, তবে তাহারই সন্ধান আজ দেশবাসীকে বলিয়া দিতে হইবে—তাহারই সাধনায় দেশবাসীকে উৎসাহিত করিতে হইবে—তাহাতেই সিদ্ধিলাভের সাহায্যার্থ বক্ষ পাতিয়া দিতে হইবে। অবশ্যই এ কথা যেন এখানে কেহ মনে না করেন যে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইতে আমরা এক পদও বিচলিত হইব। আমরা অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, উদ্দেশ্যকে খর্ব্ব করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টায় প্রায়ই উদ্দেশ্যকে গৌণ আর উপায়কেই মুখ্যভাবে গ্রহণ করার দোষ আসিয়া পড়ে। তাহা দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। আমরা যাহা হইতে চাই তাহা আমাদিগকে হইতেই হইবে,—তবে যে সকল বাধাবিঘ্ন তাহা হইবার পথে অন্তরায় জন্মাইতেছে, তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া উদ্দেশ্যলাভ সহজসাধ্য করিয়া লইবার জন্য, এমন ভাবে উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে—যাহাতে উদ্দেশ্যও পঙ্গু না হইয়া পড়ে অথচ বিঘ্নও দূরীভূত হয়। সে উপায় উপায়ই নহে—যাহা বিঘ্নসমূহকে গণনা না করিয়াই উদ্দেশ্যলাভে প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে উভয়দিক্ যথাযথ বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই নীতিশাস্ত্রে—উপায় প্রয়োগের কৌশল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, যদি এমন কোনও উদ্দেশ্য-সম্মত উপায় থাকে—যাহা আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিয়া আমাদিগকে যথার্থ কল্যাণের দিকে চালিত করিতে পারে—তবে তাহারই অনুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

মানুষের যখন দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়, তখন ক্রমান্বয়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হইয়া প্রথমেই সে হারায় তাহার আত্মবিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে

তাহার দুর্দ্দশাও গভীর হইতে গভীরতর হইয়া, মানুষের ভগ্ন আকারটি মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, তাহাকে দুর্ব্বলতার একটি জীবন্ত বিগ্রহরূপে পরিণত করিয়া দেয়। কিন্তু অদৃষ্টবিপর্য্যয়ের সূত্রপাতেই যাঁহারা হৃদয়ের বল হারাইয়া বসেন না, সামান্য ব্যর্থতায়ই যাহাদের অদম্য উৎসাহ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না—সুখ দুঃখ জোয়ার-ভাটার মত কখনও আসে কখনও যায়, ইহাই যাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—মোটকথা এই জীবনটাকে বাহিরের কতকগুলি ঘটনার একটা বিশৃঙ্খল সমবায় বলিয়া মনে না করিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এইগুলি ছাড়াও তাঁহাদের একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আছে—সুখদুঃখ ব্যাপারটা উহারই উপর আবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র—তাঁহারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা সহসা দুর্দ্দশাতে পতিত হয়, প্রথমেই তাহারা এতটা ব্যাকুল হইয়া পড়ে যে, তাহাদের মন দুঃখের চিন্তাতেই সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া যায়। কল্পনার সহায়ে দুঃখের একটা দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া ক্রমাগত তাহারই চিন্তায় তাহারা এমন একটা আড়ষ্ট জড়ভাব প্রাপ্ত হয় যে, দুঃখের পারে যাইবার কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবন করা ত দূরের কথা—কেহ উপায় বলিয়া দিলেও যথাযথরূপে তাহার অনুষ্ঠান করা তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া পড়ে। বসিয়া বসিয়া দুশ্চিন্তা ও 'হায় হায়' করা ব্যতীত আর যে কোনও উপায় থাকিতে পারে—একথা তাহাদের দুর্ব্বল মন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এইরূপ দুশ্চিন্তায় ক্রমাগতই তাহারা শক্তিক্ষয় করিতে থাকে, আর সেই দুর্ব্বলতার ছিদ্র পাইয়া দুঃখ-দৈন্যের অগণন অনুচরগণ একে একে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহার রক্তপানে উন্মত্ত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। দুর্দ্দশার সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুশ্চিন্তাগুলিই ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হইয়া যায়,—অথচ যে ক্ষীণ আশাটুকু লইয়া মানুষ একটু নড়াচড়া করে, তাহাও আর পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—মানুষ ক্রমাগত গভীরভাবে যেরূপ চিন্তা করিতে থাকে বাস্তবও সেই আকার ধরিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

বস্তুতঃ, আমরা যাহাকে বাস্তব আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি তাহা চিন্তা-শক্তিরই অভিব্যক্ত-অবস্থামাত্র। মানুষ চিন্তা করিল—'আমি আকাশে উড়িব',—ক্রমশঃ সেই ভাসা-ভাসা চিন্তাটি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি মনেরই অনুচর মাত্র—মনের সেই সাগ্রহ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিশাল ব্যোমযানের সৃষ্টি করিয়া লইল। এইরূপে সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বাস্তবের আকার ধারণ করিয়া থাকে। দুঃখের চিন্তাও তদ্রূপ। বালক হয়ত চিন্তা করিল—'এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।' ক্রমশঃ চিন্তাটি গভীরতর হইয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল—পাঠ্য-পুস্তক দর্শনমাত্রেই সেই চিন্তার উদ্দীপনা হইয়া তাহার পাঠের প্রযত্ন শিথিল করিয়া দিতে লাগিল, যদি বা সে পুস্তক খুলিয়া বসিল, তথাপি মন স্থির করিতে পারিল না—তাহার পাঠ তৈয়ার হইল না, ফলে, যেমন চিন্তা কাজেও তেমনি হইল। আবার একজনের চিন্তা-শক্তি অপরের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে, বর্ত্তমান সম্মোহন-বিদ্যা প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। সুতরাং একজনের গভীর চিন্তা তাহার পারিপার্শ্বিক জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহাকে যে অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া তুলিতে পারে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। যাহা হউক, দুঃখদৈন্যকে 'আগম ও অপায়শীল' জানিয়া আমরা যদি তাহার চিন্তায় এতটা বিচলিত না হই, তবে দুঃখ-দৈন্যও আমাদের নিকট ততটা ভীষণ আকারে উপস্থিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, দুশ্চিন্তা দ্বারা বাস্তব অবস্থার কোন প্রতিকার না হইয়া বরং অনিষ্টের মাত্রাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রিয় পুত্রের পীড়া হইল—জননীর হৃদয়ে অমনি কত অমঙ্গলের আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি হয়ত তাহাতে এতটা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে পুত্রের ব্যাধি-শান্তি করা ত দূরের কথা—নানা প্রকারে তিনি পুত্রের যথাযথ চিকিৎসা-শুশ্রূষাদির বিঘ্নোৎপাদনই করিতে লাগিলেন।—আর সূক্ষ্ম

ভাবে পুত্রের অমঙ্গল চিন্তায় তন্ময় হইয়া, অজ্ঞাতসারে তিনি সেই অনিশ্চিত অমঙ্গলটিকেই মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ক্রমাগত দুঃখের চিন্তা দ্বারা আমরা দুঃখের কোনও প্রতিকার না করিয়া, উহাকে আরো গভীরতর করিয়া তুলি।

এই দুর্ব্বলতাই আমাদের জাতীয় অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নানা প্রকার বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থাই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটিয়াছিল বলিয়াই নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, বাহিরের অবস্থাই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছে, অথবা আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি বলিয়াই বাহিরের অবস্থা প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এ কূট প্রশ্নের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি এবং দুর্ব্বল হইয়াছি বলিয়াই নানারূপে বিড়ম্বিত হইতেছি। এই দুর্ব্বলতার প্রতিকার আমাদিগকে করিতেই হইবে। অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইলে প্রথমেই লইয়া আসিতে হইবে সেই ওজঃ—যাহার অভাবেই জাতি ও ব্যক্তির ক্রমশঃ অধঃপতন ঘটিতেছে।

পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মানুষের ভিতর যখনই যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাহির হইতে আসে না—উহা তাহার ভিতরেই ছিল। বিশেষ বিশেষ বংশে জন্ম, বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর অবস্থান ও বিশেষ প্রকার শিক্ষা দ্বারা এই সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে মাত্র। সেই অন্তর্নিহিত শক্তিটিকে যে যত স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারে, সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করা তাহার পক্ষে ততটা সহজসাধ্য হয়। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বংশ বা বিভিন্ন ব্যক্তি সেই শক্তিটিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া নানা প্রকারে শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। বুদ্ধ ভূতানুকম্পারূপে, শঙ্কর জ্ঞানরূপে,

শ্রীচৈতন্য প্রেমরূপে উহাকে অনুভব করিয়াছিলেন; আবার ঐ শক্তিকেই নেপোলিয়ান সমরকুশলতারূপে ও কালিদাস কবিত্বশক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমাদের বৈদিক ঋষিগণ স্মরণাতীত কাল হইতেই এ সত্য অবগত ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা ধনার্থীকে ঐশ্বর্য্যরূপে, বীর্য্যার্থীকে বীর্য্যরূপে, জ্ঞানার্থীকে জ্ঞানরূপে এবং মোক্ষার্থীকে মোক্ষরূপে সেই শক্তিকেই অবগত হইতে উপদেশ করিয়াছেন। আমাদের জীবনে আজ অভাব হইয়াছে শক্তির—নানা প্রকার অবস্থাচক্রের দারুণ নিষ্পেষণে আজ আমরা আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা আমাদিগকে হীন, দুর্ব্বল, পদদলিত, লাঞ্ছিত, পথের কাঙ্গাল ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারিতেছি না, আর ভাবিবই বা কেমন করিয়া,—বাহিরের দিকে তাকাইলে আপনাকে স্বাধীন, মুক্ত, বীর্য্যবান্ বলিয়া ভাবাটা যেন দারুণ উপহাস বলিয়া মনে হয়। যাহার পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, খাইতে-শুইতে-বসিতে যাহাকে পরের মুখ তাকাইয়া চলিতে হয়, তাহাকে স্বাধীন, মুক্ত অথবা বীর্য্যবান্ বলিয়া চিন্তা করিতে বলাটা কি তীব্র বিদ্রূপ নহে?—কিন্তু তা বলিয়া কি আমরা চিরদিনই এমনি করিয়া নিজেদের হীন দুর্ব্বল ভাবিয়া ক্রমাগতই দুর্ব্বল হইয়া যাইব? আমাদের আশে পাশে, ভিতরে বাহিরে, এমন কি কিছুই নাই—যাহার দিকে তাকাইলে আমরা এ দুর্দ্দিনেও একটু বল, ভরসা পাইতে পারি? আমাদের ধর্ম্ম উপনিষদ্‌মুখে দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন—'নিশ্চয় আছে, বল ভরসার জন্য তুমি বৃথা বাহিরে অনুসন্ধান করিতেছ; সমস্ত বলের আধার, সমগ্র আনন্দ ও সুখের একায়তন-স্বরূপ এক নিত্য, অবিনাশী, হ্রাসবৃদ্ধিহীন বস্তু তোমার ভিতরেই সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন—তাঁহার সন্ধান না পাইয়াই তুমি দুর্ব্বল, পরমুখাপেক্ষী হইয়াছ। আপাততঃ যদিও তাঁহাকে ধরিতে বুঝিতে পারা তোমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে—তথাপি বিশ্বাস কর তিনি আছেন। বৃথা তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে না. তিনি সাধারণ বুদ্ধির অগম্য; সুতরাং শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও—কালে তুমি অবশ্যই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিবে, তখন তোমার সকল সংশয় ছিন্ন

হইয়া যাইবে। শ্রদ্ধার সহিত সাধন কর। প্রথমটা নিরন্তর তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে থাক, শ্রবণ করিতে করিতে তোমার হৃদয় মন পূর্ণ হইয়া যা'ক, তাহার পর মনে মনে তাঁহার চিন্তা কর—সকল কার্য্যে, সকল ভাবে, তাহাকে মনে রাখিতে চেষ্টা কর, অতঃপর তিনি তোমার সবটা অধিকার করিয়া ফেলিবেন। তখন দেখিবে—তুমিই তিনি, তিনিই তুমি—তাঁহাকে না জানাতেই তোমার দুঃখ দুর্দ্দশা। অতএব এখন হইতেই বিশ্বাস কর—তুমিই সেই আত্মা। সকল অবস্থায়, সকল কার্য্যে, সেই আত্মার মহিমায় মহিমান্বিত থাকিতে চেষ্টা কর—তাঁহার বলে বলীয়ান্, তাঁহার আনন্দে আনন্দিত হও। বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। বৃথা কেন শোকদুঃখের চিন্তায় আত্মার মহিমা খর্ব্ব করিতেছ? দুঃখ দৈন্য আজ আসিয়াছে, কালই চলিয়া যাইবে—তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকিবে। জগতের ঘটনার সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া ফেলাতেই তুমি পূর্ণতা হারাইয়া দুর্ব্বার বাসনা দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছ,—বাসনার উন্মাদনায় তুমি সত্যকে দূরে সরাইয়া ছায়াকে ধরিয়া বৃথা সংসার-ভয়ে ভীত হইতেছ।'

বেদান্ত প্রদর্শিত এই মহান্ সত্য অবলম্বন করা ব্যতীত আমাদের বীর্য্যবান্ হইবার অন্য পথ নাই। আর উহা অবলম্বন করা যে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে, তাহাও সহজেই প্রমাণিত করা যাইতে পারে। যদি 'স্বর্গে দেবতা আছেন' অথবা 'তেঁতুল গাছে ভূত আছে', এইরূপ শত শত ধারণা, কোনওরূপ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের অপেক্ষা না করিয়া শুধু শুনিয়া শুনিয়াই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারে—তবে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়া অসম্ভব হইবে কেন? আর যেটি যার অন্তর্নিহিত ভাব, কার্য্যতঃ তাহারই প্রকাশ সর্ব্বত্র হইয়া থাকে, সুতরাং যদি আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হই—তবে আমাদের প্রত্যেকটি কার্য্যে তাহাই প্রকাশিত হইয়া উত্তরোত্তর যে আমাদিগকে বীর্য্যবান্, সমদর্শী ও একপ্রাণ করিয়া তুলিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ, এই আত্মবিশ্বাসই কর্ম্মের কৌশল—উহাই

কর্ম্মযোগের সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি। যদি নির্লিপ্ত, সুখ-দুঃখের অতীত, সর্ব্বশক্তিমান্ একটা কিছু—উহাকে পরমাত্মা, ঈশ্বর, আল্লা বা গড্, যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন—আমাদের ভিতর না থাকে, এবং উহাতে যদি আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন না হওয়া যায়, তবে 'আমি কর্ম্ম করিব অথচ সুখদুঃখ, লাভালাভ আমাকে স্পর্শ করিবে না'—এইরূপ একটা ধারণা লইয়া কর্ম্ম করা অসম্ভব দাঁড়ায়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনের নিকট কর্ম্মযোগের উপদেশে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদিগকেও আজ সর্ব্বপ্রথমে এই মহান্ আত্মতত্ত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করিতে হইবে—অন্যথা আমাদের সকল চেষ্টা হীন স্বার্থানুসন্ধান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদের কারণ হইয়া দুঃখেতেই পর্য্যবসিত হইবে। আর ক্ষুদ্র, নশ্বর বস্তুতে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার দরুণ নিজকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া সামান্য অবস্থা বিপর্য্যয়ে দিশেহারা হইয়া পড়াই যাহার স্বভাব, সুখদুঃখের সামান্য ঘাতপ্রতিঘাতে যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, একটু সামান্য স্বার্থের হানিতে যাহার বুদ্ধি পর্য্যাকুল হইয়া পড়ে—মহান্ কর্ম্মযোগ অবলম্বনে সে সম্পূর্ণ অনধিকারী। সুতরাং এই আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়া ব্যতীত যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের আর উপায়ান্তর নাই।

অনেকে আবার বেদান্তের এই আত্মতত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া মাত্র শিহরিয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন—দুর্ব্বল জীব আমরা, একগাছি তৃণ নাড়িবার শক্তিও নাই আমাদের, আমরা যদি নিজকে সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্য নির্ব্বিকার বলিয়া মনে করি—এক কথায় পরমেশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসি—যাহা নিতান্ত মিথ্যা কথা—তবে দুর্নিবার অভিমান, দাম্ভিকতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা আসিয়া আমাদের পতনের পথই পরিষ্কার করিবে।

একদিক্ হইতে বিচার করিলে আপত্তিটি খুব সারবান্। যতক্ষণ আমরা দেহ-মন অথবা তাহাদের সমষ্টিতে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ততক্ষণ আমরা দুর্ব্বল জন্মমৃত্যুশীল মর্ত্ত্য জীব ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারি না। এই আমিটাকে সর্ব্বশক্তিমান্ অথবা নিত্য নির্ব্বিকার মনে করাটা নিতান্তই

মিথ্যা কথা”, এইরূপ মিথ্যাকে আশ্রয় করিলে অধঃপাতে যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব এমতাবস্থায় ‘আমি দাস তিনি প্রভু’, ‘তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র’—এইরূপ একটা ভাব অবলম্বনে দাস যেমন প্রভুর শক্তিতে নিজকে শক্তিমান্ মনে করে, সেইরূপ ভাবে সকল কার্য্যে তাঁরই শক্তির মনন করাই অনেকের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইতে পারে সন্দেহ নাই। মোট কথা, আমাদের অন্তরের অন্তরে যে শক্তি সর্ব্বদা বিরাজিতা থাকিয়া সকল অবস্থাতে আমাদিগকে চালিত করিতেছেন, তাঁহাকেই—পরমেশ্বর, আত্মা, আল্লা, গড যে কোনও নামেই হউক না কেন—সর্ব্বদা সকল কার্য্যে মনন করিতে হইবে। সেই একই শক্তিকে অপরদিক্ দিয়া বিচার করিয়া বেদান্ত বলিতেছেন— ‘এই তুচ্ছ জন্মমরণশীল দেহটাকে আত্মবুদ্ধি করিয়াই তুমি সংসার দুঃখে পতিত হইয়াছে, তোমার ভিতরে যে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পরমতত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছেন তাঁহাতেই আত্মবুদ্ধি অর্পণ কর, সর্ব্বদা আত্মভাবে তাহাকেই ভাবনা কর, দেখিবে, তুমিই তিনি।’ বস্তুতঃ, দেহেন্দ্রিয়াদি নশ্বর পদার্থকে নিত্য, অবিনশ্বর বা শক্তিমান্ বলিয়া ভাবনা করিতে বেদান্ত শাস্ত্র কখনই উপদেশ প্রদান করেন নাই। সুতরাং, শুদ্ধ আত্মায় আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন হইতে চেষ্টা করিলে, তাহাতে কোন প্রকার অকল্যাণের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না।

কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, বেদান্তকে অবলম্বন করিলেই ত সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে—ইহাতে আর দুর্দ্দশার প্রতিকার হইল কৈ? এ যেন গলা কাটিয়া ফোঁড়া আরাম করিবার ব্যবস্থা। আর যদিই বা ধরিয়া লওয়া যায় যে সন্ন্যাসী হওয়াই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তথাপি সহসা আমাদিগকে তাহা করিতে বলিলেই কি তাহা করা যাইবে?

বাস্তবিকই বেদান্তের আত্মতত্ত্ব এমনই বস্তু—যাহার উপলব্ধিতে মানুষকে সন্ন্যাসী করিয়া তবে ছাড়ে। কারণ ‘রাগ-দ্বেষকে’ সমূলে উৎপাটিত না করিয়া আত্মজ্ঞান কখনই নিয়ন্ত হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন— ‘যিনি আকাঙ্ক্ষাও করেন না, দ্বেষও করেন না—তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী।’

সুতরাং আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী অকপট সাধককে রাগ-দ্বেষ বিমুক্ত সন্ন্যাসী অবশ্যই হইতে হইবে, কিন্তু রাগ-দ্বেষ বিমুক্ত হওয়া যে হাত-পা' গুটাইয়া বসিয়া থাকা নহে এ কথা আমরা অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আত্মস্থ হইয়া কর্ম্ম করা তখনই সম্ভবপর হয়, যখন সেই পরমতত্ত্বকে সর্ব্বত্র অবস্থিত জানিয়া মানুষ রাগ-দ্বেষের অতীত হয়; এইরূপ আত্মস্থ ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ না করিয়াও সন্ন্যাসী। আর এই আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে যে আমাদিগকে সব ছাড়িয়া বনবাসী হইতেই হইবে, এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ একদেশী। উহার চরম পরিণতি যেখানেই হউক না কেন, প্রারম্ভ যে সকল অবস্থাতেই হইতে পারে এবং ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই উত্তরোত্তর উচ্চ উচ্চ ভাব উপলব্ধি করিয়া যে মানুষ ক্রমশঃ চরম সিদ্ধিলাভের অধিকারী হইতে পারে—তাহা না বুঝিতে পারিয়াই আমরা 'ব্যবহারিক চেষ্টা' ও 'ধর্ম্মের সাধন' এই দুইয়ের ভিতর একটা কাল্পনিক প্রভেদের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। শিক্ষা দীক্ষার দোষে আজ আমরা এমন একটা অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে, শিক্ষালাভ-কালে অথবা ন্যায়তঃ জীবিকা অর্জ্জনের সময়ে আমরা কিছুতেই ভাবিতে পারি না যে, আমাদের বর্ত্তমান চেষ্টায়, ধর্ম্মের সাধন হওয়া ত দূরের কথা, ধর্ম্মের সহিত তাহাদের কোনওরূপ সংস্রব পর্য্যন্ত আছে। এইরূপ ধারণা লইয়া আমরা সারা জীবন যাহা করি, তাহা কার্য্যতঃ ধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ ধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থিত থাকায় বার্দ্ধক্যে যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অসম্ভব, হইয়া দাড়ায়। বস্তুতঃ, ধর্ম্ম যে কি বস্তু—উহা যে গোটাকতক প্রাণহীন অনুষ্ঠানের ভিতরই আবদ্ধ নহে—তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই দুরন্ত কাল আসিয়া শিয়রে দণ্ডায়মান হয়। এইরূপেই ধর্ম্মের কতকগুলি খোসা-ভূষি ছাড়া বাকি সবটুকু, বালক যুবক বৃদ্ধ সকলের নিকট হইতেই চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ফল এই দাড়াইয়াছে যে, আজ আমরা নিস্তেজ, শ্রীহীন, পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্মজীবন ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে কোনও

বাঁধাবাঁধি সীমা নির্দ্দেশ আছে কিনা, আর থাকিলেও তাহা কোথায় —সে বিষয় বিচার সহকারে বুঝিয়া আমাদিগকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

সংসারের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই প্রকারের কাজ বিভিন্ন ব্যক্তি বা একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবাবলম্বনে অনুষ্ঠান করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ফল লাভ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে এক ছড়া মালা গাঁথার কথা ধরা যাক্। একজন মালা গাঁথিতেছে—তাহার প্রণয়পাত্রকে উপহার দিয়া তাহার মনোরঞ্জনের জন্য, অপর একজন—তাহার ইষ্টদেবতা মদনমোহনকে সাজইবার জন্য। মালাগাঁথা কাজ উভয়েরই সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু উভয়ের মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—প্রথম ব্যক্তির হৃদয় আশা-নিরাশার কত প্রবল দ্বন্দ্বে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অগণন ঘাত প্রতিঘাতে, প্রণয় ও অভিমানের কতই না বিপুল আলোড়নে সতত আলোড়িত হইতেছে। উত্তেজনার চাঞ্চল্যে মন তাহার সততই অস্থির, ভাল করিয়া গাঁথিতে চাহিলেও মালাগাঁথা যেন কিছুতেই ভাল করিয়া হইয়া উঠিতেছে না। পক্ষান্তরে ভগবচ্চিন্তায় দ্বিতীয় ব্যক্তির চিত্ত ধীরস্থির ও আনন্দময়,—তথায় নিজের জন্য চাহিবার কিছুই নাই, সুতরাং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষম ঝঞ্ঝাবাতে তাহা আন্দোলিত হয় না, তাহার চিত্ত শুদ্ধ অচঞ্চল, সুতরাং কার্য্যে অনবধানতা বা বিশৃঙ্খলতার ভাব তাহাতে নাই। তাহার কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে—আবার হৃদয়েও শান্তি ও প্রসাদ সতত বিরাজিত রহিয়াছে। এইরূপে একটা উচ্চ ভাবাবলম্বনে জীবনের প্রত্যেকটি কাজ সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিলে কাজ ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়-ই—অধিকন্তু জীবনের প্রত্যেকটি চেষ্টাই শ্রেয়ের সাধনরূপে পরিণত হইয়া যায়। বস্তুতঃ, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক চেষ্টার ভিতর যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তবে তাহা ভাবে,—বাহিরের দিক হইতে উভয়ের ভিতর কোনও স্থির সীমা নির্দ্দেশক কিছু খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। এই উচ্চ ভাবটাকে হারাইয়াই আমরা ব্যবহারিকের সঙ্গে অধ্যাত্মের কোনই সামঞ্জস্যের সন্ধান লাভ না পাইয়া একদেশিতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ধ্রুপ-

তর্কে লোকের মনে ক্ষতিকর সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ ভাবে ব্যবহারিক চেষ্টা করিয়া থাকি তাহার মূলে রহিয়াছে একটা অসম্পূর্ণতা জনিত দুর্ব্বলতার ভাব—মানযশ, খ্যাতি প্রতিপত্তি অথবা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া সেই ক্ষুদ্র জীবনটাকে ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা। এই জন্য যখনই আমরা জাগতিক কোনও লাভের চেষ্টায় কার্য্য করিয়া থাকি, তখনই ভিতরে ভিতরে একটা বিষম দুর্ব্বলতা অনুভব না করিয়াই পারি না। কিন্তু চিত্তের দুর্ব্বলতা-সম্পাদক এই সকল ক্ষুদ্রভাব ছাড়িয়া, বলকারক একটা বিশাল উদার উচ্চভাবের প্রেরণায়ও যে সকল প্রকার ব্যবহারিক চেষ্টা সম্ভবপর হয়—ভাগ্যদোষে সে কথা আজ আমাদের ধারণারও বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, সমাজে দুর্ব্বলতামূলক নানা প্রকার ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ ভাবসমূহ প্রবেশ করিয়া সমাজকে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারের নাগপাশ-রূপে পরিণত করিয়াছে। আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি যে, আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে যে মায়াময় সংসার পরিত্যাগের কথা আছে, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে—এই হীন দুর্ব্বলতামূলক স্বার্থ-দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব অবলম্বন করা। গীতা স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন ঃ—

> স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতো সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। (১৮।৪৫)

আবার বলিতেছেন,—

> স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ (১৮।৪৬)

নিজ নিজ আশ্রম ও বর্ণবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে,—কিন্তু সাধারণ স্বার্থ-দৃষ্টিতে করিলে চলিবে না। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য" অর্থাৎ, ভগবানের অর্চ্চনা-বুদ্ধিতে করিলেই তাহা সিদ্ধিলাভের কারণ হইবে। শ্রীভগবান্ অন্যত্র বলিতেছেন—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।" (১০।২০) 'আমিই সকল জীবের হৃদয়স্থিত আত্মা'। পুনর্বার বলিতেছেন—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো। মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ" ইত্যাদি (১৫।১৫)—'সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই

আত্মারূপে অবস্থিত, আমা হইতেই জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে, আবার আমাকে না জানাতেই অজ্ঞান মোহ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়'। অতএব সেই আত্মরূপী পরমতত্ত্বকে জাগরিত করাই শ্রীভগবানের অর্চ্চনা। অর্চ্চনা বলিতে শুধু বাহ্য পূজা বুঝায় না—বাহিরের অনুষ্ঠানের সহায়ে হৃদয়ে সেই আত্মরূপী ভগবানকে স্পষ্ট অনুভব করাই যথার্থ ভগবৎসেবা, উহাই যথার্থ আত্মজ্ঞানের সাধন। সুতরাং এই সাধন অবলম্বনের নিমিত্ত যে আমাদিগকে বনবাসী হইতেই হইবে—এ ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত। বেদান্তের আত্মতত্ত্বের ইহাই বিশেষত্ব যে, উহা কোনও প্রকার অনুষ্ঠানকেই মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করে না—বরঞ্চ সকল কার্য্যে একটা উচ্চ ভাবের সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

যাহা হউক, এবার আমরা মূল প্রস্তাবের উপসংহার করি। আমরা দেখিলাম যে, একমাত্র বেদান্তের এই উদার আত্মতত্ত্বে আস্থাস্থাপন করিয়াই আমরা অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। ভয় ও দুর্ব্বলতাই আমাদিগকে মনুষ্যত্ব-হীন করিয়াছে। নির্ভীকতাই সকল পুণ্য, সকল কল্যাণ ও সকল অভ্যুদয়ের জনক—আর ভয়ই সকল পাপ, সকল অমঙ্গল ও সকল অধঃপতনের কারণ। ভয় হইতেই স্বার্থপরতা জন্মে,—'এইটুকু গেলেই আমার সব গেল' এইরূপ একটা 'হারাই হারাই' ভয়েই মানুষ হীন স্বার্থকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্রতাই সমাজ ও ব্যক্তিকে সহানুভূতি-বিহীন ও অত্যাচারী করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রতাকে দূর করিতে হইলে লইয়া আসিতে হইবে বিশালতা ও বীর্য্যবত্তা। উহাদের সন্ধান করিতে হইবে আত্মায়—বাহিরে অনুসন্ধান করিলে আমাদিগকে নিরাশই হইতে হইবে। সেই আত্মার বলে বলীয়ান্ হইয়া আমাদিগকে বীরের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

অতএব যদি প্রাণভয়ে ভীত, নিরাশায় শুষ্কপ্রাণ, দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় ও দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত, দেশের কোটি কোটি নরনারীকে যথার্থ মনুষ্যত্বে দীক্ষিত করিয়া জগতের হিতসাধনে ব্রতী হইতে হয়—যদি সমাজের বিশৃঙ্খলতা,

সংকীর্ণতা ও স্বার্থদৃষ্টি অপসারিত করিয়া তাহাকে ব্যক্তির, দেশের ও জগতের কল্যাণ-সাধনের যন্ত্রস্বরূপ করিয়া গঠন করিতে হয়, তবে আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে সেই ধর্ম্ম—যাহার ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মারূপে সতত সমভাবে বিরাজিত—উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, জড় চেতন, স্ত্রী পুরুষ, আত্মীয় পর, সবই যাহার একটি পবিত্র মন্দির—সকল কার্য্যে, সকল চেষ্টায় তাঁহাকে প্রকাশিত করাই যাহার অনুষ্ঠান। এই ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই আজ জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও অন্যান্য সকল প্রকার ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে ;—এক কথায় এই ধর্ম্মের সহায়েই জগতে এক অখণ্ড শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবে পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এস ভাই, আমরা উহারই সাধনায় অগ্রসর হই।—

ওঁ আপ্যায়স্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়িসন্তু, তে ময়িসন্তু।*

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

* আমার সমস্ত বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয় সমূহ বীর্য্য লাভ করুক ; উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউন, আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার সর্ব্বদা অপ্রত্যাখ্যান বিদ্যমান থাকুক। আত্মনিরত আমাতে উপনিষৎ-কথিত ধর্ম্ম সমূহ প্রকাশিত হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কথাপ্রসঙ্গে

(১)

'Fame is the last infirmity of the noble mind'—সাধু হৃদয়ের শেষ অন্তরায় যশ। কাম-কাঞ্চনের ঝড় ঝাপটা সহ্য করিয়া শেষে যশাবর্ত্তে পড়িয়া বহু সাধককে হাবুডুবু খাইতে হয়। সাধনার পূর্ব্বক্ষণে চিত্তসাগরের কোন্ অগাধ জলে নীরবে একটি যশোবুদ্‌বুদ লুকাইত থাকে, কিন্তু হঠাৎ সিদ্ধির সন্ধিক্ষণে এক অজানা শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া জলস্তম্ভাকারে উহা নিজ পরাক্রম দেখায় এবং সাধকের জীবনতরীখানিকে মোহের বিপথ স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

*　　　　*　　　　*

প্রতি নবযুগ তরঙ্গের শীর্ষদেশে এক মহাপুরুষ বর্ত্তমান থাকেন। তাঁহারই বাণী নানা রঙ্গে ভঙ্গে সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মত জগৎ ছাইয়া ফেলে এবং নানা ছন্দে-বন্ধে, নানা ভাবে ভাষায়, নানা আবর্ত্তের সৃষ্টি করে। সেই অতি-মানবের বাণী এতই শক্তিমান এবং তাহার গতি এতই সূক্ষ্ম যে অজ্ঞাতসারেই হউক আর জ্ঞাতসারেই হউক মানব তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং কর্ম্মে তাহা প্রতিপন্ন করে। নবযুগের Leader বা নায়ক তাঁহারাই—অপরে কর্ম্মী বা worker মাত্র। সেই দেব-মানবের আবির্ভাবের পর যিনি যত বড়ই Idea বা ভাব বিতরণ করুন, উহা সেই শক্তিমান বাণীর প্রতিধ্বনি এবং যিনি যত বড়ই সৎকর্ম্ম করুন সকলই সেই অবতারের mission এর সম্পূর্ণতা (fulfilment)। যাহার চক্ষু আছে সে দেখে, যাহার কর্ণ আছে সে শুনে এবং সেই অবতার-লীলার সহচর হইয়া তাঁহার কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে,—বৃথা দ্বেষ মদিরা পান করিয়া অযথা প্রলাপ বকে না, বা একবার অহঙ্কারের বশে সে আদেশ অমান্য হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, পুনরায় আত্মহত্যার প্রয়াসী হয় না। প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস ইহার প্রমান।

যখন কর্ম্মীরা যুগনায়কের ভাব গ্রহণ করিয়া দেশ এবং দশের সেবায় প্রবৃত্ত হয় তখন মহামায়াও তাহাকে পরীক্ষার দ্বারা নির্ভ ভিত্তিতে দৃঢ় করিবার জন্য নানা ঐশ্বর্য্য প্রেরণ করেন এবং যদি কর্ম্মীর মনে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভোগবাসনা লুক্কায়িত থাকে তাহা তখন সেই ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া কর্ম্মীকে মুগ্ধ করে। সে নিজকে তখন একটা 'কেউ কেটা' মনে করে না—সে মহাপুরুষের বাণীকে নিজের বাণী বলিয়া ঘোষিত করে, কিম্বা তাহা বিকৃত করিয়া নিজ ভাব-মন্দিরের নারায়ণের নিমিত্ত গন্ধপুষ্প সংগ্রহ না করিয়া, আবর্জ্জনা স্তূপ সঞ্চয় করে।

* * *

সাধককে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সাধনসঙ্ঘ হইতে ভূতাপসরণের নিমিত্ত মহামায়া অত্যাচার, অবিচার, অপমান প্রভৃতি নানা বিভীষিকা আনয়ন করেন এবং সেই ক্লেশের বাতাসে হুজুক-প্রিয়তা, তরল-চিত্ততা অসরল-শ্রদ্ধাহীনতা সকলের অপসারণ করেন, কিম্বা স্বপ্নের মত নানা মনোহর রূপ-রস-শব্দ ভূষিত গন্ধর্ব্বপুরীর কুহেলিকা দর্শন করাইয়া সাধকের আসন টলাইবার চেষ্টা করেন—দেখেন ভক্ত হৃদয়ের গভীরতা কত দূর।

* * *

হাউই শন্ শন্ রবে আকাশে উঠিতে থাকে এবং নয়ন মুগ্ধকর লাল নীল নানা প্রকারের তারা কাটিতে কাটিতে ভূতলের প্রদীপকে বলে "তোর আলো বড় মিট্‌মিটে, তোর স্থান অতি নিম্নে।" কিন্তু সে নয়নমন মুগ্ধকর তারাবাজি ক্ষণিকের মধ্যে হাওয়ায় বিলীন হইয়া যায় এবং ভূতলের প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ মানবের হিতসাধনে তার জীবনের শেষ তৈলটুকু নিঃশেষে ব্যয়িত করে। তেম্নি শ্রীভগবানের পার্থিব লীলার নিত্যসহচরেরা কখন অসংযত রজঃকে অবলম্বন করিয়া সমাজে জাতিতে বা ব্যক্তির হৃদয়ে ক্ষণিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া অল্পকালের মধ্যে জগৎ রঙ্গমঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাঁহারা অনন্তশক্তি শ্রীভগবানের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করায় তাঁহাদের

কর্ম্মক্ষমতাও অনন্ত ও সত্ত্বসংযমিত। যুগ যুগ বাহিনী নদীর ন্যায় তাঁহাদের কর্ম্মগতি দুর্লক্ষ্য এবং অতি নীরবে, সকলের অজ্ঞাতসারে বৃহৎ পর্ব্বতচূড়া, প্রশস্ত ভূখণ্ডকেও নিজের অঙ্গে মিশাইয়া লয়।

* * *

সৈনিকেরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয় তখন বিজয় গর্ব্বে তাহাদের কে পড়িয়া রহিল, কে আহত হইল, কে খুব বাহাদুরী দেখাইল, শত্রু বা মিত্র পক্ষের কাগজে ভাল কি মন্দ কে কি বলিল তা তাহাদের শুনিবার বা পিছনে তাকাইয়া দেখিবার অবসর থাকে না—তখন কেবল —আগাও—আগাও। তেম্নি নবযুগ-নায়কের সকলদেশের কর্ম্মীরা যখন নব ভাব তরঙ্গে জগৎ ছাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের মধ্যে কে পড়িল বা উঠিল, দেশ ভাল কি মন্দ বলিল তাহা তাহাদের শুনিবার বা পিছনে তাকাইয়া দেখিবার অবসর থাকে না—কেবল মেঘমন্দ্রে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়—Work and Expansion—কর্ম্ম এবং বিস্তার। আর যাহাদের ভাঙন ধরে যাহারা দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য তাহারা কেবল উঁকিঝুঁকি মারে আর দেখে কে কি বলে, কে কি করে এবং গালি গালাজ ও অত্যাচারের দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। ফলে চিন্তা ও শক্তির অপব্যবহার করিয়া মস্তিষ্ক একটা উত্তেজনার কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া পড়ে এবং সেই উত্তেজনায় পড়িয়া বহু নবীন তরুণ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন একটা বোঝা হইয়া পড়ে।

* * *

এই যুগসন্ধিক্ষণে খৃষ্টের সেই মহতীবাণী আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—'Beware of false prophets'—মিথ্যা অবতার হইতে সতর্ক হও। 'For many shall come in my name, saying I am Christ.' সকল যুগেই কাশীরাজ-বাসুদেব, দেবদত্ত প্রভৃতি Pretender-রা দেখা দিয়াছে। খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যের সময়ও ইঁহারা কম প্রভাব দেখান নাই। মিথ্যা অবতার মানিয়া বিদ্বেষ বহ্নির সৃষ্টি করিয়া জগতে সংঘর্ষের মাত্রা বাড়ান অপেক্ষা অবতার না মানা

ভাল। কিন্তু প্রকৃত অবতার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না—তাঁহারা ভবিষ্যতের তিন যুগের ছবি দেখিতে পান।

* * *

History repeats itself—একবার যাহা ঘটে প্রবাহাকারে আবার তাহা ঘটিবে, তবে অপর ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতিকে কেন্দ্র করিয়া। কেবল বর্ত্তমান ইতিহাসে ইহা সত্য নহে, সমষ্টি সৃষ্টি চক্র সম্বন্ধে তাহাই, কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন 'যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ'।

(২)

প্রশ্ন হইয়াছে সন্ন্যাসী নারী বিদ্বেষী কি না?—হিন্দুধর্ম্মের প্রতি চতুরাশ্রমীর সহিত নারী সমাজের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ। তন্মধ্যে নারী জাতির সহিত ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীর অটুট মাতৃসম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে যাহারা তৃপ্ত ও বিভোর তাহাদিগের বিরুদ্ধে লেখনী বা বাক্য সাহায্যে সন্ন্যাসীর নারী-বিদ্বেষের অছিলায় যাহারা সন্ন্যাস আশ্রমের বিরুদ্ধে crusade ঘোষণা করেন—তখন তাহাদের হাসিয়া চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর বুদ্ধিমানের কার্য্য কি হইতে পারে? যদি কোনও পঙ্‌ক্তির স্বল্প ভোজন-তৃপ্তকে পঙ্‌ক্তি-শুদ্ধ লোক কিছুতেই না বুঝিয়া বলে 'তুমি আমাদের প্রতি দ্বেষ করিয়া খাইলে না কেন?'—তখন সে কি করিবে? চীৎকার করিয়া প্রমাণ করিতে যাইবে যে সে তৃপ্ত হইয়াছে—কিম্বা একটু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকিবে?

* * *

দুর্ভাগ্য ক্রমে এই প্রকার চুপ করিয়া থাকাটা অনেকে 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সকলে এই প্রকার অভিযোগ সমর্থন করেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা চাহেন সন্ন্যাসীদের একটা কথা শুনিতে। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—'তোমাদের চুপ করিয়া থাকা স্বভাব—তবে আবার লেখনীর তাড়না কেন?'—আমরা সেই কথাই বলিতেছি।

যদি কখনও কেহ ভ্রমবশতঃ—যাহাদের সহিত নারীজাতির ত্রিকালে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ—অন্ততঃ যাহারা এরূপ কল্পনা বা প্রতিজ্ঞাও করে—তাহাদের সেই ভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মাতৃসমাজের অত্যুজ্জ্বল প্রভা মলিন করিতে বসেন, তখন সেই মাতৃ সমাজেরই কর্ত্তব্য সে ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া। কিন্তু যখন তাঁহাদের লেখনী বা বাক্য নীরব রহিয়া যায় তখন প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্য সে ভ্রম নির্দ্দেশ করা। কিন্তু তাঁহারাও যখন নীরব রহেন তখন ভারতীয় মাতৃসমাজের আদর্শমণি রক্ষার নিমিত্ত সেই পুত্রদেরই প্রতিবাদ করিয়া বলিতে হয় সন্ন্যাসীর 'নারীবিদ্বেষ' অযথা, সম্পূর্ণ ভিত্তি হীন।—কারণ অপরাশ্রমীদের সহিত নারী সমাজের যেমন একটা না একটা সম্বন্ধ আছে তেমনি এই চতুর্থ আশ্রমীদের যে নারীতে মাতৃজ্ঞান ইহাও একটা সম্বন্ধ। সন্ন্যাসী সকল সম্বন্ধ নির্ম্মম ভাবে ছেদন করিতে পারে, কিন্তু গর্ভধারিণীর সহিত সম্বন্ধ ছিঁড়িতে পারে না—যেমন, তথাকথিত 'নীরস বেদান্তী' শঙ্কর, 'উৎকট বৈরাগী' চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণও গর্ভধারিণীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।—তাই বলি পুত্রের মাতার প্রতি দ্বেষ সম্ভব নহে।

* * *

এখন দেখা যাউক নারীজাতির প্রতি কে প্রথম অবিচার করিয়াছেন এবং কাহার অনুশাসন সন্ন্যাসিকুল মানিয়া আসিতেছে। প্রথম অনুশাসক মনু মহারাজ, দ্বিতীয় বশিষ্ঠদেব এবং তৃতীয় শ্রীবেদব্যাস; গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় সন্ন্যাসীরা বশিষ্ঠ ব্যাসের শিষ্য। প্রথমোক্ত স্মৃতিকার স্ত্রীজাতি বিশ্বাসের পাত্রী নহে স্থির করিয়াছেন, আবার পূজা করিতেও বলিয়াছেন এবং স্ত্রীপুরুষের অবাধ-সম্মিলনের দোষ উল্লেখও করিয়াছেন। দ্বিতীয় শাস্ত্রকার দৃষ্টি-সৃষ্টি-বাদী 'দুনিয়া তিনো কালমে নেহি হ্যায়'—ব্রহ্মদৃষ্টি ত্যাগ করিলে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ই ভুয়া ছাঁয়াবাজী। তাই তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া সংসার করিতে বলিয়াছেন। তৃতীয় মহর্ষি বেদব্যাস, যাঁহার প্রস্থানত্রয়ের অনুশাসন সন্ন্যাসিমহলে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তিনি তাঁহার

ব্রহ্মসূত্রে সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠা এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর স্ত্রী-গ্রহণ প্রায়শ্চিত্তেরও অনুপযুক্ত স্থির করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-চরিত্রে তিনি যেরূপে অযথা কালিমা লেপন করিয়াছেন, এরূপ আর কোনও শাস্ত্রকার করেন নাই। অথচ তাঁহারই মহাকাব্যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শনারী চরিত্রের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন।

* * *

এক্ষণে কৌতুক এই যে, এই প্রধান স্মার্ত্তত্রয়ই গৃহস্থ—পুত্রের পিতা। কিন্তু যিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী শ্রীশুক, তিনি বলিতেছেন 'তেজীয়সাং ন দোষায়'—তেজীয়ান ব্রহ্মজ্ঞ যাঁহারা তাঁহাদের সব শোভনীয়। শঙ্কর পার্শ্বে গৌরী, বশিষ্ঠ পার্শ্বে অরুন্ধতী, রামকৃষ্ণ পার্শ্বে সারদা দেবী গৌরবের। সন্ন্যাসীর আদিগুরু শ্রীশঙ্কর কালকূটের সাগর পান করিয়া মহিমান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসী যদি একবিন্দু হাইড্রোসাইনিক অ্যাসিড খান তাহা হইলে আত্মঘাতী হইবেন। সেই হেতু সাধারণ ঋষি এবং সন্ন্যাসীকুলের জন্য শ্রীশুকের দ্বিতীয় অনুশাসনই প্রযুজ্য—'স্ত্রীনাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্'—অন্যথা মাতৃ-সম্মানের হানি সম্ভব।

* * *

এই নারী সমাজের সহিত যাহাদের মাতৃ সম্বন্ধ সেই সাধক সন্ন্যাসী-শিষ্যগণকে সাবধান করিবার নিমিত্তই শঙ্কর বলিয়াছেন—'দ্বারং কিমেকনরকস্য—নারী'? মাতৃত্বে স্ত্রীত্বের আরোপ নরক স্বরূপ। কিন্তু Printing এর কৃপায় শাস্ত্রের অবাধ প্রচলন এবং সদ্‌গুরুর অভাবে অধিকারীবাদের প্রতি তাচ্ছিল্য—এই দুই কারণে দ্বিতীয় আশ্রমীরা ঐ কথা নিজেদের উপর টানিয়া লইয়া শঙ্করের অযথা নিন্দা করিতেছেন। বৌদ্ধযুগের পতনকালে স্ত্রীপুরুষের অবাধ সম্মিলনের ব্যভিচার দর্শন করিয়া এবং অমরক রাজার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া—নারীতে শুদ্ধজ্ঞান রহিত হইলে মোহের কি ভীষণ শৃঙ্খল—তাহা উপলব্ধি করিয়া, তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—'কা শৃঙ্খলা—প্রাণভৃতাং হি নারী'। তাঁহার যদি নারী-সামান্যে ঐ অভিযোগ হইত তাহা হইলে তিনি উভয়ভারতীকে মণ্ডন-যুদ্ধে মধ্যস্থা করিতেন না বা নিজ গর্ভধারিণীর জন্য এত চিন্তিত হইতেন না।

* * * *

এ ছাড়া আর একটা দিকও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—সত্যদর্শনেচ্ছু পুরুষের পক্ষে স্ত্রীতে মোহ যেমন বন্ধনের কারণ তেমন স্ত্রীর পক্ষেও পুরুষের মোহ একই বন্ধনের কারণ। শাস্ত্রকারগণ এবং আচার্য্যগণ সাধকপুরুষের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন—ঠিক সেই কথাই যে সাধিকার জন্যও প্রযুজ্য নহে একথা কে বলিল?—কেবল রকম ফের করিয়া বুঝিতে হইবে মাত্র।

* * *

দেশ বিদেশের এতগুলি মহাপুরুষ—যাঁহারা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কার্য্যের দ্বারা উন্নত এবং বাণীর দ্বারা জগতের সন্তাপ দূর করিয়া গেলেন—তাঁহারা কি নারী জাতিকে সত্যই ঘৃণা করিতেন? আমাদের কিন্তু মনে হয় ঘৃণা করিতেন না—পূজাই করিতেন! যে অবস্থা লাভ করিলে সাধক দেখিতে পান সকল নারীমূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীজগদম্বা বিরাজিতা আছেন—সে অবস্থা লাভ করিয়া কি কোন সাধক মাকে 'মধুরভাবে' দেখিতে সক্ষম হইতে পারেন? অথবা যাঁহারা সে কথা মানিয়া থাকেন তাঁহাদেরই কি উচিত মন-মুখ দুই করে কাজ করা?

* * *

মহাপুরুষ এবং সন্ন্যাসিগণের নিকট স্ত্রীজাতির শোভা মাতৃ মূর্ত্তিতে। সে মাতৃমূর্ত্তিকে যিনি ভোগের বস্তু বলিয়া ব্যবহার করিবেন—তাহার পক্ষে যে সেই নারী নরকের দ্বারস্বরূপ হইবেন তাতে আর বিচিত্র কি?

* * *

স্ত্রীত্বের মোহে বন্ধন এবং মাতৃত্বের জ্ঞানে মুক্তি—এই সত্যটা মহাপুরুষগণ অনুভূতির দ্বারা বুঝিয়াছিলেন—তাই তাঁহারা বলিতে পারিয়াছেন—'স্ত্রীয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু'—"যাদেবি সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা। নমঃস্তস্যৈ নমঃস্তস্যৈ নমঃস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

* * *

সন্ন্যাসিগণ নারীজাতির সহিত কোন কথা বলিতে হইলেই অগ্রে মা সম্বোধন করিয়া পরে যাহা বক্তব্য বলিয়া থাকেন। 'মা' এই একটী মাত্র

সম্পর্ক সন্ন্যাসিগণের সহিত নারীজাতির বর্ত্তমান। সন্ন্যাসিগণ নারী-জাতির আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিয়া আসিতেছেন—

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ॥

আমরাও বলি—মাতৃজাতি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও, আমাদের আশীর্ব্বাদ কর—তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমরা তোমাদের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হইতে পারিব।—তোমাদের শুভাশীষ কখন বিফল হইবার নহে।

শিক্ষা-মন্দির।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

নানা অভিজ্ঞতার ফলে বর্ত্তমানে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বুঝিয়াছেন, অশিক্ষারূপ ব্যাধি বাঙ্গালা দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার একমাত্র কারণ। উহাই আমাদের দেহের এবং বুদ্ধির বিলোপ সাধন করিতেছে। দেশ যে স্বদেহের ব্যাধির নির্ণয় করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাহার সকল মুখপত্রে ব্যাধির তাড়নায় আর্ত্তনাদ। ব্যাধির নিবারকরণের নিমিত্ত দেশ চেষ্টাও আরম্ভ করিয়াছে। ব্যাধির যন্ত্রণা স্বরূপ দারিদ্র্যদোষ দূরীভূত করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্ম মিশন, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলী প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্ঘ হাঁসপাতাল, ঔষধালয়, দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য কেন্দ্র, দুই চারিটী নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়া জাতীয় ব্যাধির উপশম করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বিষ যখন রক্তের সহিত মিশিয়া সমগ্র দেহ যন্ত্রের ধ্বংস-সাধন করে তখন তাহার পরিণাম স্বরূপ দুই একটি ক্ষততে বাহ্য প্রলেপ দানে যেমন অন্তর্ব্যাধির কিছুমাত্র উপশম হয় না, সেইরূপ অস্মদ্দেশীয় সেবক মণ্ডলীদের

সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়া যাইতেছে। ক্ষততে প্রলেপ দান করিয়া কি হইবে যদি রক্ত পরিশোধিত না হয়?

এক্ষণে রক্ত পরিশোধিত করিতে হইলে শিক্ষারূপ ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এবং তাহার নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষা বিস্তার কল্পে অসংখ্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। বলিতে পার, শিক্ষার যথেষ্ট সরঞ্জাম ত রহিয়াছে—কলিকাতার বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ, স্কুল, পাঠশালা, টোলের অভাব কি? আমরা বলি ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছ বটে কিন্তু উহাতে রোগীর অস্বাভাবিক বিকার আরও বাড়িয়া গিয়াছে—ব্যবস্থা পত্রের পরিবর্ত্তন না করিলে বিকার আরও বাড়িয়া যাইবে কমিবে না। 'যার ধাতে যা সয়' তাহাকে সেইরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার বর্ত্তমানে যতটুকু শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে তাহা লোক-সংখ্যার তুলনায় সম্পূর্ণ অপর্য্যাপ্ত। যাঁহারা বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন কি অন্ধকার দেশকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশ হইতে আনিত দুই চারিটী সহরের আলো সে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে—মাত্র দুই এক স্থানে সেকেলে আধ্যাত্মিক প্রদীপ ইতস্ততঃ মিটমিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

নিজস্ব বলিয়া আর কিছুই নাই—'নূতন'কে বরণ করিতে গিয়া আমরা স্বদেশে একেবারে বিদেশী হইয়া পড়িয়াছি। জাতীয় ও ব্যক্তিগত শক্তি বিকাশের চিরন্তন বিধি—বাহ্য অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করিয়া আভ্যন্তরিণ স্বাভাবিক শক্তির পুষ্টি সাধন। আমরা বাহ্য অভিজ্ঞতাকে সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমাদের যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম যাহা আমাদের প্রাণ তাহাকে নিঃশেষে অস্বীকার করিয়া নিজেদের সমাধি নিজেরাই খনন করিতে বসিয়াছি। বিদ্যালয়ে অজ্ঞানতমঃ নিবারিণী বীণাপাণি দেবীর প্রতিষ্ঠা না করিয়া কুবেরের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছি! আমরা বালকগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করি অর্থ ও কাম লাভের উপায় শিক্ষার নিমিত্ত। পুত্র যদি ধর্ম্ম এবং মোক্ষের দিকে মতিমান্ হয়, পিতা বলেন 'ছেলে আমার ব'য়ে গেল।' কিন্তু আমরা যে হিন্দু, ভগবান্

আমাদের লক্ষ্য, বিদ্যা—ভক্তি জ্ঞান লাভের উপায়,—একথা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনীশ্বর-বিদ্যা আমাদিগকে একেবারে ভুলাইয়া দিয়া ভোগকেই চরম লক্ষ্য বুঝাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে আপামর-জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া-গিয়াছে—আমাদের জাতীয় তরণী ছিদ্র হইয়া গিয়াছে, আমরা ডুবিতে বসিয়াছি দেখিয়া। ওঠ, জাগো ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিয়া সকল শক্তি সমবায়ে আমাদের জাতীয়তাকে রক্ষা কর। এই রক্ষাকল্পে অনেকে বলিতেছেন—দেশে রাজনীতির চর্চ্চা খুব চলুক—ইউরোপ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বেদের মত ঘরে ঘরে পঠিত হউক—ম্যাট্‌সিনী, গ্যারীবল্ডী, ওয়াসিংটন প্রভৃতি দেশ-প্রাণদের চরিত্র আমাদের আদর্শ হউক,—প্রাচ্য সভ্যতাকে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে তখন ইহা ত প্রতিপন্নই হইয়াছে যে উহা সময়ের অনুপযুক্ত—বহু সহস্র বৎসরের মমি (mummy) পাশ্চাত্য সূর্য্যালোক লাগিযাই জাগিয়া উঠিয়াছে! কাজেই উহাকে এখন কবরে নিহিত করাই কর্ত্তব্য—তবে অতীতের ইতিহাস বলিয়া দুই চারিটী ফুল ছুড়িয়া সম্মান প্রদর্শন করা উচিত! নূতন করিয়া সমাজ গড়িতে হইবে—অতীতের সকল কুসংস্কার চুর-মার করিয়া ভাঙ্গিয়া অবিকল পাশ্চাত্যানুকরণে নূতন বনিয়াদ খনন করিতে হইবে। যেমন কাম্যকূপ প্রভৃতিতে দেহত্যাগ, গঙ্গাসাগরে পুত্রকন্যা বিসর্জ্জন, সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে, সেইরূপ বিধবার অবিবাহ, শিশুবিবাহ, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, সন্ন্যাস প্রভৃতি বর্ব্বর পুরাতন প্রথা উঠাইয়া দে[illegible]—আর সর্ব্বাপেক্ষা দেশের যে মহা অন্তরায় 'ভারতীয় ধর্ম্ম' উহাকে একেবারে পুঁথি-পুরোহিত, ঢাকি-ঢুলি সমেত ভারত মহাসাগরের অতল জলে বিসর্জ্জন কর এবং যদি প্রকৃত ধর্ম্ম, দর্শন এবং কাব্যের আলোচনা করিতে চাও, তাহা হইলে Emerson, Hegel, Browningএর আলোচনা কর। এমন সাজান ফুলের বাগান ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে এক-আধটি বন্য পুষ্প সঞ্চয়ের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন কি?—মৃত সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার আলোচনা দ্বারা

পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক স্বদেশে আনিয়া স্বদেশ হিতৈষীতার পরাকাষ্ঠা দেখাও!

অপরে বলেন—দেশ রক্ষা করিতে হইলে দেশের আর্থিক সমস্যার উন্নতি করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের বেদ-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া কল কারখানায় দেশ ছাইয়া ফেল—বাণিজ্য লক্ষ্মীকে অধ্যবসায়ের দ্বারা বরণ কর। আর্থিক সমস্যার উন্নতি হইলেই মানব নিশ্চিন্ত মনে সমাজতত্ত্বের চিন্তা করিতে পারিবে। আমাদের দেশে যে পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বিদ্যমান আছে, উহা একেবারে ফেলিয়া দিলে চলিবে না—উহার ভিতর হইতে ভারত এবং ভারতেতর বহু দেশের ইতিহাসের আবিষ্কার হইতে পারে এবং উহাদের ভিতর কিছু কিছু কাব্যরসও আছে। পুরাতন স্থপতি, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা প্রভৃতি বিদ্যার যেরূপ প্রদর্শনী (museum) করিয়া রাখা হইয়াছে, শাস্ত্রগুলিও সেইরূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আর ধর্ম্ম জিনিসটা একেবারে বর্ত্তমানে ত্যাগ করিলে চলিবে না। যদিও উহা একটা মস্ত 'ফকিকারী', তথাপি উহারই আবরণে আমাদিগকে এক্ষণে রাজনীতি প্রভৃতি দেশহিতকর সকল বিষয়ই চালাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নব বিজ্ঞানের সত্য সকল দেশবাসীকে শুনাইতে হইবে—তাহা হইলে কিছুকালের মধ্যেই আমূল সকল কুসংস্কার নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

অপর পক্ষ বলেন—আমাদের দেশের ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, এমনি কি প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারটি *পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে। কারণ,* বহুকালের অভিজ্ঞতা ফলে ভারতবর্ষ সেগুলি লাভ করিয়াছে। স্বদেশীয় দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যকলার আলোচনা করিয়া তাহারই উন্নতি সাধনে প্রচেষ্ট হইতে হইবে। বিদেশের কোনও বস্তুরই আমাদের প্রয়োজন নাই। চিরকালই ত ভারতবর্ষ নিজ সভ্যতায় সমগ্র মানব-সমাজকে পরিচালিত করিয়াছে, তখন ইদানীং অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? ভারতে ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব্বে আমরা যখন আমাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া বাঁচিয়াছিলাম, তখন এখনও বাঁচিতে পারি। বিদেশীয় কলকারখানা প্রভৃতি বিজ্ঞানের পরিণতি কি জীবন

তাহা ত হাতে নাতেই দেখা যাইতেছে। আমরা তখন মোটা ভাত মোটা কাপড় সংস্থান করিয়া ধর্ম্মালোচনা দ্বারা যে শান্তিতে বর্ত্তমান ছিলাম সে শান্তি অপর কোন্ দেশে কে কবে ভোগ করিয়াছে! নশ্বর জগতের জন্য প্রাণপণে খাটিয়া কি হইবে! ইন্দ্রিয় সুখ যতই উৎকৃষ্ট হউক, উহা ক্ষণিক। যে ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া কত শত সংসার-তপ্ত মানব ভূমানন্দ লাভ করিতেছে—বাক্যবাগীশ তোমাদের কথা শুনিয়া আমরা উহা ত্যাগ করিতে অসমর্থ। সে স্বদেশী আমরা গ্রহণ করিব না যাহার প্রাণ বিদেশ-পর-তন্ত্র, স্বদেশী বক্তৃতা দিয়া বিদেশী ট্যাকসীতে চড়িয়া দরিদ্রের হস্ত পদ ভগ্ন করিয়া বাবু সেবনের নিমিত্ত পথে ভ্রমণ করিতে আমারা লজ্জা বোধ করি। অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশের নেতা সাজিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। তোমরা নিজেদের কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছ ভাবিয়া দেখ দেখি! ভারত মাতার তোমরা সকল সন্তান যখনই একত্রিত হও তখন তোমাদের এমন একটিও স্বদেশীয় ভাষা নাই যাহার দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মনোভাব বিদেশীয় ভাষার সাহায্য ব্যতীত প্রকাশ করিতে পার। আজ যদি সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতে তাহা হইলে তোমরা যখন সকল ভাইয়েরা একত্রিত হইতে তখন পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিতে। আমরা জানি এমন লোকও আছেন যাঁহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন ইংরাজী ভাষায়—নচেৎ তাঁহাদের মনোভাব যথাযথ ভাবে স্ফূর্ত্তি হয় না। আবার স্বদেশীয় দর্শনবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কতকগুলি আধুনিক ভোগপরতন্ত্র বাক-যুক্তিসম্পন্ন বিদেশীয় মতবাদ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত ভাষার আবরণে এক জাল ধর্ম্মের বিক্রয় করিয়া বহু যশ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছেন। বল দেখি ইহারা স্বদেশের উন্নতি সাধক—না স্বধর্ম্ম ত্যাগী, জনসাধারণকে বিপথে পরিচালনকারী দেশ-দ্রোহী বিশ্বাস ঘাতক।

গোঁড়ামী হৃদয়ের সংকীর্ণতার পরিচায়ক বটে কিন্তু তাহাদের একটি নিজস্ব দাঁড়াইবার স্থান আছে, যেখান হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে এবং যে ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া যাহা হউক একটা কিছু জাতীয়তার

গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। যথোপযুক্ত দরজা জানালা না থাকায় স্বাস্থ্যকর বহির্বায়ু সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ বটে কিন্তু তাঁহাদের একটা মাথা গুঁজিবার স্থান আছে। ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নতি বা অবনতি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে অপেক্ষা করে। মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে তখনই পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খাদ্যের দ্বারা নিজ ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির বা জাতির আত্মবিশ্বাস নাই সে ব্যক্তির বা জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে কি প্রকারে—মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য—আবহের সংঘর্ষে তাহাকে প্রস্তর কাষ্ঠের ন্যায় হাওয়ায় বিলীন হইয়া যাইতেই হইবে। আত্মবিশ্বাসই ব্যক্তির প্রাণ। ব্যক্তিগত আত্মশক্তির বিকাশে জাতিগত শক্তির স্ফুরণ হয়। কিন্তু বহির্দেশ হইতে যদি স্বাস্থ্যকর খাদ্য সংগ্রহ না করিয়া প্রাণ দেহের পুষ্টি সাধন না করা যায় তাহা হইলে প্রাণের উৎক্রামণ অবসম্ভাবী। সকল শক্তিই আত্মাতে নিহিত কিন্তু সেই শক্তিসাধনা পূর্ণ করিতে হইলে তাহার আবশ্যক বহিঃপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া। দেবতা প্রস্তরাভ্যন্তরে নিহিত—দেবতাকে মূর্ত্ত করিতে হইলে যন্ত্রের প্রয়োজন। যেমন স্বর্ণের স্বার্থকতা কুণ্ডলাদিতে তেমনি আত্মার স্বার্থকতা তাঁহার অনন্ত মহিমার বিকাশে। সমাধি বা সিদ্ধি অর্থে জড়ত্ব নহে শক্তির পূর্ণত্ব—মুগ্ধ ভারতী, শান্ত শূন্যে পর্দা চড়াইয়া নিতির ঝঙ্কারে সেই অসীমের সাম তুলিতে গিয়া স্বীয় বীণার কোমল তন্ত্রী ছিন্ন করিয়া মূক-বৎ অবস্থান করিতেছেন। বিদ্যা সেখানে স্তব্ধ বটে কিন্তু পূর্ণত্বকে বিকাশ করিবার তিনিই প্রথম শিক্ষয়িত্রী। সেই হেতু প্রথম কর্ত্তব্য—প্রতি পল্লীহৃদয়ে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—যেখানকার আদি শিক্ষা হইবে আত্মার মহিমা—যাঁহাকে লাভ করিয়া পিতা পুত্রকে বলিতে পারিবেন---অভিঃ। অমর করিবার জন্য মাতা স্তন্য দুগ্ধের সহিত শিশুকে পান করাইবেন বেদ-নিঃসৃত অমৃত—নিত্যোহসি, বুদ্ধোহসি নিরঞ্জনোহসি। অধোবদন শিষ্যকে কহিবেন গুরু 'ক্লৈব্যমাস্মগম' ক্লীবত্ব ত্যাগ কর—বৎস, ইহা তোমার সাজে না—তুমি যে অমৃতের পুত্র! তুমি যে অবিনাশী!

বিদ্যা যে পূর্ণতাকে উপদেশ করে ধর্ম্ম তাহাকে দেবতারূপে মূর্ত্ত করিয়া তুলে। সেই হেতু বিদ্যা মন্দিরের পার্শ্বে ধর্ম্ম মন্দিরের প্রয়োজন। ধর্ম্ম-দেবতা তাঁহার যমনিয়ম, ত্যাগতপস্যা, পূজাহোম, জপ-ধ্যানের মধ্য দিয়া বিদ্যার অভিধেয় বস্তুকে অনুভব করিতে শিক্ষা দিবেন। এইরূপ শিক্ষার ফলে প্রাচীন ভারতে বশিষ্ঠ, রাম এবং ভীষ্মের ন্যায় চরিত্র প্রকটিত হইয়া ভারতভূমি পবিত্র হইয়াছে। আবার এই ধর্ম্মদেবতা তাঁহার বিধি নিষেধের মধ্যদিয়া স্ত্রীচরিত্রে ত্যাগের আদর্শ এরূপ অদ্ভুত রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে সাবিত্রী এবং সীতার ন্যায় চরিত্র জগতের অপর কোনও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম দেবতাকে ইহাই প্রমাণকরিতে হইবে বেদাদি শাস্ত্র কেবল কথার কথা নয়—অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা শ্রীভগবানের বিচিত্রময়ী অপূর্ব্ব লীলা ও নিত্যাবস্থা পঞ্চেন্দ্রিয় অগ্রাহ্য জগতে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহারই সংগ্রহ মাত্র। বেদাদি শাস্ত্রের মধ্যে যাঁহারা কেবলমাত্র ইতিহাস এবং কাব্যের অনুসন্ধান করেন সেই পল্লবগ্রাহীরা সেই কামধুকার নিকট তাহাই প্রাপ্ত হন কিন্তু উহাতেই উহার মর্য্যাদা নহে। সম্মুখে চন্দন বৃক্ষ দেখিয়া তৃপ্ত হইলে চলিবে না, শাস্ত্রীয় সাধন মার্গ অবলম্বন করিয়া 'এগিয়ে' পড়িতে হইবে এবং সেই ধর্ম্ম জীবনে যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরকাদি নানা রত্নের খনি দেখিয়া পথিক মুগ্ধ হইবেন।

ধর্ম্মই হিন্দুর প্রাণ পাখী। যতদিন পর্য্যন্ত কোন ব্যাধি এই প্রাণ পাখীর সন্ধান না পাইবে ততদিন এজাতির সর্ব্বনাশ করিবার সকল প্রচেষ্টাই বৃথা। অল্পদিনের পরাধীনতায় বা অত্যাচারে ছোট বড় কত জাতি কর্পূরের মত উপিয়া গেল—কিন্তু 'এ জাতটা ম'ল না কেন'! সহস্র বৎসর ধরিয়া ত চেষ্টা কর' হইয়াছে—পশু বলের দ্বারা, সমাজে ব্যভিচার সৃষ্টি করিয়া, কৌশলে দেশকে দরিদ্র করিয়া প্রভৃতি নানা ভাবে নানা চেষ্টা দ্বারাও হিন্দু জাতির প্রাণ যায় না কেন? কারণ আমরা সব ছাড়িয়াছি, সব ভুলিয়াছি কিন্তু প্রাণপাখীটাকে আমরা এখনও ছাড়ি নাই। কিন্তু বহিঃশক্তির প্রবল আঘাতে রক্তহীন

দেহের শিথিল মুষ্টি হইতে প্রাণ পাখী প্রায় উড়িয়া যাইবার দাখিল—ষাট কোটী হিন্দু সন্তান ধীরে বিশ কোটীতে পর্য্যবসিত। এমন সময় দেবতা প্রসন্ন হইলেন—দেবমানব রূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মকে নিজেই রক্ষা করিলেন নিজ জীবনে পরিস্ফুট করিয়া। দেখাইলেন ধর্ম্ম একটা ফক্কিকারী নয—উহার প্রতিবর্ণ সত্য—উহার প্রত্যেক দেবতা সত্য—উহার প্রত্যেক ভাব সত্য—অসত্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তা সেই চালবাজ, মতলবীর ধর্ম্ম প্রচার। ধর্ম্মের আবরণে ভোগ এ ত্যাগ-ভূমি ভারতবর্ষে চলিবে না—ফাঁকি নিজেকে দেওয়া যায়, পাড়াপর্শীকে দেওয়া যায়, সমাজকে দেওয়া যায়, সমগ্র মানুষকে দেওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে দেওয়া যায় না—তিনি ধরিয়া ফেলিবেন। মন্দির, বিহার, চার্চ্চ, ক্যাথিড্রল তৈয়ারি কর ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি উহা ত্যাগের ভিত্তিতে নির্ম্মিত না হয় তাহা হইলে দেবতার আবির্ভাব উহাতে হইবে না—উহার ধ্বংস অনিবার্য্য। দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়া দেবতার নামে নিজেদের ভোগসৌধ নির্ম্মাণ যখনই করিবে তখনই তাহা চূর্ণ করিয়া দিতে এ্যাটীলা, মামুদ, কাইজার, প্রভৃতির আবির্ভাব হইবে। ত্যাগের মঞ্চে পুনরায় শ্রীভগবান্ তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকাশিত করিবেন বলিয়া—ভোগের আবর্জ্জনা পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য সে সকল পশু শক্তি তাঁহার প্রেরণা, বুঝিতে হইবে।

মানব মনে ত্যাগ ও ভোগের লড়াই চির কালই চলিয়াছে। এ সংগ্রাম প্রবাহকারে নিত্য। মনুষ্য বহু অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছে—ভোগের ফল 'অল্প' এবং ত্যাগের ফল 'ভূমা'। সে যুদ্ধে ত্যাগের জয়ে মানবের পরম শান্তি নির্ভর করে, কিন্তু ভোগ-নাগ তাহার সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া বহুবার মনুষ্য সমাজকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। মহামোহ তাঁহার চার্ব্বাক গুরুর ভোগমন্ত্র বলে বহুবার ধর্ম্মরাজকে পরাভূত করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবারই জ্ঞান সিন্ধু হইতে মায়া মিহিকার সকল কুহেলিকা ভেদ পূর্ব্বক বৈরাগ্য চন্দ্র উদিত হইয়া ভক্তি কৌমুদী দ্বারা মুক্তির দুর্গম পথ আলোকিত করিয়াছে। ভোগবাদ নানাযুগে নানা ভাবে ভক্তি-জ্ঞান প্রাণ বেদান্ত ধর্ম্মকে কলুষিত করিয়াছে। একবার

অতি প্রাচীন কালে নাস্তিকবাদীদের আদি পুরুষ তাঁহার ভোগ-পর-তন্ত্র প্রত্যক্ষ যুক্তির সাহায্যে বেদ—'ভণ্ড, ধূর্ত্ত নিশাচর কর্ত্তৃক প্রচারিত' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি ভোগ ছলেব সকল আবরণ ত্যাগ করিয়া 'সুখদুঃখময় সংসার হইতে, কাঁটা ত্যাগ করিয়া গোলাপ চয়নের ন্যায় সুখ চয়ন' করিতে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে যতদিন জীবন ধারণ করিতে হইবে ততদিন সুখেই কাটান কর্ত্তব্য—'ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করা উচিৎ'। কিন্তু যখন এই নিবাববণ ভোগবাদ ভাবতীয় ঋষিরা যুক্তি সহায়ে নির্ম্মূল কবেন তখন উহা পূর্ব্বমীমাংসাব আববণে 'সহধর্ম্মিণী' এবং 'সোম'কে উপলক্ষ কবিয়া স্বর্গে অপ্সবাদি অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয় ভোগাদর্শ প্রতিষ্ঠা কবিযা ত্যাগ ধর্ম্মেব সর্ব্বনাশ সাধন কবিবার উপক্রম কবিযাছিল। পবন্তু বেদ-ব্রাহ্মণে যে ধর্ম্ম নির্দ্ধাবিত আছে, উহা সাধারণ অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সকলকে নিয়মিত করিবাব জন্য। শিশুকে যেমন মিষ্টের মধ্য দিযা তিক্ত ঔষধ সেবন কবান হয় সেইরূপ নানা বিধি-নিষেধেব দ্বাবা সংযমিত আপাতপ্রতীযমান ভোগ প্রচার করা হইয়াছিল। উহা বিস্মৃত হইযা যখন ভোগই ভাবতেব আদর্শে পবিণত হইবার উপক্রম হয়, তখনই শ্রীব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহা নিরাশ পূর্ব্বক বেদান্ত ধর্ম্মেব প্রতিষ্ঠা কবিযা ত্যাগকেই আদর্শ করিয়া যান। পুনবায যখন এই ত্যাগ ধর্ম্ম শিথিল হইযা আসিল তখন শ্রীবুদ্ধ উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবেন। কিন্তু কাল দুবতিক্রমনীয়! কালে শ্রীভগবান্ বুদ্ধের অতি-ত্যাগধর্ম্মও মানবেব ভোগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয নাই। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভোগবাজ তন্ত্রেব পঞ্চ 'ম'-কারেব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ত্যাগেব মূলে কুঠারাঘাত কবিয়া সমাজে নানা অকথ্য ব্যভিচাবের সৃষ্টি করিল। ইত্যবসরে অন্তঃসারশূন্য ভাবতভূমি দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যখন মৃত্যুচিন্তা করিতেছিল—তখন ভারতমাতা তাঁহার শ্রীশঙ্করাদি অষ্টাদশ আচার্য্যকে প্রসব করিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য, নানকাদি অতি-মানবেরা জন্মগ্রহণ কবিয়া অর্দ্ধমৃত দেশকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

কিন্তু ভারতের এই যুগ যুগ ব্যাপী সাধনা অদ্য পণ্ড হইতে বসিয়াছে! ভোগরাজ ইন্দ্রাসুচর বসন্ত আজ সুযোগ বুঝিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতারূপে

ভারতের মঠ, মন্দির, আশ্রম ভাঙ্গিয়া অসুর-ভোগ্য বিলাস-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কাকলীপ্রিয় বসন্ত-সখা মনোভব ভারতীয় ছন্দগীতির মধ্যে প্রতিষ্ঠ হইয়া নিজ কুসুমধনু সিঞ্জন পূর্ব্বক পঞ্চশরে যোগী হৃদয় পুনঃপুনঃ বিদ্ধ করিতেছে—কখন বা কোন্ অজানা দেবসুখের গন্ধর্ব্বনগরী সৃষ্টি করিয়া এই বিরাট যোগীর সিদ্ধ আসন টলাইবার চেষ্টায় উৎফুল্ল হইয়াছে! কিন্তু যোগ-বিঘ্নকারী হে দেবতা-অসুর এখনও সতর্ক হও! যোগীর চক্ষু উন্মিলীত হইতেছে দেখিয়া ভাবিতেছ তোমাদের লীলাবিলাস যোগীর চিত্ত নির্ব্বাণ-পদবী হইতে চ্যুত করিয়া বাস্তব জগতে নামাইয়া আনিতেছে—তোমার সৃষ্ট ইন্দ্রজাল পুরীতে প্রবেশের নিমিত্ত বা তোমার মোহিনী সঙ্গীত উপভোগের নিমিত্ত, না—উহা তোমাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া মহাশ্মশানে তাণ্ডব নৃত্য করিবার জন্য। চাহিয়া দেখ চক্ষে কি সর্ব্ব-বিধ্বংসী অনলের প্রলয় সমাবেশ—উহা তোমার অজানা দেশের হীরক-পুষ্পিত, চির-কৌমুদী-উদ্ভাসিত বিলাসের গন্ধর্ব্ব নগরী পলকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিবে। ভিখারী সব ত তোমাদের দিয়াছে—তাহার কুবের-ভাণ্ডার সব ত তোমরা লুটিয়াছ। নিজে উপবাসী হইয়া তোমাদের খাওয়াইতেছে—আরে 'ভাবের ঘরের চোর'। শেষে তুমি তাহার ধর্ম্ম কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ।

কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন—বীজাঙ্কুরের ন্যায় ত্যাগ ও ভোগের অভ্যুত্থান ও পতন যখন অনিবার্য্য, তখন কোনটী যথার্থ তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? উত্তরে আমরা বলি—ভোগ ইহকালের বা পরকালের ক্ষণিক সুখ উৎপাদন করিতে পারে সত্য, পরন্তু উহা ত্রিতাপের জনয়িতা। স্বাস্থ্য ও ব্যাধির ক্রম শরীরে যথার্থ বটে, কিন্তু মানবের স্বতঃচেষ্টাই শরীরের ব্যাধি অপসারিত করা। শরীরে ব্যাধি অনিবার্য্য বলিয়া কেহ স্বাস্থ্যকে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ নহে। অমৃতত্বে বা চরমসুখে আমাদের জন্মগত সত্ব আছে কারণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উহা উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং আমাদিগকেই উহার সত্বাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। যেমন কোনও দুষ্ট ব্যক্তি ভোগার্হ জ্ঞানে পণ্ডিতের পুস্তক পেটিকা অপলাভ করে, কিন্তু পেটিকা ভগ্ন করিয়া দুর্বিজ্ঞেয় গ্রন্থরাশি

দেখিয়া হতাশ হয় এবং পরে উহা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া নষ্ট করে। সেইরূপ আধুনিক ভোগবিলাস আমাদের বহুকালের রত্নপেটিকা অপলাভ করিয়া ভগ্ন করত উহার মধ্যস্থ ত্যাগ, অপবর্গ প্রভৃতি বহুমূল্য মণি অব্যবহার্য্য জ্ঞানে নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছিল। এক্ষণে আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—সেই রত্নপেটিকা যাহা ইদানীং এক অতিমানব উদ্ধার করিয়াছেন—যিনি সকল ধর্ম্মের অবতার তাহাকেই প্রতি পল্লীর ধর্ম্ম-মন্দিরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া—বিদ্যা-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম সাধনা শিক্ষা।

যেমন ধর্ম্মমন্দিরের এক পার্শ্বে পরা বিদ্যা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে সেইরূপ অপর পার্শ্বে অপরা-বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। যেমন কারুকার্য্য অট্টালিকার শোভা সম্পাদন করে, প্রাচীর আবার সেই সুন্দর প্রসাদকে রক্ষা করে—সেইরূপ অপরা-বিজ্ঞান ধর্ম্মও বিদ্যার শোভা সম্পাদন এবং রক্ষা করে। আবার যেমন উদ্যানে আগাছা জন্মিলে তাহা নিড়াইয়া দিতে হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম বিদ্যোদানে কুসংস্কার, কুপ্রথারূপ আগাছা জন্মিলে তাহা বিজ্ঞান-নিড়ানি দ্বারাই উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে। আর আধুনিক বিজ্ঞান-কুশলীদের প্রধান কর্ত্তব্য—ভারতেতর দেশসমূহহইতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সত্য সকল আনয়ন করিয়া কৃষি, শীল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিয়া ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায় স্বরূপ এই বিরাট দেহের পুষ্টিসাধন। দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য ছুঁচ, সুতা, কাপড়, কাগজ, পেন্সিল, সেলাইয়ের কল, টাইপ রাইটার হইতে আরম্ভ করিয়া টেলিফোঁ, টেলিগ্রাম, রেলওয়ে, ষ্টীমার, মোটর, ট্রাম, তারহীন বার্ত্তাবহ, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ প্রভৃতি বিজ্ঞানের আধুনিক চরম পরিণাম সকল দেশে প্রস্তুত ও প্রচলনের জন্য লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানসেবীদের জীবনের একমাত্র ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রত পালন করিতে হইবে সহরের বৈদ্যুতিক আলোকে বসিয়া নয়, অন্ধকারময়ী পল্লীর নিভৃতকুঞ্জে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া। পল্লীতেই ভারতের প্রাণ—সভা, সমিতি, হাঁসপাতাল, কলেজ, স্কুল, মঠ, মন্দির যাহা খুলিতে চাও তাহা পল্লীতেই খুলিতে হইবে তাহা হইলেই অনভিজ্ঞ পাড়াগেঁয়েরা তোমাদের

উচ্চ চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়া তোমাদের সমকক্ষ ও সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।

অনেকেই ভয় পান, যদি পাশ্চাত্য অপরা-বিজ্ঞান আমাদের ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিত্তি শীথিল করিয়া উহার ধ্বংস সাধন করে। আমরা বলি ভয় পাইবার কিছুই নাই—যাহা সত্য তাহা অবিনাশী, তাহার প্রকটন অবশ্যম্ভাবী; আর যাহা অসত্য, জীর্ণ তাহা নষ্ট হইলে ক্ষতি কি? অসত্য স্থলে যদি নব সত্যের প্রকাশ ঘটে, জীর্ণের স্থলে যদি নূতন আসে তাহাতে ভয়ের কোনও কারন নাই। শ্রীভগবান্ ভারতীয় এবং ভারতেতর প্রদেশের সকল মন্দিরের বহুকালের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা ভস্ম করিবার জন্য পাশ্চাত্য রজঃবহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছেন। এই প্রলয়ানল জগতের সকল অব্যবহার্য্য আবর্জ্জনা ভস্ম করিয়া সত্যস্বর্ণকে আরও উজ্জ্বল করিয়া প্রকটিত করিবে। এক্ষণে আমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য এই যে প্রতি পল্লীতে ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের পার্শ্বে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া অধিষ্ঠাতৃর নিকট আমরা মহিমাকে লাভ করিব। যে জাতি সমগ্র দেশটাকে একটা বিরাট মঠে পরিণত করিতে চায় সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য, আবার যে জাতি সমগ্র দেশটাকে একটা বিপুল দুর্গে পরিণত করিতে চায় সে জাতিরও ধ্বংস অনিবার্য্য। সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্যা ও জড়বিজ্ঞানের নিয়মণ আমাদিগকে করিতে হইবে ধর্ম্ম-মন্দিরে। জড় সমুদ্র মন্থন করিয়া নানা ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায় সত্য, কিন্তু উহা হইতে যে কালকূট উত্থিত হইবে তাঁহাকে লীলায় কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য যে তপস্যার প্রয়োজন তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। পুনশ্চ গরল প্রাণ সংহার করে বটে, কিন্তু উপযুক্ত অনুপান সংযোগে সুধার সমতুল কার্য্যকরী হয়।

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।)

(১)

মনুষ্যত্ব কি ?

যদি প্রশ্ন করা যায় পশু হইতে মানবের বিশেষত্ব কি, তবে সহজ উত্তর এই যে হিতাহিত বিবেচনায় ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে। কিন্তু প্রশ্নটি জটিল—উত্তরও বিষদ হয় নাই। অনেক স্থলে দেখা যায় মানুষ যেখানে বিবেচনা করিয়া হিত অপেক্ষা অহিতেরই পক্ষপাতী হয়, নিম্নস্থ প্রাণী সেখানে স্বাভাবিক সংস্কারে হিত-পথই গ্রহণ করে; ধর্ম্ম-বুদ্ধি বলিতেও অনেক সময় ভয় ও দুর্ব্বলতা-প্রসূত সংস্কার বুঝায়—স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় বুঝায়, অথবা কতকগুলি বিধি-নিষেধের অনুসরণ বুঝায়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম এই সংজ্ঞা মানুষ নানা সময়ে নানা অর্থে ব্যবহার করে।

দেশভেদে ও কালভেদেও ধর্ম্ম নানা দেশে অবস্থানুযায়ী নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে, কিন্তু এক ভাবে বিচার করিলে মানুষ মাত্রই সমধর্ম্মী—সকল মানবের একই আদর্শ। মানুষ যদি নিজেকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করে তবে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, জগতে মানবের একই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম আছে—তাহা মনুষ্যত্ব বা আধ্যাত্মিকতা।

প্রত্যেক মানবের জীবনই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী বিভিন্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, একদিক্ দিয়া সে জড়ধর্ম্মী, অপরদিক্ দিয়া সে প্রাণধর্ম্মী। ক্ষুধা তৃষ্ণা, আরামের আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুভীতি এইগুলি জড় ধর্ম্মের লক্ষণ, এবং যে মহত্তর ভাবের ক্রম বিকাশে মানব এই জড়ধর্ম্মগুলি তুচ্ছ করিতে পারে তাহাই মানবের প্রাণধর্ম্ম—মনুষ্যত্ব বা আধ্যাত্মিকতা।

মানুষের বিকাশের নিম্নাবস্থায় সে নিম্নতর প্রাণীর ন্যায় প্রাকৃতিক

জড়জগতেরই আদর্শগুলিই গ্রহণ করে। যতক্ষণ না সে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আস্বাদ লাভ করে, ততক্ষণ সে অপর প্রাণী শ্রেণীরই অন্তর্গত একটী প্রাণী মাত্র—তবে কিঞ্চিৎ উন্নততর প্রাণী। যেমন কীট পতঙ্গ হইতে মেরুদণ্ডী জীব উন্নততর, এরূপ স্থলে সেই হিসাবেই মানব অন্য প্রাণী অপেক্ষা উন্নততর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখচেষ্টা অন্য প্রাণীতে যেরূপ মানবেও সেইরূপ, তবে বুদ্ধির দ্বারা মার্জ্জিত হইয়া কিঞ্চিৎ সংস্কৃতরূপে প্রকাশ পায় মাত্র। অন্য জীব অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ মানব—যাহা তাহার পক্ষে সুবিধা, যাহাতে সুখের পথে অবাধে চলিতে পারা যায়—যাহাতে অসুবিধা ও কষ্টের হাত এড়াইতে পারা যায়—তাহার প্রচলিত নীতিগুলি সেই প্রণালীতে গড়িয়া লয়। তাহার সামাজিক নিয়ম—লোকানুমোদিত সহজ পথে আত্মস্বার্থের স্রোতের অনুকূলে নৌকা বহিয়া যাওয়া, জড়জগৎ অথবা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণতঃ তাহাকে ইহার উপরে লইয়া যায় না।

সেইজন্য মানবের সাধারণ জীবনে ও আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক প্রভেদ। এ প্রভেদ পরিণামের প্রভেদ নহে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুর প্রভেদ। সাধারণ জীবনের একটা সীমা আছে,—তাহার উন্নতি সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। যেমন, যন্ত্রও বিজ্ঞানবলে সংশোধিত হইয়া উন্নত হইতে উন্নততর হইতেছে তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা অনেকগুণে বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু তথাপি সে যন্ত্রই রহিয়া যাইতেছে। কিন্তু মানবে জড়ত্বও আছে, আবার ব্রহ্মত্বও আছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটী অংশে মানবজীবন গঠিত—একটী তাহার যান্ত্রিক জীবন, আর একটী স্বাধীন জীবন। একদিক দিয়া জড়শক্তি তাহাকে গতানুগতিক জীবন যাত্রার পথে পরিচালিত করিতেছে, অপরদিক্ দিয়া মানবে মনুষ্যত্বরূপে প্রকাশিত এক চৈতন্যময়ী শক্তি জড়শক্তির দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মশক্তিতে আপনাকে ক্রমশঃ পূর্ণতর স্বাধীনতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কিনা—দর্শন শাস্ত্রের এই সমস্যা অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমরা এই মুহূর্ত্তে যাহা করিতেছি,

তাহা নিজের ইচ্ছায় করিতেছি অথবা ইহা আমাদিগকে করিতে হইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল, আমরা কেবল যন্ত্রবৎ যথাযথ তাহাই করিয়া আসিতেছি—এ সমস্যা বোধ করি তর্কের দ্বারা মীমাংসিত হইবার নহে। যদি হইত তাহা হইলে ইহা লইয়া দর্শন শাস্ত্রে এত তর্ক, বিতর্ক থাকিত না। তবে সহজ ভাবে এটুকু বুঝা যায়—আমাদের প্রত্যেক কার্য্য বা ইচ্ছা যদি পৃথক করিয়া বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহার মধ্যে স্বাধীনতার চিহ্ন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে সময়ে যে কার্য্য করি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তাহা এমন ভাবে নির্ভর করে যে, তাহার মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান আবার পূর্ব্বের কার্য্য ও অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ ব্যক্তিই জীবনে এমন কোন কার্য্যের উল্লেখ করিতে পারিবেন না—যে কার্য্যের সম্বন্ধে তিনি বলিতে পারেন আমি ইহা স্বাধীন ভাবে করিয়াছি। কিন্তু এরূপ অংশতঃ বিচার না করিয়া সমগ্র জীবনটী অখণ্ডভাবে বিচার করিয়া দেখিলে—দেশ-কাল ও নিমিত্তের উপরেই কার্য্যের দায়িত্বের ভার দিয়া মানব সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। তাহার বাহিরের কার্য্য-পরম্পরা হেতু-পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া যান্ত্রিক ভাবে চলিয়া যায় বটে, কিন্তু এই কার্য্য-শৃঙ্খলের মূলে সম্ভবতঃ তাহার কতকটা স্বাধীনতা আছে। স্বকৃত কার্য্যের জন্য তীব্র অনুতাপ মানব মনে ক্ষণে ক্ষণে এই ভাব প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে—'এরূপ না করিয়া আমি অন্যরূপও করিতে পারিতাম'। স্বাধীন ইচ্ছার কোন অস্তিত্ব না থাকিলে মানব মনে ঐরূপ ভাবের ছায়াপাত হইতে পারিত না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় ব্যক্তিগত বিশেষত্বে একটী আদর্শ গঠন করিয়া কার্য্যে তাহা প্রকাশ করে। এই আদর্শগঠন ও চরিত্র সম্বন্ধে নিজের নিকটেই সে দায়ী। ঘটনাবলীর সংশ্রয়ে ও সাময়িক অবস্থানুসারে যদিও চরিত্র মাত্রই পরিস্ফুট হয়, তথাপিও যখন আমরা নিজের চরিত্র ও আদর্শ নিজে স্বতন্ত্র ভাবে গঠন করিতেছি তখন তাহাতে কিছু না কিছু স্বাধীনতা আছেই। একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায়

স্বত্বাতে চালিত দুইজন ব্যক্তির কার্য্য প্রণালীতে যখন ঐক্য দেখা যায় না—তখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইতেই হয়। এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের দ্বারাই—মানবের যে মনুষ্যত্ব বা স্বাধীনতা বলিয়া একটী বিশেষ অধিকার আছে—তাহা প্রকাশ পায়।

আধ্যাত্মিকতা কি? এক কথায় ইহার উত্তর—যে মহান্ ভাব শত সহস্র তুচ্ছতার উর্দ্ধে মানবকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে—তাহাই মনুষ্যত্ব বা আধ্যাত্মিকতা। দেশ-কাল-নিমিত্ত পরিচালিত যান্ত্রিক জীবনের অতিরিক্ত সীমাহীন অনন্ত জীবনের নব নব রূপবৈচিত্র্যে আধ্যাত্মিকতাই প্রকাশ-স্বরূপ। যেমন সূর্য্য হইতে বিচিত্র বর্ণে আলোক কণা বিচ্ছুরিত হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিকতা হইতে ভক্তি, প্রেম, বীর্য্য, দয়া ও আত্মত্যাগ প্রভৃতি ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণের ন্যায় নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশ পাইতেছে, এবং সেই বৈচিত্র্যের প্রত্যেক স্পন্দনই নব নব ভাবে নূতন করিয়া জগতকে জানাইতেছে—মানুষ মানুষ—মনুষ্যত্বই তাহার প্রাণধর্ম্ম, জড়ের দাসত্ব কেবল বহিরাবরণ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

বিবেকানন্দের মানসী-নারী।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী।)

শিরোনামা দেখিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিতে পারেন—সুতরাং একটা স্পষ্টতার প্রয়োজন বুঝিয়া প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি, স্বামীজির মনে নারীত্বের যে আদর্শ পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহাকেই তাঁহার মানসী নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। এই সন্ন্যাস-কেশরীর স্ত্রীজাতি বিষয়ক মনস্তত্ব মধ্যে, শুদ্ধ নিষ্পাপ অনাবিল ত্যাগীর জীবনের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ও সম্বন্ধের প্রসার কতটা তাহা লক্ষিত হইবে।

অতীতের অনুশাসন-বাক্যাবলীর মধ্যে আত্মনির্দ্দেশ লাভ করিতে সচেষ্ট হইলে বিংশ শতাব্দীর জাগরণোদ্দীপ্ত নারীর মন স্বতঃই দিশেহারা হইয়া পড়ে। নিন্দা ও স্তুতি, ভরসা ও অভিসম্পাত পাশাপাশি এমন ভাবে সাজান আছে যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা ইহার মীমাংসা সত্যই কঠিন। গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হয়—আমাদের পুরোবর্ত্তিনীরা সীতা দয়মন্তী মূর্ত্তিতে তোমাদের জীবন তরুতে মালতী চামেলী যুথিকা ফুটাইয়া গেলেন তবুও তোমাদের মন পরিপূর্ণ হইল না, তবুও তাহা যথেষ্ট হইল না যে আমাদের ভাগ্য সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তোমরা করিয়া ফেল। সকল সত্ত্বেও তোমরা সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত করিয়া আসিতেছ। পৃথিবীর অপরাপর প্রান্তে আমাদের ভগিনীরা আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই উদ্যোগী হইয়া করাইয়া লইয়াছেন। আত্মিক উৎকর্ষে দৃষ্টি আকর্ষনের পরিবর্ত্তে বাহ্যিক শক্তির সহায়ের অপর পন্থাটাই তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন—সেটা কি তবে গুণ? তোমাদের কাছে তাহাই কি যথাযোগ্য ব্যবস্থা?

কিন্ত পরিতাপ অরণ্যে রোদন। বরং শ্রেয়ঃ ও টোবাবালির দিকে না যাওয়া।

যখন বর্ত্তমানে এমন সব আধিকারিক পুরুষের আবির্ভাব দেখিতেছি যাহারা অতীতেরই সমস্ত মহিমাকে জীবনে প্রকাশ দিতে পারিতেছেন, তখন আর জীর্ণ পত্রাবলীর মধ্যে অন্বেষণ কেন? আমরা তাঁহাদেরই মনোমধ্যে আত্মনির্দ্দেশ লাভ করিব—বিশ্বাস করিব আমাদিগের জন্য নবযুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

ওগো! ঢাকিয়া ফেল অতীতের সেই সকল সুললিত সুবিন্যস্ত বাক্যবলী গ্রথিত ছন্দঃবল্লরী—যাহা আমাদের এই দেহটা যে মদনের অধিরোহন পীঠ তাহারই বর্ণনায় কবিত্বের অমরকীর্ত্তি যাচ্ঞা করিযাছে। ক্ষণিকের জন্য একটু নিবৃত্ত কর সেই সকল বিধি-ব্যবস্থা দাতাদের বাক্যাবলী—যাহাদের মন লোলুপ আগ্রহে আমাদের দাসত্ব আর অধীনতার লৌহনিগড় কল্পনাতেই বিভোর হইয়া জীবনের চতুর্দ্দিকে তাহার

মায়াজাল রচনা করিয়াছে—আর কোনও দিক দিয়াই আমাদের কথা চিন্তা করে নাই, আমাদের আর কোনও ধর্ম্ম দিতে সম্মত হয় নাই।*

আর কি সত্যের সিংহ গর্জ্জন আমাদের কাণের কাছে কেহ স্তব্ধ করিতে পারে যে মানুষের মধ্যকার মানুষ এই দেহটা নহে;—দেহ তাহারই প্রান্তবিলম্বী একটী ছায়া যেটাকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি আপনার রঙ্গময়ী বর্ণবিচিত্র প্রকট করিতেছে। দেহাতীত অথচ দেহারূঢ় এক পরম সত্তাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ। সেখানে নারী নাই, নর নাই, কাম-মোহের অস্তিত্ব নাই।—সে সকলের অবস্থান এই প্রকৃতি মধ্যে।

এখন যে আমরা দেখিতেছি বিশ্ববিধানচ্যুত কৃত্রিম বিধিব্যবস্থাই মানবের অবলম্বন, যে আবহাওযায় জীবন-উদ্যানে ছত্রক জন্মিতে পারে, মহীরুহ জন্মে না—তাহারই দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। ইহা কত দিনের সৃষ্টি কেমন করিয়া বলিব?—বুঝিতেছি আমাদের অবলম্বন-স্থান বিলুপ্ত। আমাদের পথও কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, আমাদের আশা "নলিনীদলগত-জলমিব", ভরসাও তদ্বৎ।

অতীত লেখমালায় যখন ভূমিকম্প বিদীর্ণা বসুন্ধরার মৃত্তিকা রাশির মত তত্ত্বে ও স্বার্থে বিশৃঙ্খলতা ও বিপর্য্যস্ততার মধ্যে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত তখন সে ভগ্নস্তূপ মধ্যে অনুসন্ধানে নিরত হইতে দোষ কি?—অতীতের সমস্ত মহিমা যাহাদের চরিত্রে প্রকট তাঁহাদের সত্তাই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, আমরা তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ বর্ত্তিনী হইব, এ কথার এখনও পুনরুক্তি করিতেছি।

অর্থাৎ বলিতেছি জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আমরা এই নব জীবনেরই যে অন্তর্নিহিত শিবত্ব তন্নির্দ্দেশানুযায়ী স্থির করিব, দশসহস্র বৎসরের প্রাচীনত্বের মোহে বিমুগ্ধ হইব না। জানি যাহা আমাদের যোগ্য

* কিন্তু অতীতের ভারতীয় ছন্দ-বল্লরী নারীজাতির কেবল দৈহিক মাধুরী বর্ণনায় আবদ্ধ ছিল না—উহা তাহার দেবীত্ব ও মাতৃত্বের আরাধনায় মুক্ত হইয়াছিল এবং অধুনাও হইতেছে।—উঃ সঃ।

তাঁহার বিধান আমাদের মধ্যেই থাকিবে, যদি কোনও জাগ্রতশক্তি আমাদের মাথার উপর নিয়ন্তারূপে সত্যই অবস্থান করে—সে যদি চালাইবার হয় চালাইবেই।

স্বামিজী অথবা ঠাকুরের মধ্যে জীবনের উপরকার সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব মুছিয়া গিয়া, সকল মানুষের অন্তর দেবতা যে জীবন রচনা করিতেছেন, যে জীবন বৃহতের, যে জীবন অনন্তের, তাহারই উদ্বোধন ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ স্পষ্ট কথায়, উপরের সেই শক্তি তাঁহাদের মধ্যে সেই সব মীমাংসা যুগের সত্য নিজস্ব করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যাহার সন্ধানে অতীতের চোরাবালিতে পড়িয়া আমরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি।

ঠাকুরের সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ স্থগিত রাখিলাম,—তিনি ত একটা মূর্ত্তি নহেন, তিনি সমস্ত মূর্ত্তি—সমস্ত ভাবের মধ্যে আত্মা কেমন করিয়া সামঞ্জস্য আনে তাহারই নিদর্শন। তিনি মানুষ নহেন, মানুষের ভিতরের সত্যটা।

কিন্তু বিবেকানন্দ যে তাহাই,—এ কথা বলিতে পারি না। সেখানে আত্মজ্ঞানের গভীরতায় আত্মস্বাতন্ত্র্য ডুবিয়া দিশেহারা হয় নাই—নিষ্কাম অনাশক্তির মধ্যেও কর্ম্মোত্তেজনা অব্যাহত ছিল। আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, চেষ্টা ছিল, মনও ছিল। ঠাকুর মানুষের আদর্শ—বিবেকানন্দ আদর্শ মানুষ। অর্থাৎ মানুষ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য যাহাকে লক্ষ্য করিবে ঠাকুর তাহাই, আর মানুষ যেমনটা হইলে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে বিবেকানন্দ তাহাই।

তিনি সন্ন্যাসী, কিন্তু চাহিয়া দেখ এই সন্ন্যাসীর ভিতরটায়—সেখানে জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা, স্বর্গ মর্ত্ত আলোড়ন করিয়া কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের উত্তেজনা,—এই সংসারের এই সাংসারিক জীবেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। অন্তরে সেই নিস্তব্ধতা সেই শান্তি, সেই ক্ষান্তি, যাহাকে পাইলে মানুষ নির্জ্জন গিরিগুহায় আপনাকে সমাহিত করিয়া অনন্ত কালের জন্য জগতের কথা বিস্মৃত হয়, আর বাহিরে তীব্র বিদ্যুৎশিখার মত দেশব্যাপী জড়তা আবিলতার মেঘমালাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ছুটিয়া বেড়াইবার প্রয়াস।

ইহার হেতু কোনও অহংকার নহে, কোনও প্রতিজ্ঞা বিশেষ নহে কোনও অভিসন্ধিও নহে।—ইহার হেতু তাঁহার আপনারই অন্তর্গূঢ় সিদ্ধস্বভাব।

ভক্তেরা নাম দিয়াছে সন্ন্যাস-কেশরী কিন্তু অতবড় কেশর পরিশোভিত নামের মধ্যদিয়া এই আধিকারিক পুরুষকে চিনিবার সুবিধা হয় কিনা জানি না। আমি এক কথায় তাঁহাকে চিনিতে চাই,—তিনি বৈরাগী। এ জগতে তিনি আত্মস্বভাব প্রতিবিম্ব দর্শন দুর্লভ দেখিলেন, তাই মিলনের আশায় উর্দ্ধমুখী হোমাগ্নি শিখার মত আপনাকে অনন্তের পানে মেলিয়া ধরিলেন। (God-consciousness) ভাগবৎ-উদ্দীপনা যে কি সে জ্ঞান ব্যতিরেকে এ কথা মানুষে ত বুঝে না। মুক্ত-আত্মা ভিন্ন সকলের বুঝা সাধ্যায়ত্ব নহে। কেমন করিয়া যে তিনি জগতেরই থাকিয়া জগতের সঙ্গে, জাগতিক সম্পর্কে মিশিলেন না, কেবল মলয়ার উচ্ছ্বসিত হিল্লোলের মত প্রান্ত হইতে প্রান্তাবধি পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়া গেলেন, এক কর্ম্মচক্র প্রবর্তনের অবিরত চেষ্টায়,—এইরূপ জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা হইতে পারে, জগৎ যেন এক বহুকালের অযত্ন-পরিত্যক্ত জীর্ণতরু, যে আসে সে ইহার শাখা পত্র ছিন্ন করে—ক্রমবিরল উৎপাদিকা শক্তি-সম্ভূত ফলাস্বাদ উপভোগে তৎপর হয়—অচিরেই যে তাহার যথাযোগ্য পরিচর্য্যার আবশ্যক ভ্রমেও তাহা মনোমধ্যে স্থান দেয় না। তিনি সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া একাকী আপন মনে ইহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে তাঁহার মত করিয়া দেখিতে শিখিলে উপলব্ধি হইবে,—তাঁহার জ্যোতিঃর তুলনায় এত বড় বৈভব-বৈচিত্রশালী জগতের সম্পদ্-ছটা কত তুচ্ছ—কত তুচ্ছ। জগতের এই বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ অস্থির প্রকৃতির প্রবাহ মাত্র। ইহার মধ্যে কিছুই নাই—সমস্তই নিশার স্বপ্ন সদৃশ। সত্য সে কথা। কিন্তু কেন সত্য?—সত্য এই জন্য যে ইহাদের মধ্যে প্রাণের চিরস্থায়ী তৃপ্তি কোথায়? তা যদি না পাইলাম তবে ইহাদের নির্ভর করিব কেমন করিয়া? মর্ত্ত আশার উৎফুল্লতায় সাধের উদ্যান সাজাইয়া আবার আমিই ত পরদিন স্বহস্তে তাহাতে আগুণ ধরাইতে পারি। তৃপ্তি

পাইব ভরসায় যাহাকে বচিযাছি তৃপ্তি দিতে অক্ষম হইলে সে তখন আমাব কে?

আপনাব দিক হইতে প্রাণেব মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত তৃপ্তি আব জগতেব অতৃপ্তি দূব কবিবাব জন্য ততোধিক অতৃপ্তি ইহাই স্বামিজীব বস্তুতন্ত্র। তিনি জগতেব চঞ্চলত্ব বুঝিয়াছিলেন,—এখানে শান্তিব আশা করেন নাই—ইহাই বৈবাগীব বৈবাগ্য। আবাব এই অশান্তিব মরুপ্রান্তবে শান্তিব প্রাবৃট মেঘ সঞ্চারে আপন আবেগে ফুলিযা উঠিযাছিলেন—ইহাই তাঁহাব বন্ধন।

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়
লভিব মুক্তিব স্বাদ—

সে স্বাদ কি স্বাদ তাহা তিনি জানিতেন। জানিতেন 'বৈরাগ্য সাধনের' মুক্তি মুক্তি নিঃসন্দেহ, কিন্তু চবম মুক্তি নহে। বন্ধনেব ভয়ও বন্ধন। সে ভয় অতিক্রম কবিযা মুক্তিব আবও সুদূব বিবত পবিধিমধ্যে পবিব্যাপ্ত হওযা তাহাই চবম মুক্তি।

এই মুক্তি নাবীব সংসর্গে সঙ্কুচিত হইবাব নয়,—সান্নিধ্যে ভীত হইবাব নয়। ভয় বব অপবদিক হইতে। নাবী উপলক্ষ্য করিযা যে বন্ধন,—নাবীর প্রতি আসক্তিব ভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত যে মোহ, সে সমস্তই এই মুক্তিব সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হইবাব কথা। সংসাব তাহাব কামিনী কুহক বক্ষা কবিবাব জন্য এইখানে সন্ন্যাসকে প্রতাবিত করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ন্যাস অপবিপক্ক। সন্ন্যাসেব প্রকৃত অবস্থা আসিলে সন্ন্যাসী তখন সমস্ত কথাই বুঝিতে পাবেন। নামই যখন থাকে না তখন সুনাম আব কুনাম কি। তথাপি এমনি একটা কল্পিত আবেশ সংসারেব বিধান মানাইযা লয। কিন্তু যে মুক্ত সে যদি সকল বিধানেব মূল বিধানকে একেক শবণ না কবিল তবে তাহার মুক্তি তখনও সময় ও সাধন সাপেক্ষ।

নাবী হইতে বিবেকানন্দ চিবকাল স্বতন্ত্র, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্যেব একটা বিশিষ্ট রূপ আছে,—একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে। সে কাহাবও অনুকবণ নহে—আপনার তপস্যা হইতে অভ্যুত্থিত। নাবীব সহিত যে তিনি আপনাব

ভাগ্য জড়িত করেন নাই, সংসারের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিতে পারেন নাই—তাহারই ফলস্বরূপ। সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন—নারী হইতে মুক্তি তাহারই পরিণাম।

—নারীকে নারী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যখন মুমুক্ষুত্বের যুক্তি হয়, তখন বুঝিতে হইবে মুমুক্ষুত্বের মধ্যে ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হইয়াছে। সে শীঘ্রই অপর একটা কিছু রূপান্তর ধরিবে। তাহাকে প্রত্যাখ্যান কর, পরিত্যাগ কর, তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে চলিয়া যাও, যদি দেখ সে তাহার বিকৃত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। সত্যই ত এমন করিয়া জড় মনের বোঝাবহন পুরুষ ত আপনার জাতিগত স্বভাব করিয়া লইতে পারে নাই। এমন স্বচ্ছন্দে দুইহাত বাড়াইয়া, আষ্টে পিষ্টে গলায় মোহের ফাঁস পরিয়া, নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার মনে পুরুষের জাতিটাত বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহার আপনার গুণেই মোহ তাহাকে সংসার সৃষ্টির বার আনা উপাদান রূপে কাজে লাগাইয়াছে।

ত্যাগ করিতে হইবে এই সংসার, যাহার ভাব, ভঙ্গী, দৃষ্টির প্রসার, ভগবান লাভের অন্তরায়। বস্তুতঃ অ মরা এইদুই জাতি পরস্পর কেহই কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারি না। এ এক বিচিত্র রসায়ন। উভয় স্বভাবের সংমিশ্রণেই পরিপূর্ণ মনুষ্য স্বভাব গড়িয়া উঠিবার।

এ কথা অনেক প্রবন্ধে অনেকবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, জগতে যেখানে যখনই নবসৃষ্টি হইয়াছে, এই মিলনের ফলেই হইয়াছে। দেহে প্রাণে মনে আত্মায় সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বরূপে পরিপূর্ণভাবে যে মিলন তাহাই এই উভয় জাতির প্রকৃত মিলন। উদ্ধমুখেই হউক আর নিম্ন মুখেই হউক মিলন একদেশ মুখী হইয়া একটা কেন্দ্রে ঝুঁকিয়া পড়িলেই প্রলয়ের সূত্রপাত।*

* আত্মজ্ঞত্ব পর্য্যন্ত এক আত্মশক্তিরই ক্রমবিকাশ বা সঙ্কোচের অভিনয়। মানবত্ব সেই ক্রমবিকাশের উদ্ধগতি বিশেষ। এমন কেহ দাবী করিতে পারেন না যে মনুষ্য সমাজের—যেখানে সাধারণতঃ সর্ব্বাবয়ব মিলনের ফলে নব সমাজ বা জাতির উদ্ভব হইতেছে—প্রতি নব নারীকেই তাহার উদ্ধগতির স্রোত, নিরোধ করিয়া সাধারণ সর্ব্বাবয়ব মিলনে যোগ দিয়া আত্মার ক্রমবিকাশকে স্থিতিশীল করিয়া-ফেলিতে

জীবনের প্রথম আশ্রমকেই শেষ পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া মানুষ মানুষ হিসাবে জীবনের কোনও সার্থকতা লাভ করে না। জীবনের মধ্যদিয়া ভগবচ্ছক্তির প্রকাশে সে জগতকে একটা সার্থকতা আনিয়া দেয়। এরূপ প্রলয়ের সূত্রপাতে এমনি সার্থকতা জগতের নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার অভাবে প্রলয় মহাপ্রলয়ের রূপ ধারণ করে। বিবেকানন্দের জীবনটা সত্য। তাঁহার আবির্ভাবের একটা উপলক্ষ্য সত্যই উদ্ভূত হইতেছিল সে স্পষ্টই বুঝিতেছি। আজিও যাঁহারা তাঁহার জীবনটাকে দেহের ধ্বংসে সমাপ্ত হইতে না দিয়া তাঁহারই সেই ইচ্ছাশক্তির প্রবাহমুখে আত্ম সমর্পণ করিবেন, তাঁহার সত্যটা যাঁহাদের মধ্য দিয়া ক্রমঃপ্রকাশিত রূপে জগতের সম্মুখে পরিস্ফুট হইবে, তাঁহাদেরও জীবন ব্যর্থ হইবার নহে। সে উপলক্ষ্য এখনও বিদ্যমান।

উপলক্ষ্যটা সবদিক দিয়া বুঝান এক প্রবন্ধের কলেবরে অসম্ভব চেষ্টা। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই উপলক্ষ্যের একটা দিক্ বুঝান। তাহারই আমি প্রয়াস পাইতেছি। দেখাইতেছি এই সন্ন্যাস কেশরীর জীবনের ব্রতেরই একটা অঙ্গ ছিল মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করা। তিনি তদনুষ্ঠিত অপর সকল চেষ্টার অনুপাতে সমান করিয়াই এই

হইবে। কারণ মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব বর্ত্তমান তাহার রাজ্য ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া যখন নর-নারী মনোরাজ্যের খুব উচ্চস্তরে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের তীব্র চিন্তার ফলে দেহেতে আত্মবুদ্ধির বিলোপ হইতে থাকে, এবং যখন তাহারা মনোরাজ্যও অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করে তখন তাহারা রক্তমাংসের খাঁচাটা দেখিয়া হাস্য করে। নরনারী যখন পশু-রাজ্যে ভ্রমণ করে তখনই তাহার দৈহিক মিলন সম্পূর্ণ হয় এবং কিঞ্চিৎ ভাবের মিলনও ঘটে, কিন্তু যখন তাহারা তদূর্দ্ধে মনোরাজ্যে বিচরণ করে তখন তাহাদের ভাবের মিলন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু দৈহিক সকল বিষয়ই কমিয়া যায়, পরে যখন তাহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহাদের আত্মার মিলন ঘটে —তখন হয় তাহাদের নরত্ব বা নারীত্বের জ্ঞান, বা জাগতিক সকল ভাব, এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করে, আর না হয় সকল দেহ দেবতা-বিগ্রহে, সকল ভাব ঈশ্বরীয় লীলায়, বা সকল আত্মবুদ্ধি বিশ্বাত্মবোধে পরিসমাপ্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করে।—উঃ সঃ।

চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন সুতরাং কেহই বলিতে পারে না যে তিনি সেই শ্রেণীর সন্ন্যাসী যাহারা নারীমুখ দর্শন পাপ বলিয়া বিবেচনা করেন।

নারীর দুর্দ্দশা অধোগতির সর্ব্বপ্রধান কারণ নারী ও নরের সর্ব্বতোমুখী মিলনের অভাব। মিলন নিম্নমুখী হইয়া দেহের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছে। তাই তদনুরূপ মনস্তত্ত্ব পুরুষানুক্রমে অনুসৃত হইয়া সংস্কারটাই আজ তদ্ভিন্ন অপর কিছু নহে। তদ্দ্বারা পুষ্ট শাস্ত্র—তাহার কথা আর উল্লেখের প্রয়োজন কি? এই মিথ্যার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মত সত্যবীরই সংগ্রামে দাঁড়াইতে পারেন, যাহার সঙ্গে মিথ্যার এতটুকুও লাগিয়া আছে তাহার দ্বারাও সম্ভব নহে। তাঁহার মত পরিপূর্ণ বিরুদ্ধতা, বর্ত্তমান মিলনকে মিলন বলিয়া বাহিরেও যেমন অস্বীকার, অন্তরেও তেমনি তাহার সমস্ত প্রয়োজন মুছিয়া ফেলা,—এ ভগবানের নিজের হাতের কাজ মানুষের নিজের সৌখীন খেয়াল নহে।

এই একদেশ-দর্শী মিলনকে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ সর্ব্বতোমুখী করিয়া তুলিবার জন্য যেমন পরিশ্রমে তিনি পথের সন্ধান করিয়াছেন তেমনি উৎসাহের সহিত আঘাতও করিয়াছেন সেই মনোবৃত্তিকে যাহা এই ভ্রমকে ধরিয়া আছে। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহার জীবনটা তাই বর্ত্তমান অবস্থার নারীর উপর কঠোরতায় পরিপূর্ণ। তাঁহার ব্যঙ্গোক্তির কশাঘাত হিতৈষণার প্রবল অনুরাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তিনি ধ্যানলোকে সন্ধান পাইয়াছিলেন গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, সেই সাবিত্রী সুভদ্রার স্তিমিত অগ্নিরাশি ইহাদের বক্ষ হইতে নির্ব্বাপিত হয় নাই, উপরের ভস্মস্তূপাবরণ উন্মোচিত করিতে পারিলে আপন তপস্যায় ইহারা আপনার পথ করিয়া লইবে। ইহাদের অন্তরের মধ্যে যে অন্তর্গূঢ় মৌন শক্তি আছে, তাহা ব্রহ্মাণ্ড টলাইয়া দিতে পারে।

কিন্তু সে শক্তি আজ সমাজ চাহে না—সমগ্র ভূমণ্ডলকে কম্পিত করিতে সমর্থ এই প্রজ্বলিতরূপে—পুরুষ আজ তাহাদের চাহে না। ক্ষীণ কণ্ঠে মুখে বলে নারীর মাতৃরূপ আমাদের আদর্শ, আর সেই সম্মোহনাস্ত্রে স্তম্ভিতনারীকে টানিয়া লয় আপনাদের বিলাস শয্যায়! মা! মাতৃরূপে বাঙ্গালী যদি নারীত্বের সিংহাসন-পীঠে বসাইতে চাহে, তবে ঘরে ঘরে

মায়ের এই ছদ্মবেশ কেন?—জীর্ণা শীর্ণা অকাল বার্দ্ধক্যে ব্যাধিতা নুব্জ-দেহা লোলাঙ্গী জীর্ণ চীরেকসম্বলা হইত—মা?

এখনও মাতৃনাম সম্মোহন আনে, সে একটা ভাগ্যের ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনা। ইহারা কি "সেই" মা—যে মায়ের স্নেহ ক্রোড়ে, স্তন্যরসে মানুষ হইয়া গিয়াছেন—ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী। সে আজ স্বপ্ন। যে রক্তমাংস পুষ্ট হইয়া সেই দেবসম জ্যোতির্ম্ময় ঋষিগণ বেদাদি দুর্লভ গ্রন্থ সকল রচনা দ্বারা পৃথিবীতে অমর মনের চির সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন, সে রক্তমাংস কি আজিকার মাতার অঙ্গে আছে? থাকিলে এই পরদাস জাতি তাহাদিগকে কাম কলুষিত নেত্রে দেখিতে পারে? (কিন্তু নিন্দায় লজ্জা দেওয়া বৃথা, সে চেতনা থাকিলে এতদিন ভাবান্তর যুগান্তর উপস্থিত করিত।) আর লজ্জা অধিক কি পাইবে? বিবেকানন্দের মত আজন্ম ব্রহ্মচারী (যাঁহার পবিত্র জীবনস্পর্শে কত পথচ্যুত জীবন লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছে) মাতৃত্বকে (এই বর্ত্তমান শঠতার মুখে উচ্চারিত মাতৃত্ব) ব্যঙ্গ করিয়া বলেন Manufacturing machine! (তবুও নারীর চেতনা কোথায়?) যে স্বর্গচ্যুত স্নেহামৃত কণা অণাহার শীর্ণ, অজ্ঞানান্ধ কৃষক শ্রমজীবীতেও নারায়ণের অস্তিত্ব জাগ্রত দেখিয়া গিয়াছে, সেখানে সে পদপ্রান্তেও বর্ত্তমান অবস্থার হিন্দুনারী স্থান পায় নাই *—এতেও যদি না পায়, আরো কিসে লজ্জা পাইবে? এতেও যদি মাতৃত্ব আপন বিকৃতরূপ পরিহার করিবার আহ্বানের কষাঘাতস্পর্শ অনুভব করিতে না পারে, কিসে পারিবে?"†

কিসে যে পারিবে সে তপস্যায়—বিবেকানন্দ তাহার পথ নির্দ্দেশ, দিয়া গিয়াছেন। সে ঠিক তাঁহারই আত্মপ্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিবার

* চরণে স্থান পাওয়া ত অতি হীন কথা—স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীজগন্মাতার রক্তমাংসের প্রতীকের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। দরিদ্রে যেমন নারায়ণ-জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ ছিল, নারীতেও তাঁহার মাতৃজ্ঞান সর্ব্বদা অটুট ছিল। মাতৃসমাজের দুঃখে নরপশুদের কষাঘাত এবং তাহাদের ব্যবহার জ্ঞাপন করিবার জন্যই তিনি manufacturing machine শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।—উঃ, সঃ।

† অন্তঃপুর ও ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ। শ্রাবণ ১৩২৭

মত মেয়ে গড়িবার পথ* গঠন আরম্ভ হউক—বাংলার ঘরে ঘরে তেমনি সব মনস্বিনী কুল অবতীর্ণা হইয়া জননী, জায়া, দুহিতা পদ গৌরবিত করিয়া দাঁড়ান। মহামুক্তির পরপার হইতেও বিবেকানন্দের মত আত্মা লক্ষ লক্ষ আধারে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে এক মহা অমৃত সিন্ধুতে ভাসাইয়া দিতে আসিবেন। মনুষ্য স্বভাবের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে—সেইদিন হইতেই জগতের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। তখন আর নরের দুঃখ থাকিবে না, নারীর দুর্দ্দশা থাকিবে না। জগতের এই জীবন সংগ্রাম এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত স্বর্গরাজ্যের আচার ব্যবহাররূপ পরিগ্রহ করিবে। তখন চক্ষে দেখিব ধর্ম্মের গ্লানির অবসানের যুগ।

বিবেকানন্দের মানস-কমল নারীসমস্যার সমাধানে যে সত্য কিরণ স্পর্শে ফুটিয়াছিল, তাহারই রশ্মিরেখায় বাঙ্গালার আকাশ পরিপূর্ণ করিতে চাই।—বাঙ্গালী প্রস্তুত কি?

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

আঁটপুর (হুগলি জেলা)
ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮।

(১)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

প্রিয় ম,—

মাষ্টার মহাশয়, আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ বার ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে।

আপনার নরেন্দ্রনাথ।

---

* এই স্থান স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। স্বামীজি ও তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

পুঃ—যে উপদেশামৃত ভবিষ্যতে জগতে শান্তি বর্ষণ করিবে, কোন ব্যক্তিকে যখন তাহার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকিতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং আমি যে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাই না কেন—তাহাতেই আশ্চর্য্য হই।

(২)

(বেলগামের ভূতপূর্ব্ব ফরেষ্ট-অফিসার শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত।)

মাড়গাঁও,

১৮৯৩।

কল্যাণবরেষু,

আপনার এক পত্র এইমাত্র পাইলাম। আমি এ স্থানে নিরাপদে পৌঁছি ও তদনন্তর পঞ্জেম প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম ও দেবালয় দর্শন করিতে যাই—অদ্য ফিরিয়া আসিয়াছি। গোকর্ণ, মহাবলেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিবার ইচ্ছা এক্ষণে পরিত্যাগ করিলাম। কল্য প্রাতঃকালের ট্রেনে ধারবাড় যাত্রা করিব। যষ্টি আমি লইয়া আসিয়াছি। ডাক্তার যুগডেকরের মিত্র আমায় অতিশয় যত্ন করিয়াছেন। ভাটেসাহেব ও অন্যান্য সকল মহাশয়কে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইবেন। ঈশ্বর আপনার ও আপনার পত্নীর সকল কল্যাণ করুন। পঞ্জেম সহর বড় পরিষ্কার। এখানকার খ্রীষ্টিয়ানেরা অনেকেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে। হিন্দুরা প্রায় সকলেই মূর্খ। ইতি—সচ্চিদানন্দ।

* আমেরিকা-যাত্রার কিছু পূর্ব্ব হইতে আমেরিকা-যাত্রা পর্য্যন্ত স্বামীজি সচ্চিদানন্দ নামে নিজেকে পরিচিত করিতেন।

ধর্ম্ম পথ।*

শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বের বিচিত্রতা নানারূপে নানাভাবে ফুটে উঠে সেই এক অনির্ব্বচনীয় অনাদি সত্তার অস্ফুট আভাস দিতেছে। শিল্প-সাহিত্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিদ্যা-বিজ্ঞানে, ভাবে ভাষায়, মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ক'রে ক্রমোন্নতির স্তরে উঠছে। হৃদয়ের বিস্তৃতি ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার আদর্শ গড়ে নিচ্ছে, নীতির সুনিয়মে সমাজ সভ্যতার আলোক দেখতে পাচ্ছে। আবার প্রতিভায় মনীষায় এই মানুষ সমাজ-সঙ্ঘ পরিচালিত করছে। যিনি নীতির নিয়ন্তা, সভ্যতার সন্তান, সমাজের পরিচালক,—তাঁকেই আমরা মহাপুরুষ বলি।

ঐহিক ভোগসুখই যে জীবনের ঈপ্সিত বস্তু তা বোধ হয় কেউ একবাক্যে স্বীকার করেন না। কারণ, আহার বিহার ও নিদ্রার দ্বারাই জীবনের সদ্ব্যবহার হয় না। অতি নিম্নস্তরের জীবের লক্ষণের সঙ্গে মানব প্রকৃতির সমতা কখনই প্রার্থনীয় নয়, তাহলে সে জীবনের মূল্য যে পশুত্বের সমান হবে। মানুষ অর্থ চায় তার দৈহিক সুখের জন্য নিশ্চয়, কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন ছাড়াও সে এমন কিছু চায়, যাতে সে অন্তরের তৃপ্তি ও প্রাণের শান্তি পেতে পারে। দৈহিক সুখের জন্য যেমন কর্ম্মের অভাব নেই আবার অন্তরের প্রেরণায় তবে তার ব্যাকুলতাও সীমাহীন। এই যে অন্তরের প্রেরণা, চিত্তের এতটা অশান্তির অবস্থা, যা নাকি ভোগ সুখের পরও থাকে একেই বলি ধর্ম্মলাভের অজ্ঞেয় আকাঙ্ক্ষা—এই খানেই মনুষ্যত্বের উন্মেষ।

---

* বিবেকানন্দ সমিতির ৩১শে অক্টোবর ১৯২০, আলোচনা সভায় পঠিত। ৩

ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও মতবাদ ভারতবর্ষে অভাব নেই। এ যে শুধু আজকাল তা নয়, অতি প্রাচীন যুগেও ছিল। বৈদিক কর্ম্মবাদীদের সঙ্গে জ্ঞানবাদীদেরও বিরোধ ছিল—যখন বৌদ্ধ মুসলমান অথবা খৃষ্টধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করে নি। কিন্তু আধুনিক কালে অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পর এদেশে কতকগুলি অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হয়েছে। যেমন আর্য্য ও ব্রাহ্ম সমাজ, রাধাস্বামী সম্প্রদায় ও থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়। মতবাদ ভিন্ন হলেও এরা মূলতঃ এক,—সকলেই এক অতি উচ্চ উচ্চস্তর, নির্ঝরিণী হইতে ভাবরাশি সংগ্রহ ক'রে সম্পূর্ণ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট লক্ষনাক্রান্ত মতবাদের মধ্য দিয়ে জগৎ রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে এই সকল মতবাদের মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন। কারণ, প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম বা দার্শনিক সম্প্রদায়, অপর সম্প্রদায়ের ভ্রম প্রদর্শনে ও নিজমত স্থাপনে একবিন্দু কম উৎসাহী নন। অতি বিরল, কোন মহাত্মা বা মহাপুরুষ উদারভাবাপন্ন হতে পারেন কিন্তু কি আধুনিক কি প্রাচীন সকল সম্প্রদায়ই কম বেশি সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট। দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রচারিত আর্য্যসমাজ বেদের সংহিতা ভাগের উপর তাঁর ব্যাখ্যার সাহায্যে স্থাপিত। ব্রাহ্মসমাজ উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়াও, প্রধানতঃ মানবের স্বাধীন যুক্তির উপর নির্ভর ক'রে, রাজা রামমোহন রায় প্রচার করে গেছেন। রাধাস্বামীর উপদিষ্ট সাধনাবলির উপর রাধাস্বামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কতিপয় অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন 'মহাত্মার' এক সঙ্ঘ আছে, যোগাদি সাধন দ্বারা জগতের সমুদয় ধর্ম্মের সারমর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, এই থিওসফিষ্টদের মত। কিন্তু এই সকলের মধ্যে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্ম-সাধনা ও সর্ব্বমতের মধ্যে 'যত মত তত পথ' রূপ এক সনাতন সত্যের অনুভূতি—এই স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত রামকৃষ্ণ মিশন।

বুদ্ধ আবির্ভাবে ধর্ম্মরাজ্যে একটা যুগান্তর এসেছিল। তারপর বেদ ব্যাখ্যাতা শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব এঁরা নানা প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা একটা বিরোধের সৃষ্টি করেছেন। তারপর মুসলমান খৃষ্টান আর্য্যদের

প্রচারের ফলে হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার ভিতর অনেক অবান্তর শাখার উৎপত্তি হয়েছে আরোও বা কত হবে। ধর্ম্ম সমন্বয়ের বার্ত্তা আজ যে শুধু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এনেছেন তা নয়, অতি প্রাচীন বৈদিকযুগেও জলদগম্ভীর ধ্বনিতে তপোবনের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত একদিন আলোড়িত হয়েছিল—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

আজকাল শিক্ষিত সত্যানুসন্ধিৎসুর নবযুবক যে এই নানা মতামতের মধ্যে পড়ে, হাবাগুড়ি খাবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণয়ের মন্ত্র কি? এখন কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিবেন তাও চিন্তার বস্তু যুক্তিবাদ দিয়ে ধর্ম্মের প্রমাণ মাপব, না বৈজ্ঞানিকের মত অজ্ঞেয়বাদী হব, না প্রাচীন বা আধুনিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করব? এইখানে ধর্ম্মের প্রমানের প্রশ্ন আসে।

বেদান্ত আমাদের যুক্তি, আপ্তবাক্য ও স্বানুভব এই তিন প্রমানের দ্বারা ধর্ম্মের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে আদেশ করেছেন। তার মধ্যে স্বানুভবই শ্রেষ্ঠ ও সন্দেহ শূন্য।* কিন্তু অন্য প্রমাণগুলিও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। সকলেরই কিছু একমত হওয়া সম্ভব নয়, ইহাই প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বিচিত্রতা। অনেকে বলেন, বিশ্বাস কর, বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। ভাল, কি বিশ্বাস করব—আর কা'কে বিশ্বাস করব? তিনি অমনি বোধ হয় নিজ প্রিয় মতগুলি প্রচার করতে সুরু করবেন, অথবা শাস্ত্র বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বা মহাপুরুষ বিশেষের মতের বিশ্বাসের উপদেশ দেবেন। কেন যে তাঁর কথামত উক্ত মহাপুরুষকে বিশ্বাস ক'রব আর অন্যকে বিশ্বাস ক'রব না, এ কথার উত্তরে তিনি গভীর উপেক্ষা ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই করবেন না। অথবা সৌভাগ্য ক্রমে হয়ত তাঁর নিজ বিশ্বাসের অনুযায়ী কতকগুলি যুক্তিতর্ক এনে হাজির করবেন। তবে কি যুক্তিতর্কের দ্বারা

* ইহা লেখকের মত, বেদান্ত মতে আপ্তবাক্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, কারণ স্বানুভব বা সাধারণ-প্রত্যক্ষ অপরের সহিত বিরোধ সম্ভব। তবে যদি চরমানুভূতি হয়—সেখানে কোনও গোল নাই।—উঃ সঃ

এ রহস্যের মীমাংসা হবে? যুক্তি মীমাংসা দ্বারা তুমি একরূপ সিদ্ধান্ত করলে আমার সিদ্ধান্ত অন্যরূপ হল। শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব, নীলকণ্ঠ, বল্লভ ইত্যাদি প্রতিভা সম্পন্ন মহাপুরুষগণ যারা বেদান্তের ভাষ্য করেছেন—তাঁরা কিরকমে বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন? কেউ কেউ (?) বলেন তাঁদের তিনটি মত—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—একটি আর একটির সোপান মাত্র। আমি যদি জিজ্ঞাস করি, কি উপায়ে জানেন?—যুক্তি বলে? কিন্তু যুক্তিদ্বারা পরকাল, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি নিগূঢ় তত্ত্বের সঠিক মীমাংসা হয় না। তখন কি আপ্তবাক্য গ্রহণ করব?—এখন আপ্ত কে?—কি প্রকারে বা নির্ণয় করা সম্ভব? বেদ, বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিটক—কে আপ্ত? আবার প্রাচীন মহা-পুরুষগণের বাক্যের মধ্যেই অনেক বিরোধ দেখছি। এক বেদের মধ্যেই কত ঋষি কত মত দিচ্ছেন।

পূর্ব্বে বলেছি জ্ঞানের উন্মেষের দ্বারা মানুষ উন্নতির পথে চলেছে। ধর্ম্মলাভের বিশাল রাজপথ পত্রিকাপ্রবন্ধে, উপদেশবক্তৃতায় যথেষ্ট পাওয়া যাবে, কিন্তু অনেক ঠেকে তারপর এক পরদা উঠতে হয়। চরিত্রের উন্নতি একটা কথার কথা নয়। তাই মনে হয় অকপট নির্ভীক হৃদয়ে, সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা অতি আবশ্যক। অতীত সত্যানু-সন্ধিৎসুগণের উপদেশগুলি ধীরভাবে শ্রদ্ধা সহকারে আলোচনা করা দরকার (?) তাঁদের উপদেশের মধ্যে ভেদাভেদ থাকলেও যেখানে সমন্বয়ের সূত্রটি আছে সেই খানে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে চিন্তা করতে হবে। বৃথা মতামতের বিচারে সময় ও শক্তি ক্ষেপ না করে তত্ত্বের যথার্থ অর্থবোধের জন্য যত্নবান হতে হবে।

অনেকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে সত্যনির্ণয়ের যথেষ্ট ও একমাত্র সহায়ক মনে করেন। আবার কেউ বা ভাব বা মনোবৃত্তি বিশেষকে তদ্রূপ ভাবেন। ভাববিহীন জীবন নীরস হয়ে যায়, আবার ভাবের প্রবলতা এসে ক্রমে ক্রমে উন্মত্ততার সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার?—সে যে একটা কথার কথা মাত্র। বিচারবাদী যেমন ভাবকে দুর্ব্বলতা ভাবেন আবার

অপর পক্ষও তেমনি তাঁদের হৃদয়ের শুষ্কতা চিন্তা ক'রে দুঃখিত হন। কিন্তু দেখা যায় কোন যুক্তিবাদী কোনও একটি ভাবের প্রভাব হতে একেবারে মুক্ত নন। ফলতঃ যখন যুক্তিবাদী দুর্ব্বল ভাবকে পরিহার করে অসীম উদ্যমে সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হন, আবার যখন ভাবুক ভাবপ্রবণতার ক্রমশঃ বিশুদ্ধি সাধন দ্বারা অগ্রসর হন, তখন তাঁরা চরমে একই স্থানে একই লক্ষ্যে উপনীত হন। এই দুই পথ শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান ও ভক্তি মার্গ। জ্ঞানীর যেমন বুদ্ধি বিচার ও চিত্তের নির্ম্মলতা দরকার, আবার ভক্তেরও তেমনি মহাপুরুষ বাক্যে অব্যভিচারী ভক্তি ও নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয়।* এখানে মনে রাখতে হবে সামাজিকতার নীতি আমাদের যথেষ্ট বটে কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ্যে আসতে হলে ব্যবহারিক নীতি-রাজ্যের বাইরে যেতে হবে। যেখানে শব্দ নিয়ে বিচার নাই, বিশ্বাস অবিশ্বাসে লড়াই নাই, জ্ঞানী ভক্তে ঠেসাঠেসি নাই—সেই পারমার্থিক রাজ্য। এই খানে পৌঁছানই জীবনের উদ্দেশ্য—এইখানেই মনুষ্যত্বের পরিণতি।

পূর্ব্বে যে স্বানুভূতির কথা বলেছি তাতেই ধর্ম্মের মুখ্য প্রমাণ নিজ আচরণে পাওয়া যায়। কোন প্রকার মতের বিশ্বাস না নিয়ে মনঃশক্তির একাগ্রতার দ্বারা সেই তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। বৈজ্ঞানিক সম্রাট স্যর অলিভার লজ বলেছেন যে Laboratory experiment আর Observation ছাড়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের অন্য পথ থাকাও সম্ভব। সে পথ আর কিছুই নয় ভারতের আর্য্যঋষি প্রচারিত রাজযোগ। মহানাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীরও ধর্ম্মরাজ্যে সত্যানুসন্ধানের কোন বাধা নাই। আচার্য্য বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ পাঠে দেখা যায় কেহ বিচার বিশ্বাস বা যৌগিক ক্রিয়ানুষ্ঠান না করেও যদি যথার্থ নিস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করবার চেষ্টা করেন পরে তাঁরও অহং নাশের ফলে সেই পরমপদ লাভ হয়।

---

* দৃষ্টি-সৃষ্টি বাদানুযায়ী এ কথা অনেকটা ঠিক বটে, কিন্তু শঙ্করাদি অপরাপর আচার্য্যেরা জ্ঞান ও ভক্তি উভয় মার্গেই আপ্তবাক্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং উভয়েরই চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন।—উঃ সঃ

আমি বলতে চাই কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা কল্যাণকর নয়—সে ভাবটি সেই সম্প্রদায়ের মৃত্যু স্বরূপ। সত্য উপলব্ধির অনন্ত পথ রয়েছে—প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে বেছে নিতে দেও। যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছও ততক্ষণ কেউ কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়। কারণ তখনও তুমি তোমার সাধনার মূল্য পাও নাই আর আমারও বিরুদ্ধ মতের দাম জান না। তাই বলি, এস সকলে, সৎসাহস ও উচ্চাশা বুকে নিয়ে, সাধনায় ব্রতী হই, সত্যের আলোক একদিন নিশ্চয়ই আসবে। তখন আমরা সকলেই ধন্য হব।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিককে লিখিত পত্রাংশ।)

শ্রীমান সুরেন্দ্র,

* * * *

মাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারাণী এঁদের কথা শুনেছো। মা যে এঁদের চেয়েও কত উচুতে উঠে বসে আছেন! ঐশ্বর্য্যের লেশ নেই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য্য ছিল, তাঁর ভাবাবেশ, সমাধি, এসব আমরা জন্মে দেখেছি—কত লোকে দেখেছে। কিন্তু মার?—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত লুপ্ত। এ কি মহাশক্তি!—জয় মা!! জয় মা!!! জয় মহাশক্তিময়ী মা!!!! দেখচো না—কত লোক সব ছুটে আসছে! যে বিষ নিজেরা হজম কর্ত্তে পাচ্ছিনে—সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন!—অনন্ত শক্তি—অপার করুণা!! জয় মা!!!—আমাদের কথা কি বল্‌ছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এ'টী কর্ত্তে দেখিনি! তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন। কেশব সেনকে বলেছিলেন—"কেশব, তুমি যেমন তেমন্ গরু গোয়ালে ঢোকাও—তাইতে এত গণ্ডগোল বাধে।" ঠাকুর কত পরখ করে নিতেন। স্বামিজীকেই কত ক'রে দেখেছিলেন! চোখ মুখ, হাত, পা— * * * প্রস্রাবের ধার কোন্ দিকে পড়ে তা পর্য্যন্ত। কত রকম পরীক্ষাই জান্‌তেন! এত ক'রে দেখে তবে

তিনি কাউকে স্থান দিতেন। দেখেছি, কেউ হয়ত কিছু খাবার নিয়ে ঠাকুরের ঘরের পানে আস্‌ছে; দূর থেকেই ঠাকুর বল্‌ছেন—"দেখলুম খাবার তো নয়, যেন খানিকটে ময়লা নিয়ে আস্‌ছে!" বিষয়ীর গন্ধ সইতে পারতেন না। আর এখানে—মা'র এখানে কি দেখ্‌ছি?—অদ্ভুত! অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন—সকলের দ্রব্য খাচ্চেন,—আর সব হজম হয়ে যাচ্চে!—মা! মা!! জয় মা!!!

তোমরা দেখ্‌তে এলে?—রাজরাজেশ্বরী, সাধ ক'রে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন—এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্য্যন্ত নিজে পরিষ্কার করছেন। ঠাকুরের গলায় ঘা হয়েছিল, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ তৈরীর জন্য—আর মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট কচ্ছেন, গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য্য—অপরিসীম করুণা—সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমান-রাহিত্য!! দেখ, চিন্তা কর, বোঝ, মা'র ছেলে তোমরা—ঠিক ঠিক মা'র ছেলে হ'তে হবে—তবে তো! নৈলে কেবল মাকে দর্শন ক'রে এলুম, কি একটু প্রসাদ খেলুম—এতে কি আর হবে? "তদ্ভাবভাবিত"—এ যদি না হ'ল, কি আর তবে হ'ল? ভোগতৃষ্ণার পরিণাম দেখ্‌চো ত? ঐ যে বেড়ে উঠে দাউ দাউ হাউ হাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ছে—ছারখার ক'রে দিচ্ছে। মায়ের ছেলে তোমরা—দেখে শেখো। ওসব আশায় ছাই ফেলে দেও। কি কঠোর দায়িত্ব তোমাদের। ভোগের পরিণাম দেখে সমস্ত জগৎ এইবার যোগের দিকে ফিরে দাঁড়াচ্চে। কে তাদের পথ দেখাবে?—এই কায তোমাদের সম্মুখে। স্পর্শমণি স্পর্শ ক'রে তোমরা ত সব সোনা হ'য়ে গেছ! এইবার অন্য সকলকে সোনা কর্ত্তে হবে। তা'রি যোগ্যতা লাভের চেষ্টা কর। মায়ের যথার্থ ছেলে হয়ে উঠ। মনে রেখো—সুখে দৈন্যে, সম্পদে বিপদে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, দ্বন্দ্বে বিগ্রহে—সর্ব্ব বিষয়ে মায়ের সেই করুণা!—অপার করুণা!!—সেই অপার করুণা!!! জয় মা! জয় মা!!

ইতি।—

শুভানুধ্যায়ী—প্রেমানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। বিবেকানন্দ সোসাইটীর আয়োজনে বিগত ৬মাসের মধ্যে (জুন হইতে—নবেম্বর ১৩২০) ২১টী সাধারণ ধর্ম্ম সভা প্রতি শনিবারে কলেজ স্কোয়ারে বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটী গৃহে হইয়াছিল। পণ্ডিত শরৎকুমার ঘোষ (বরিশাল), পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ, রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বেলুড় মঠের স্বামী বাসুদেবানন্দ (মনুষ্য জীবনে বৈদিক ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা), ক্ষীরোদকুমার গাঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, ক্রমান্বয়ে এই অধিবেশনে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ও পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয়ের 'বেদান্ত ও বেদান্তের' ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রায় প্রতি অধিবেশনে বক্তৃতার পূর্ব্বে ধর্ম্মসঙ্গীত হইয়াছিল।

২। এই ৬মাসে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লিতে ৬টী আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়াছে। এইগুলিতে শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, পূর্ণানন্দ, বাসুদেবানন্দ, প্রভৃতি সন্ন্যাসী মহোদয়গণ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী অনন্তচৈতন্য লিখিত "কঃ পন্থাঃ" (উদ্বোধনে পরে প্রকাশিত), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত এক প্রবন্ধ স্বামী পূর্ণানন্দ লিখিত "নবযুগ ও তাহার কর্ম্মপ্রণালী", পথিক লিখিত "জাতীয় জীবনে বেদান্ত" (পরে উদ্বোধনে প্রকাশিত) শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত "জীবনের পথে" ও স্বামী বাসুদেবানন্দ লিখিত "শিক্ষা-মন্দির" (এই মাসে উদ্বোধনে প্রকাশিত) প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ পঠিত হয়। সভাপতি মহোদয়গণ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুগণের প্রশ্নমীমাংসা করেন ও সদস্যগণ কর্তৃক স্বামীজির গ্রন্থাদি হইতে পাঠ আবৃত্তি ও ধর্ম্ম সঙ্গীতাদি গীত হইয়া যথারীতি কিঞ্চিৎ প্রসাদ বিতরণ হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

৩। সোসাইটী গৃহে সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলিতে প্রথমে প্রতি রবিবারে স্বামী আত্মবোধানন্দ পরে প্রতি বুধবারে স্বামী পূর্ণানন্দ "জ্ঞানযোগ" ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রতি শুক্রবার স্বামীজির বক্তৃতা-

বলীর অংশবিশেষ পঠিত হইয়া থাকে। গত ৬মাসে এইভাবে যতটা সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়, এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ বৈকালে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পঠিত হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ গ্রামের স্থানীয় কয়েক জন উদ্যোগী যুবকের উৎসাহ ও উদ্যমে বিগত কয়েক মাস যাবৎ আর্ত্ত, দুঃস্থ জনগণের সেবাকল্পে একটী আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় সাধারণের সহানুভূতি ও তত্ত্বাবধানে ইহা অচিরে একটী উপযোগী কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়া লোককল্যাণসাধনে যত্নপর হউক—আমাদের এই প্রার্থনা।

আগামী ১৭ই মাঘ, ইংরাজী ৩০শে জানুয়ারী রবিবার, শুক্লা সপ্তমী (জন্ম তিথি) বেলুড় মঠে যুগাচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজির জন্মোৎসব হইবে। দরিদ্র নারায়ণের সেবাই এই উৎসবের বিশেষ অঙ্গ।

পুরীজেলার অন্তঃপাতী ভুবনেশ্বর, কানাস, গাবিসাগোদা, জেনাপুর প্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষ কেন্দ্র সকল বন্ধ করা হইয়াছে, কারণ ঐ সকল স্থানে ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে ও লোকে মজুরী পাইতেছে এবং চাউলের দরও অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। তমলুকে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, সেখানে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান বিশেষ প্রয়োজন, আগামী চৈত্র মাসে কৃষকদের বীজ ধান্য দিতে পারিলে, তাহাদের বিশেষ সুবিধা হয়। মিশন-কর্ত্তৃপক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনের একটী অত্যুজ্জ্বল রবি—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—গত ১৭ই পৌষ, শনিবার রাত্রিকালে নভচ্যুত হইয়া পড়িল। ইঁহার সরলতা, হৃদয়বত্তা ও সর্ব্বোপরি সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় আর কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হয় না। শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন ও তদীয় সন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১

বিষপানে জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু অনুপান যুক্ত হইলে বিকার-ঘোর আরোগ্য হয়।—বর্ত্তমান সভ্যতার (civilisation) দোষ গুণও উহার তুল্যভাবাপন্ন। অসংযমীর নিকট নবীন সভ্যতা মৃত্যু স্বরূপ, আর সংযমীর নিকট উহা স্বর্গের সকল সুখ সম্পদ প্রকাশ করিয়া ধরাকে অমরা নগরীতে পরিণত করিবার যুগ যুগ ব্যাপী মানবের আমরণ চেষ্টাকে সার্থক করে।

* * * *

ঔজ্জ্বল্য ও অন্ধকারে এ জগৎ-চিত্র অঙ্কিত। অতীতে একবার সাগর মন্থন করিয়া দেবতা-অসুর অমৃতকে লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু সর্ব্বনাশক হলাহলও উঠিয়াছিল। তাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে লাভ করিয়াও অসংযমী বলিয়া সে হলাহলের প্রকোপ সহ্যকরা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কিন্তু প্রেমিক তপস্বী শিব ষড়ৈশ্বর্য্যরূপিণী দুর্গা যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী সংযমী বলিয়া লীলায় সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করিলেন। বর্ত্তমান যুগে পুনরায় জড় সমুদ্রমন্থন করিয়া আমরা বহু সম্পদ বিলাস লাভ করিয়াছি সত্য কিন্তু তৎসঙ্গে যে হলাহল উত্থিত হইয়া জগৎকে জর্জ্জরিত করিতে বসিয়াছে, তাহার সেই জ্বালাময়ী প্রকোপ শীতল করিবার নিমিত্ত সে প্রেমিক সন্ন্যাসী কে ?

অতীতের মন্থন রজ্জু ছিল ভোগ-নাগ, বর্ত্তমানে হইয়াছে ভোগ বাসনা। ভোগনাগের ছিল সহস্র শির কিন্তু ভোগ বাসনার আছে কোটী শির। মন্থন দণ্ড, ছিল সুমেরু, বর্ত্তমানে হইয়াছে—অপরা

বিজ্ঞান—মথিত হইয়াছিল সমুদ্র, এবার হইয়াছে সমগ্র জড়-কারণ, উঠিয়াছিল লক্ষ্মী, সুধা, বারুণী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা—এবারও উঠিয়াছে বাণিজ্য-লক্ষ্মী, বিজ্ঞান-সুধা, মোহ-বারুণী, যান্ত্রিক-অশ্ব গজ—দেবতা পান করিল সুধা, অসুর পান করিল বারুণী, কিন্তু হলাহল স্থলে যে দারুণ হিংসা উত্থিত হইয়াছে যাহার প্রকোপে বিশ্ব যে জ্বলিয়া যাইতেছে, তাহাকে গণ্ডূষ মাত্রে ধারণকারী সর্ব্বত্যাগী রুদ্র ভগবান কে ?

*   *   *   *

যে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা আজ মোক্ষদায়িনী—যদি রুদ্র জটাকলাপে সে অসহ্য বেগ সংযত না হইত তবে এ জগৎ তিনি রসাতলে বিলীন করিয়া দিতেন। আবার যে সেই জ্ঞান-গঙ্গা মহাঘোররোলে সমগ্র জগৎ ছাইয়া এক মহা প্রলয়ের ধ্বংস ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সংযত করিয়া জীবমোক্ষের-কারণ-ভূতা করিবার নিমিত্ত নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল চন্দ্রশেখরের তপোদীপ্ত গভীর জটাজলদ জাল কোথায় ?

*   *   *   *

আবার কে সেই ভগীরথ ত্যাগের দীপ্ত বহ্নির মধ্যে নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষ এবং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনায় শিবারাধনা দ্বারা তাঁহার জটা পুঞ্জে পথহারা জ্ঞানগঙ্গাকে তপোলোক হইতে এই মর্ত্ত্যে মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন ?

*   *   *   *

কে ঐ নবলোকের দেবতা যাঁহার ভালতটে কোটি দামিনী-লাঞ্ছিত তপোলেখা। দৃষ্টি ঊর্দ্ধে—অতি ঊর্দ্ধে মনের পরপারে অতীত আগামী হীন কোন এক অরূপ-রূপ-সাগরে নিমগ্ন।—যে সাগর হইতে কত যুগের কত মহাপ্রাণ নিজ তপঃ কিরণের দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন কত কামনাশিনী বিচিত্রভাব লহরীর বারি কণা। কিন্তু একি রুদ্র তপোজ্যোতিঃ!—যাহা তপোলোক হইতে আকর্ষণ করিতেছে, কাহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, সকল কল্পের, সকল যুগের, সকল ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে সেই জ্ঞান-গঙ্গা আচণ্ডালকে পবিত্র কৃতার্থ

করিবার জন্য। কে ঐ মহাযোগী! দেবতার দেবতা! যিনি লীলায় জীর্ণ করিলেন হিংসা হলাহল, শাসন করিলেন কটাক্ষে মন্মথ, ধারণ করিয়াছেন অঙ্গে ষড়ৈশ্বর্য্যরূপিণী মহাশক্তি, তনুচ্ছেদ করিয়া যোগাইতেছেন লক্ষ্মী যাঁহার পূজায় অর্ঘ্য-কমল—কাহার ঐ শিবচক্ষু!

*　　*　　*　　*

আবার কে ঐ হাস্যানন, 'স্তিমিত চিৎসিন্ধু ভেদ' করিয়া 'কোটী সূর্য্য গলান' অঙ্গ হইতে প্রেমের জ্যোতিকণা বিচ্ছুরিত করিতে করিতে মহাব্যোমের প্রতি কম্পনের তরঙ্গে তরঙ্গে অবরোহন করিতেছেন —জীব দুঃখহারী কঠোর তপস্যার নিমিত্ত? কে ঐ নবীন সন্ন্যাসী 'ত্যাগের অগ্নিকুণ্ডে' আহুতি দিতেছেন নিজের দেহ-মন-প্রাণ, 'স্বার্থ মলিনতা' জীব কল্যাণকামী হইয়া। কাহার তীব্র সাধনায় আশুতোষ আজ তুষ্ট, বিক্রীত। কে ঐ জলদ মন্দ্রে আহ্বান করিতেছে বরদা-ব্রহ্মযোনি জ্ঞান-গঙ্গাকে কাহার ব্যাকুল আহ্বানে শিব-সীমন্তিনী রুদ্র-জটারণ্য প্লাবিত করিয়া 'যত মত তত পথ' দিয়া ধীরে ধরায় শুভাগমন করিতেছেন? শুন ঐ তরুণ তপস্বীর বিশ্বালোড়নকারী গভীর শঙ্খ ধ্বনি—অভিঃ! অভিঃ। উত্তিষ্ঠত। জাগ্রত!

*　　*　　*　　*

কে আছ নাস্তিক আস্তিক, কে আছ জ্ঞানী অজ্ঞানী, সবল দুর্ব্বল, হিন্দু অহিন্দু, এস এস এই নব জ্ঞান-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া ধন্যমানি। সর্ব্বসন্তাপহারিণীর প্রেম সলিলে স্নান করিয়া এস আমরা সকল স্বার্থ হিংসা ধুইয়া ফেলি। এই কলুষনাশে প্রত্যক্ষ হইবেন সেই সহস্র-শীর্ষ পুরুষ—এস প্রতি জীব পদে আমাদের সকল দান সমর্পণ করিয়া তাঁহার মূর্ত্ত উপাসনার সমাপ্ত করি। ওঁ শান্তিঃ॥

(২)

যিনি মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি সচ্চিদানন্দরূপিণী—যার করুণার কণামাত্র লাভ করিয়া নারী মূর্ত্তি এত করুণাময়ী, মহিমাময়ী—তাঁহাকে প্রণাম করি। মা আমাদের নিত্য ও লীলা উভয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা। নিত্য মূর্ত্তিতে গুণ একীভূত,

আর লীলায় গুণ বিকশিত। বিদ্যুদাধারে যে শক্তি নিহিত তাহা লোক চক্ষুর অগোচর—পরন্ত দীপের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইলেই উহা আমাদের আলোক। সেইরূপ অপার করুণা, অসীম ধৈর্য্য, অখণ্ড প্রেম, অনন্ত জ্ঞান স্বরূপিণী, চির ক্ষমাশীলা, চির কল্যাণময়ী যে শাশ্বতী জননী সর্ব্বভূতে বিরাজমানা—নারীমূর্ত্তি তাঁহারই লীলা বিগ্রহ ॥

* * * *

ঐ সনাতনসত্য ঋষিগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতে জীবন্ত প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা। ভারতেতর প্রদেশে সে উপাসনা বর্ত্তমান বটে কিন্তু সে পূজা কেবল যৌবনের, সে স্তুতি কেবল রূপের। অস্মদ্দেশে কিন্তু নারীকে জগদম্বার মূর্ত্ত বিগ্রহ জ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করাই 'শাশ্বতী কামনা' ছিল—যাহার অভাবে আজ আমরা শ্রীহীন। জাতীয় ভাবাদর্শের বিচ্যুতিতে জননী গৃহদাসী হইলেন। আর এই বিচ্যুতির হেতু সনাতন শাস্ত্রের অবমাননায় দেশাচার কুলাচারের প্রাধান্য এবং তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ মদিরা পানে উন্মত্ততা।

* * * *

কিন্তু শক্তিমান পুরুষেরা যাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য বলিয়া থাকেন সাধারণে সে কথা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণে অক্ষম হইলেও একেবারে কখনও অস্বীকার করিতে পারে নাই—এবারও পারিবে না। ইদানীংএর মহাশক্তির সাধক পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও জীব কল্যাণকামী হইয়া প্রচার করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতা—এ সৃষ্টি তাঁহারই লীলামহিমা—যে লীলায় নারী তাঁহারই মূর্ত্ত প্রতিমা।

* * * *

হে ভারতী—পূত হৃদয়ে অবহিত চিত্তে ধারণা কর—তোমার স্বরূপ মাতৃত্বে—এ মূর্ত্তিতে তোমার যে শোভা, এ মূর্ত্তিতে তোমার যে বিকাশ তাহা তোমারই অপর মূর্ত্তির সহিত তুলনার অযোগ্য—কারণ তোমরাই জগৎকে প্রসব করিতেছ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

C/o বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র
খয়রাবাদ, হায়দরাবাদ
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমার বন্ধু সেই যুবক গ্রাজুয়েটটি ষ্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন—একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকও এসেছিলেন। এখন আমি ঐ বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীর কাছেই রয়েছি—কাল তোমার যুবক বন্ধুটীর কাছে গিয়ে কিছু দিন থাকবো—তারপর এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখা হয়ে গেলে—কয়েক দিনের মধ্যেই মান্দ্রাজে ফিরছি। কারণ, আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমায় জানাচ্ছি যে, আমি এখন আর রাজপুতানায় ফিরে যেতে পার্ব্বো না—এখানে এখন থেকেই ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে—জানি না রাজপুতানায় আরও কি ভয়ানক গরমই হবে, আর আমি গরম আদপে সহ্য করতে পারি না। সুতরাং এরপর আমাকে ব্যাঙ্গালোরে আবার যেতে হবে, তারপর উতকামন্দে গ্রীষ্মটা কাটাতে যাব। গরমে আমার মাথার ঘিটা যেন ফুটতে থাকে।

সুতরাং আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল আর এই জন্যেই আমি গোড়াতেই মান্দ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলুম। তা করতে পার্লে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্যে আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতুম। কিন্তু হায়, এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রথমতঃ, এই গরমে আমি ঘুরে রাজা-রাজড়াকে ধরবার চেষ্টা করতে পারব না—আমি তা করতে গেলে মারা যাব, দ্বিতীয়তঃ, আমার রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ আমাকে পেলে তাঁদের কাছেই ধরে রেখে দেবেন, পাশ্চাত্য দেশে যেতে দেবেন না। সুতরাং

আমার মতলব ছিল আমার বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে কোন নূতন লোককে ধরা আর মান্দ্রাজে এই বিলম্ব হওয়ার দরুণ আমার সব আশাভরসা চুরমার হয়ে গেছে—এখন আমি অতি দুঃখের সহিত ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিলুম—ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হোক্। এ আমারই প্রাক্তন—অপর কারও দোষ নাই। তবে তুমি এক রকম নিশ্চিতই জেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই দুই একদিনের জন্য মান্দ্রাজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে ব্যাঙ্গালোরে যাব আর তথা হতে উতকামন্দে যাব—দেখা যাক্ যদি মহারাজ আমায় পাঠায়। 'যদি' বলছি, তার কারণ, আমি—র অঙ্গীকারবাক্যে বড় নিশ্চিত ভরসা রাখি না। তারা ত আর রাজপুত নয়—আর রাজপুত বরং প্রাণ দেবে, কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। যাইহক্, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'—অভিজ্ঞতাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

"স্বর্গে যেরূপ মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, কারণ, অনন্ত-কালের জন্য তোমারই মহিমা জগতে ঘোষিত হচ্ছে এবং সবই তোমারই রাজত্ব।"

তোমাদের সকলে আমার শুভেচ্ছা জানিবে।

ইতি—

তোমার

সচ্চিদানন্দ।

(৫)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

খেতড়ি, রাজপুতানা,

২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৩।

প্রিয় ডাক্তার,

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি আপনার প্রীতির জন্য আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। বালাজি বেচারার পুত্রের দেহত্যাগ সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলাম। "প্রভুই দিয়া থাকেন আবার প্রভুই গ্রহণ করেন—প্রভুর নাম ধন্য হউক।" আমরা কেবল জানি, কিছুই নষ্ট হয় না বা হইতে পারে না। আমাদিগকে সম্পূর্ণ

শান্তভাবে তাঁহার নিকট হইতে যাহাই আসুক না কেন, মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। সেনানী যদি তাঁহার অধীনস্থ সেনাকে কামানের মুখে যাইতে বলেন, তাহার তাহাতে অভিযোগ করিবার বা ঐ আদেশ পালন করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিবার অধিকার নাই। বালাজিকে প্রভু এই শোকে সান্ত্বনা দান করুণ আর এই শোক যেন তাহাকে সেই পরমকরুণাময়ী জননীর বক্ষের নিকট হইতে নিকটতর দেশে লইয়া যায়।

মান্দ্রাজ হইতে জাহাজে উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার যো নাই, কারণ, আমি পূর্ব্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিবেন, রাজা অথবা আমার গুরুভাইগণের আমার সংকল্পে বাধা দিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজাজীর আমার প্রতি অগাধ ভালবাসা।

একটা কথা—চেটির উত্তরটী ঠিক হয় নাই। আমি বেশ ভাল আছি। দু এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বোম্বাই রওনা হইতেছি।

সেই সর্ব্বশুভবিধাতা আপনাদের সকলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করুণ, ইহাই সচ্চিদানন্দের নিরন্তর প্রার্থনা।

পুঃ—আমি জগমোহনকে আপনার নমস্কার জানাইয়াছি। তিনিও আমাকে আপনাকে তাঁহার প্রতিনমস্কার জানাইতে বলিতেছেন।

প্রহেলিকা।

(বিমলানন্দ)

গেছিনু চাঁদের ঘরে
দেখাতে এ মুখের বাহার।
সবে দেখে তারি মুখ
কেহ নাহি দেখিল আমার।
অরুণ উদয় দেখে ফিরে এনু আপনার ঘরে।
সকলে পাগল হ'ল আমার এ চাঁদ মুখ হেরে।

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

(১)

আজকাল এক ঢংয়ের সমালোচক সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরা মাঝে মাঝে আপ্ত-বাক্য উদ্ধৃত করে নিজের মত দৃঢ় করেন কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেখা যায় অপর আপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করে পূর্ব্ব মহাপুরুষের বাক্যাবলীর দফা রফা করেন। তাঁহারা বুদ্ধের বচন তুলে শঙ্করের মত খণ্ডন কচ্চেন, আবার শঙ্করের মত তুলে দ্বৈতবাদীদের নিরাশ কচ্চেন, আবার বিবেকানন্দের মত তুলে শঙ্করকে একটা বাতুল প্রমাণ কচ্চেন, কখনও বা বিবেকানন্দের সব কথাগুলির দিকে দৃষ্টি না করেই, প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তাঁকেই নিরাশ করে বসছেন। স্বদেশীয় হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ গড়ে তুলবেন ব'লেই আবার তৎক্ষণাৎ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত—যা তাঁদের হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত খেলা কচ্চে—তাই দিয়ে একেবারে হিন্দুধর্ম্মের মুণ্ডপাত করতে দ্বিধা বোধ করেন না। ফলে পাঠককে একটা মস্ত গোলোক ধাঁধার মধ্যে পড়ে পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। এখন অপরাপর মহাপুরুষের মতামত ছেড়ে দিয়ে বিবেকানন্দের মতামত নিয়ে যদি কাহারও জীবনাদর্শ গড়ে তোলবার ইচ্ছা হয় (অবশ্য যাহারা নিজ বুদ্ধি এবং কল্পনাবলে একটা স্বাধীন জীবন গড়ে তুলবার ইচ্ছা করেন—যাঁরা ক,খ পর্য্যন্ত কারুর কাছে শিখতে অ-প্রস্তুত তাঁদের জন্য নয়) তাহলে উক্ত মহাপুরুষের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে সমগ্র মতামত উদ্ধৃত করে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আজকাল প্রবল একটা স্রোত বইছে—সেটা রজোগুণের। এই রজো-

---

* উদ্ধৃত অংশগুলি ভারতে বিবেকানন্দ—কলম্বোয় স্বামীজির বক্তৃতা হইতে

গুণ আমাদের দেশে খুব দরকার তা স্বামীজিও বলে গিয়েছেন—যা আমরা অন্যস্থলে দেখাব, কিন্তু সেটা যে সত্ত্ব-সংযত সেটার দিকে কারও নজর নেই। 'নিরীহ হিন্দু' কথাটা সময়ে সময়ে তিরস্কার বাক্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যদি কোন তিরস্কার বাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুক্কায়িত থাকে, তবে তাহা উহাতেই আছে।" হিন্দু 'নিরীহ' কেন?—না তাহার কর্ম্মশীলতা তমোমুক্ত রজের ব্যভিচারের দ্বারা দুষ্ট হয় নি বলে। সে "রক্তরঞ্জিত না করিয়া, লক্ষ লক্ষ নর নারীর অজস্র রুধিরস্রোত না বহাইয়া" ভারতে বা ভারতেতর প্রদেশে "নূতন ভাব প্রদান করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই।" বর্ত্তমান দেশনায়ক মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক মতামত ভাল হ'ক আর মন্দই হ'ক, সে সম্বন্ধে অভিমত না প্রকাশ ক'রে আমরা স্পষ্টস্বরে বল্‌তে পারি যে তাঁর Non violence (পশুবলের অপ্রয়োগ) ঠিক হিন্দুচিতই হ'য়েছে। কেন না "সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভাবের পর ভাবতরঙ্গ, ভারত হইতে প্রসূত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটীই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্ব্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরাই কখন অপর জাতিকে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা জয় করি নাই—সেই শুভ কর্ম্মফলেই আমরা এখনও জীবিত।" পক্ষান্তরে "অপরাপর অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে, আবার পড়িয়াছে, মহাগর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক স্বল্পকাল মাত্র পরপীড়াকলুষিত জাতীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে।" পাশ্চাত্য ঘোর বজ্রসম্পন্ন বিদ্যুদাধার থেকে হিন্দু-সমাজের ওপর ঘন ঘন অশনি নিক্ষেপ দর্শনে যারা ব্যথিত তাঁদের জানা উচিৎ "সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধান সকল এখনও বর্ত্তমান; সনাতনকল্প, শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই সকল আচার এখানে এখনও বর্ত্তমান। যতই দিন যাইতেছে, যতই দুঃখ দুর্ব্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে তাহাতে এই একমাত্র ফল হইতেছে যে, সেইগুলি আরও দৃঢ়, আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে।" ধর্ম্মই সদাচারের

বিধান কর্ত্তা, ধর্ম্মই বঙ্গের নিয়ামক সত্ত্ব। সেই ধর্ম্ম অপর দেশে—"এই সব নানা কার্য্যের ভিতর এবং ভোগে নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে—সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, একটু আধটু ধর্ম্ম-কর্ম্মও করা আছে। এখানে এই ভারতে কিন্তু মানুষের সমস্ত চেষ্টা ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য"—ভারত এর শেষ পরিচয় দিয়েছে নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মধ্য দিয়ে যে ধর্ম্ম একটা কথার জটপটি বাধান নয়, রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানের মত Practical এবং demonstrative। ইহকাল-ভোগ-সর্ব্বস্ব মতবাদ—গায়ে খোস পাঁচড়ার মত ত্যাগ-অঙ্গ ভারতেও, মাঝে মাঝে আবির্ভাব হয় বটে—তবে খুব অল্পকালের জন্য। সেই জঘন্য ব্যাধিটা ভারত অঙ্গে যে ব্যাপ্ত হ'তে পারে না সে একটা কারণে—তা দোষই হ'ক—আর গুণই হ'ক—সেটা হচ্চে পুনর্জ্জন্মে আস্থা। ক্রুর-মিথ্যা-কৌশলীকে জব্দ করবার জন্য আমরা চুরি, ডাকাতি, হত্যা, জাল, কুৎসা, চক্রান্ত প্রভৃতি জঘন্য সকল উপায় অবলম্বন ক'রতে পারি, তার দ্বারা প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করা যায় বটে, কিন্তু তাকে জয় করা হয় না। এই সত্য ভারত বহু অভিজ্ঞতার ফলে লাভ করেছে। আর এই অভিজ্ঞতার মূলে আছে কর্ম্মফল। "আমরা হিন্দু, আমরা বলি অনন্ত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলে মানুষের জীবন একটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে, কারণ, অনন্ত অতীতকালের ধর্ম্মসমষ্টিই বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ পায় আর আমরা বর্ত্তমানের যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে।" আর ইহকাল-সর্ব্বস্ব, দেহটাকে যারা ভোগের আয়তন মাত্র মনে করে, যেন তেন প্রকারেণ—ইন্দ্রিয়-গুলির সুখ হলেই ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হল—যাদের জীবনাদর্শ—তারাই পেশী-বল অবলম্বন করে তাদের রাজা 'পশুর' জয় ঘোষণা করে। তাই বলি "রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে। কখন ছিল না আর জানিয়া রাখ কখন হইবেও না।" তবে কি আমরা চিরকালই দাস-সুলভ পরশ্রী-কাতরতা স্ত্রীসুলভ কলহপরায়ণতা, নিষ্কর্ম্মার মত কুৎসা-প্রীতি নিয়ে Dog in the manger

হয়ে থাক্‌ব—নিজেরাও কিছু কর্‌ব না কিম্বা অপরকে কিছু কর্‌তে দেখ্‌লে তার কাছা ধরে টেনে নাবাব—আর সেইটে একটা মস্ত গৌরবের মনে করে শূন্য জালার মত ঢং ঢং করে রোজ—সকলের নিকট জাহির ক'রব, কিম্বা উত্তেজনাবশে উন্মত্তের মত যা তা করে সাধারণের কৌতুক ভাজন হ'ব?—বাস্তবিক কি আমাদের কিছু করবার নেই কিম্বা একটা কোনও জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নেই?

"আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষা করা এবং যখনি সুযোগ উপস্থিত হয় তখনি এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব বা ইংরাজেরা তাঁহাদের অজেয় বাহিনী যোগে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, তখনই ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা এই সকল নূতন পথের মধ্যদিয়া জগতের বিভিন্ন জাতির শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে।" "যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের অন্যান্য জাতির সম্মিলন ঘটাইয়াছে, চিরস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ভারতের যখনই স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ করিয়াছে, যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফল স্বরূপ সমগ্র জগতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বন্যা ছুটিয়াছে।"

আবার আমাদের তারই পুনঃ সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে যখনই কোনও বিজাতীয় ভাব এই বিরাট অজগরকে আক্রমণ করে তখনই ইহা তা'কে তার অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করে এবং নিজ ধর্ম্ম-লালা দিয়ে সিক্ত করে পরে একেবারে উদরসাৎ করে এবং যত বড়ই বিজাতীয় পদার্থ হ'ক, তাকে একেবারে হজম করে নিজের রক্ত মাংসের সহিত মিশিয়ে নেয়—সেই বিজাতীয় ভাবটা তখন তার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।"

"আমরা কখন বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই। যদি ইংরাজি ভাষায় কোন শব্দ থাকে, যাহা দ্বারা জগতের

নিকট ভারতের দান প্রকাশ করা যাইতে পারে, যদি ইংরাজি ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যদ্দ্বারা মানব জাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা এই,—fascination (সম্মোহনী শক্তি) হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, ইহা সেরূপ কিছু নহে; বরং ঠিক তাহার বিপরিত। অনেকের পক্ষে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা ভারতীয় আচার ব্যবহার, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু যদি তাহারা অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা করে মনোযোগ সহকারে ভারতীয় গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করে, ভারতীয় আচার ব্যবহারের মূলীভূত মহান তত্ত্বসমূহের সহিত সবিশেষ পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে, শত করা নিরনব্বই জন ভারতীয় চিন্তার সৌন্দর্য্যে ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। লোক লোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ ঊষাকালীন ধীর শিশির সম্পাতের ন্যায় এই শান্ত সহিষ্ণু সর্ব্বংসহ ধর্ম্মপ্রাণ জাতি চিন্তা জগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে।"

এই প্রাচীন প্রথার পুনরভিনয় প্রবল বেগে আরম্ভ হয়েছে। "আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কারের মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে প্রাচীন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্ম্মবিশ্বাস সমূহের ভিত্তি পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় মানব জাতিকে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবী করিয়া থাকেন, তাহা শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া যাইতেছে, আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবল মুষলাঘাতে প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কার সমূহকে ভঙ্গুর কাচপাত্রের ন্যায় গুঁড়াইয়া ফেলিতেছে, যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম কেবল অজ্ঞদিগের হস্তে এবং জ্ঞানিগণ ধর্ম্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" এই ভাঙ্গাচোরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই এক অতি-মানব,[†] সকল সাধনার মধ্যদিয়ে এক অতিউচ্চ অতিমহান সত্যে দাঁড়িয়ে জগতকে নূতন করে গড়বার জন্য কোটী জীমূত মন্দ্রে "মানুষের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের স্বরূপ, পূর্ণত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব, জগৎ যে শূন্য হইতে প্রসূত

নহে, পূর্ব্বাবস্থিত কোন কিছুর বিকাশ মাত্র, এতদ্বিষয়ক মতবাদ, যুগপ্রবাহ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত নিয়মাবলী এবং এতদ্বিধ অন্যান্য তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত সার্ব্বজনীন বেদান্ত ধর্ম্মের প্রচার কচ্চেন।"

বেদান্তের সকল তত্ত্ব এক বিরাট সত্যের উপর দণ্ডায়মান "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—"যত মত তত পথ"—এই সত্য হিন্দুর প্রতি রক্তবিন্দুতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই শক্তিরই বলে ভারত তাহার ক্রোড়ে জৈন, বৌদ্ধ, পারসীক, মুসলমানদের স্থান দিয়েছে এবং বর্ত্তমানে খ্রীষ্ট ধর্ম্মও সেই শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাচ্ছে। এখানেই, এখানেই কেবল হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টানদের মসজিদ্ গির্জ্জা গড়ে, আর এই শান্তির হাওয়ায় বাস ক'রে মুসলমানও শিখেছে কি ক'রে তাদের হিন্দুর মন্দির গড়তে হয়। এরই নাম পরধর্ম্মে সহানুভূতি বা Toleration Toleration মানে দ্বেষরাহিত্য—অপর ধর্ম্মকে উপেক্ষার চক্ষে দেখে মাপ করা নয়, তাদের জন্য প্রাণপণ করা। যেখানে এর অভাব সেখানে বুঝিতে হবে হিন্দুত্বের অভাব। হিন্দুর কায গড়া, যেখানে ভাঙ্গা সেখানে বুঝতে হ'বে হিন্দুত্বের অভাব। এখনও "অন্যান্য দেশের মহা মহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাক সিঁটকাইয়া আমাদের ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করেন। আমি তাহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, তাহারা স্থির হইয়া কখন এটি ভাবে না যে, তাহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোরতর কুসংস্কার সকল বর্ত্তমান। এখনও সর্ব্বত্র এই ভাব,—এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের এই ঘোর সঙ্কীর্ণতা। তাহার নিজের যাহা আছে, তাহাই জগতে মহা মূল্যবান্ সামগ্রী। অর্থোপাসনাই তাহার মতে জীবনের একমাত্র সদ্ব্যবহার। তাহার যাহা আছে, তাহাই যথার্থ উপার্জ্জনের বস্তু, আর সকল কিছুই নহে। যদি সে মৃত্তিকাময় কোন অসার বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে, অথবা কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়, তবে আর সব ফেলিয়া দিয়া তাহাকেই ভাল বলিতে হইবে! জগতে শিক্ষার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র জগতের এই অবস্থা! কিন্তু বাস্তবিক জগতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন—জগতে এখনও সভ্যতার প্রয়োজন। বলিতে কি, এখনও কোথায়ও সভ্যতার আরম্ভ

মাত্র হয় নাই, এক্ষণে মনুষ্যজাতির শতকরা ৯৯.৯ জন অল্প বিস্তর অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে তোমরা অনেক বড় বড় কথা পড়িতে পার, পরধর্ম্মে বিদ্বেষ রাহিত্য ও এতদ্বিধ উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, জগতে এই ভাবগুলির বাস্তব সত্তা বড় কম, শতকরা নিরানব্বই জন, এসকল বিষয় মনেও স্থান দেয় না।"

চিন্তারাশির মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ চিরকালই বর্ত্তমান থাকবে। সব বৌদ্ধ, সব খৃষ্টান, সব মুসলমান বা সব নাস্তিক এ কোন কালেও হবে না—ভেদ চিরকালই থাকবে, কারণ বৈচিত্র্যই জগতের সত্তা, বৈচিত্র্যই জগতের প্রাণ। যখন বৈচিত্র্য থাকেনা তখন জগতও থাকে না—ইহা ব্যষ্টি মানবের অতীন্দ্রিয় অবস্থার অনুভূতি। কিন্তু যখন সমষ্টি জগতও উহা অনুভব করবে তখন জগৎ ছায়াবাজির মত মহাশূন্যে মিশে যাবে। কিন্তু বৈচিত্র্য থাকলেই যে আমাদিগকে পরস্পর ঘৃণা কত্তে হবে, দ্বেষ কত্তে হবে, হাতিয়ার চালাতে হবে এর কোনও সার্থকতা নেই। এখন জগতের এই সন্ধিক্ষণে আমাদিগকে শেখাতে হবে শিখতে হবে, ধর্ম্মরাজ্যের শিশু-জগৎকে মঙ্গলময় পরশিবের মহিম্ন স্তোত্র,—

ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথ জুষাং
নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

—বেদ সাংখ্য পাতঞ্জল, বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান—সকল ধর্ম্ম নদী রুচি ভেদে সরল কুটিল নানা পথগামী হয়ে সেই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে সমাপ্ত হবে।

বদরীর পথে শঙ্কর।

(২)

(শ্রীমতী)

নূতন স্থানে আসিলে সেই স্থানের ইতিবৃত্তের প্রসঙ্গ সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সন্ন্যাসীর দল লোকমুখে অতএব বহু ইতিহাস শুনিতে লাগিলেন। কান্যকুব্জ নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রাচীনকালের সেই ব্রহ্মদত্ত রাজার কথা শুনিলেন। ক্রমে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে শঙ্কর বৈদিকধর্ম্মের দুরবস্থার কথা শুনিলেন। ব্রাহ্মণগণ বহু সময়ে বিচারে জয়ী হইলেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যের কারণ রাজ সাহায্য। আর তাহা পরলোকগত হর্ষবর্দ্ধনের সময়ই ঘটিয়াছে। ইহার কারণ বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণগণ দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "মহাত্মন্। গৌড় দেশের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র বর্দ্ধন হর্ষবর্দ্ধনের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে কৌশলে হত্যা করেন। হর্ষবর্দ্ধন তাহাতে বিচলিত হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধা করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় করেন আর তদবধি বৌদ্ধগণের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ দেখুন গঙ্গাতীরে শত হস্ত উচ্চ সহস্র সহস্র স্তূপ হর্ষবর্দ্ধনের নির্ম্মিত। ঐ দেখুন বিংশ হস্ত উচ্চ ধাতুনির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি হর্ষবর্দ্ধনের কীর্ত্তি। ঐ যে সূর্য্যদেবের মন্দির ঐ যে মহেশ্বরের মন্দির উহাদের প্রতি রাজার কোন যত্ন ছিল না। রাজা অসামান্য দাতা হইলেও অধিকদান বৌদ্ধগণই পাইত। আজ যদিও তিনি পরলোকগত কিন্তু এখন যে কে রাজা তাহার স্থিরতা নাই। কুমারিল স্বামীর নিকট বৌদ্ধগণের ভীষণ পরাজয় হইয়াছে, পরে কি হইবে জানি না।" এইরূপ নানা কথা শুনিতে শুনিতে কয়েক দিন অতীত হইল। সনন্দন প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকের অনুসন্ধান করিয়া কয়েকখানি সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর শঙ্কর কান্যকুব্জ ত্যাগ করিলেন।

এই স্থান হইতে কয়েকদিন গমনের পর শঙ্কর গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী মনোরম নগরী মধ্যে আসিলেন। তথায় সর্ব্বত্র বাঁধা ঘাট ও দেব-মন্দির বিরাজ মান। শঙ্কর লোকমুখে শুনিলেন ইহার নাম 'শূকর-ক্ষেত্র' (?)। নৃসিংহদেব এই স্থানে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন এবং তদবধি উহার এই নাম হইয়াছে। নচেৎ পূর্ব্বে ইহা 'উৎকল-ক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থান হইতে মথুরা বৃন্দাবন যাওয়া যায়। পুণ্যার্থিগণ মথুরা বৃন্দাবন হইয়া এই স্থানে আসিয়া গঙ্গাস্নান করেন। ভগীরথ গঙ্গা আনিবার জন্য এই স্থানে এক গুহামধ্যে দুশ্চর তপস্যা করেন। শঙ্কর সে গুহা দেখিলেন। এখানে সীতারামের মূর্ত্তি দর্শনের পর নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সনন্দন নৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন ইহা কেহই জানিতেন না। নৃসিংহদেব দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। প্রাণের আবেগ নিবৃত্তির জন্য তিনি স্বীয় অভীষ্টদেবের উদ্দেশে একটী স্তব রচনার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া করজোড়ে বলিলেন "ভগবন্। আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত কোন স্তোত্ররত্নদ্বারা ভগবানের স্তুতি করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমার জন্য একটী স্তব রচনা করিয়া দিলেই আমার এ বাসনা পূর্ণ হয়।" শঙ্কর সনন্দনের বাসনা বুঝিয়া প্রসন্নচিত্তে নিম্নলিখিত স্তবটী রচনা করিয়া দিলেন।

"ত্বৎ প্রভুজীবপ্রিয়মিচ্ছসিচেন্নরহরি পূজাং কুরু সততম্
প্রতিবিম্বালংকৃতি ধৃতি কুশলো বিম্বালংকৃতিমাতনুতে।
চেতোভৃঙ্গভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদ সরসিজ মকরন্দম্ ॥১
শুক্তৌরজত প্রতিমা জাতা কটকাদ্যর্থ সমর্থাচেৎ,
দুঃখময়ী তে সংসৃতিরেষা নির্বৃতিদানে নিপুণাস্যাৎ।
চেতোভৃঙ্গভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজ মকরন্দম্ ॥ ২
আকৃতি সাম্যাচ্ছাল্মলি কুসুমেস্থলনলিনত্ব ভ্রমমকরোঃ
গন্ধরসাবিহ কিমু বিদ্যেতে বিফলং ভ্রাম্যসি ভৃশবিরসেহস্মিন্।

চেতোভৃঙ্গভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং,
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজ মকরন্দম্ ॥৩
স্রক্চন্দনবনিতাদীন্ বিষয়ান সুখদান্ মত্বা তত্র বিহরসে,
গন্ধফলা সদৃশ ননু তেঽমী ভোগানন্তর দুঃখকৃতঃ স্যুঃ।
চেতোভৃঙ্গ ভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজ মকরন্দম্ ॥৪
তবহিতমেকং বচনং বক্ষে শৃণু সুখ কামো যদি সততং।
স্বপ্নেদৃষ্টং সকলং হি মৃষা জাগ্রতি চ স্মর তদ্বদিতি।
চেতোভৃঙ্গ ভ্রমসি বৃথা ভব মরুভূমৌ বিরসায়াং,
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজ মকরন্দম্ ॥৫

সনন্দন মনের সাধে স্তবটী পাঠ করিয়া ভগবানের পূজা করিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সনন্দনের সহিত যোগদান করিলেন। এইরূপে শূকর-ক্ষেত্রে (?) কয়েকদিন অবস্থিতির পর শঙ্কর সশিষ্য উত্তরাভিমুখে চলিলেন। (এই স্থানটীর বর্ত্তমান নাম সোরণ)

এই স্থান হইতে কয়েকদিন পথ চলিয়া শঙ্কর হস্তিনাপুরের নিকট আসিলেন। দেখিলেন হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। মধ্যে মধ্যে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ সেই অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। ইহার অনতিদূরে আসিয়া শঙ্কর সেই কণ্বমুনির আশ্রম দেখিলেন। এবং তৎপরে পুরাণ-প্রসিদ্ধ বেনরাজার রাজধানী দেখিলেন। (এস্থানটীর বর্ত্তমান নাম বিজনৌর) অনন্তর এখানকার দর্শনীয় বিষয়গুলি দেখিয়া শঙ্কর এইবার হরিদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কয়েকদিন পথ চলিয়া মায়াপুর নামক সেই দক্ষরাজার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের শোভা অতুলনীয় উত্তর দিকে বিরাটকায় নগাধিরাজ হিমালয়। দক্ষিণে দিগন্তস্পর্শী শস্য শ্যামল সমতল ক্ষেত্র। অসীমতায় উভয়ই অতুলনীয়। কেহই অপর অপেক্ষা হীন নহে। পতিতপাবনী ভাগীরথী দেবী পর্ব্বত রাজরূপ অবরোহণের সাহায্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছেন। নগরমধ্যে এই সন্ন্যাসী দলের সমাগমে নগরবাসীর দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট করিল। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া

অনেকেই ইঁহাদের সঙ্গ লইল। পরিচয়ে সন্ন্যাসিদলকে বৈদিক পথাবলম্বী জানিয়া জৈন বৌদ্ধগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদিগকে দেবালয়ে স্থান দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শঙ্কর কিন্তু গঙ্গাতীরে একবৃক্ষ মূল অবলম্বন করিলেন। গঙ্গার শীতল বায়ু স্পর্শে সন্ন্যাসীদিগের পথশ্রান্তি অবিলম্বে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সকলে এখানে গঙ্গাস্নান করিয়া দেবদর্শনে বহির্গত হইলেন। তীর্থগুরুগণ সন্ন্যাসীদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাদিগকে প্রথম দক্ষেশ্বর শিব সমীপে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন এই স্থানটী দক্ষরাজার গৃহ ছিল, এই স্থানেই দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন. পরে নিজ ভ্রমদূর হইলে দক্ষরাজ এই শিব প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করিয়া ছিলেন। এই শিবের যে ব্যক্তি পূজা করেন তিনি আর অশিব (অমঙ্গল) প্রাপ্ত হন না। তাহার একটু দক্ষিণকোণে অবস্থিত সতীকুণ্ড প্রদর্শন করাইয়া পাণ্ডাগণ সন্ন্যাসীদিগকে বলিলেন "মহাত্মাগণ। এই স্থানে সতী দেহত্যাগ করেন, যে স্ত্রীলোক সাত রবিবার এই কুণ্ডে স্নান করিবেন তিনি সতীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন।" এই কথা বলিয়া পাণ্ডাগণ অনতিদূরে শৈলোপরি রক্ষিত শিবের ত্রিশূল তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করাইলেন। এইরূপে ক্রমে তাঁহারা কুশাবর্ত্তের ঘাট, নারায়ণ শিলা, ব্রহ্মকুণ্ড, গঙ্গাদেবী, বিষ্ণুপদচিহ্ন, বিদুরের তপস্যাস্থান, ভীমের স্বর্গারোহণ কালে গদা ত্যাগের স্থান প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, সকলে গঙ্গাতীরে এক বৃক্ষমূলে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু যিনি ভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহার কি কিছুর অভাব ঘটে? হরিদ্বারবাসী ব্রাহ্মণেরা সন্ন্যাসিবৃন্দের ভগবন্নির্ভর ভাব বুঝিয়া ইতিমধ্যেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাস্তবিক, এরূপ সাধু সেবা করিয়া কে না ধন্য হইতে চাহে? একজন ধনী ব্রাহ্মণ গললগ্নীকৃতবাস হইয়া সন্ন্যাসীদিগের সমীপে আসিয়া সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। সুতরাং এদিন এইভাবেই অতিবাহিত হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(২)

কর্ম্মের পথ।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই জগতের দাসত্বরূপ বহিরাবরণ ছিন্ন করিয়া মহান্ মানব যে সাধনায় আত্মোপলব্ধি লাভ করিতে পারে তাহার নাম কর্ম্ম-তপস্যা।

কর্ম্মের কথা লইয়া একটা সমস্যা চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচ্য দর্শনের মতে কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন, আবার কর্ম্মই বন্ধন মুক্তির অস্ত্র, ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ভেলা স্বরূপ। কর্ম্ম সম্বন্ধে যে যথেষ্ট মতভেদ আছে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকাম, নিষ্কাম, বিষয়ী, ত্যাগী, ভক্ত, জ্ঞানী, নানা মত নানা পথ।

গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।

কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য এ বিষয়ের বিচারে মনিষিগণও বিমোহিত হন। গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়েই এই ভগবদুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা অর্জ্জুনের তুল্য মনিষীও যখন কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচারে বিমোহিত হইয়াছেন, তখন আর অন্যের সম্বন্ধে কথা কি।

কিন্তু তথাপি ভগবান্ গীতায় কর্ম্মকেই সংসার সমুদ্র উত্তরণের উপায় বলিয়াছেন। গীতার একটী মাত্র অধ্যায়ের নাম 'কর্ম্মযোগ' হইলেও সমস্ত গীতাখানি যেন সেই একই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ। ফলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে—জড়ত্ব মোচনে মানবত্বে উপনীত হইতে হইলে কর্ম্ম ভিন্ন পথ নাই। জ্ঞান চাও—কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ কর; ভক্তি চাও,—কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিকে সঞ্জীবিত কর, প্রেম চাও,—

কর্ম্ম দ্বারা প্রেমকে বিকশিত কর।* হে বীরহৃদয়, দৌর্ব্বল্যজনিত ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হও, জীবন পথে জড়ত্বের বন্ধন ক্ষয় কর, মনুষ্যত্বের জয়শ্রী লাভ কর, আপন প্রয়াসে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হও।

ইতিহাসও এই কথা পরোক্ষে প্রচার করিতেছেন। গীতা শ্রীভগবানের উপদেশ ইতিহাস সেই উপদেশের উদাহরণ স্বরূপ। এইজন্য ইতিহাসও গীতার ন্যায় আমাদের নিত্য প্রণম্য। জগতে লোকশিক্ষার জন্য যত যত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার হইয়াছে ইতিহাসেরও যে সেই সকলের সমশ্রেণীতে আসন তাহাতে আর ভুল নাই। যখন আমরা ইতিহাসের স্রোতে মনের নৌকা ভাসাইয়া যাত্রা করি তখন শত শত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিলয় শত শত জাতির জাতীয় উত্থান পতন—নানা বিচিত্র ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আন্দোলিত মানব সমাজের বহুবিধ পরিবর্ত্তনের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বাহিরের রাজ্য হইতে আমরা আর এক রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করি। সে রাজ্য মানুষের অন্তরের রাজ্য সেখানে কেবল অবিশ্রান্ত মনুষ্যত্বের সাধনা চলিয়াছে। ইতিহাস অধ্যয়নে মনে হয়, জগৎ যেন এক মহাসমুদ্র, শৌর্য্য ভীরুতা, ত্যাগ, স্বার্থপরতা, স্নেহ প্রেম করুণা, দারুণ নৃসংশতা এ সমস্তই সেই এক মহাসিন্ধুর তরঙ্গের উত্থান পতন। সেই উত্থান পতনের তরঙ্গাভিঘাতে, অনন্তযাত্রায় মহামানব তাহার মনুষ্যত্ব নৌকার হাল দৃঢ় করিয়া ধরিয়া আছে। মানুষ জন্মে কেন? মনুষ্যত্ব লাভ করিতে। মরে কেন? তাহাও মনুষ্যত্ব লাভের প্রয়োজনে। ইতিহাস এই চিরন্তন সত্য চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছে।

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদ বলে "আগে জড় পরে জীব সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে জীব জড়কে শাসন করিবে। জড়াপ্রকৃতি জীবের

---

* জ্ঞান ও প্রেম কর্ম্ম সাধ্য নয় কারণ যাহা সাধ্য তাহা নশ্বর। জ্ঞান ও প্রেম স্বয়ং বিকাশ—কর্ম্ম উহার আবরণ সরাইয়া দিতে পারে, উহা উৎপন্ন করিতে পারে না। গীতার তাৎপর্য্য কর্ম্মে নয়—কর্ম্ম ত্যাগে।
—উঃ সঃ।

অধিকার ও জীব তাহার প্রভু হইবে। বৃক্ষাদি উদ্ভিদ জড় না হইলেও নিষ্কর্ম্মক পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমবিকশিত হইল। পিপীলিকা মৌমাছি প্রভৃতি কীট পতঙ্গ সহজাতবুদ্ধির আশ্রয়ে প্রকৃতির অঙ্কে লালিত হইতে থাকিল ইহাদের সসীম উন্নতি শীঘ্রই চরম সীমায় উপস্থিত হইল, কিন্তু মেরুদণ্ডী (Vertebrate) জীবের উন্নতি কর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়া "মনুষ্যত্ব" নামক এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল যে যেখানে আর সীমার কোন পরিমাপ রহিল না। মৌমাছির আত্মত্যাগে, পিপীলিকার অদ্ভুত কর্ত্তব্য পালনে কখনও ত্রুটী হয় না, তাহারা প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট সহজ পথ ধরিয়া অনায়াসে জীবনের পথে চলিয়া যায়। কিন্তু মানুষ—প্রতিক্ষণে পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে যাইতেছে, কর্ত্তব্য ভুলিয়া অকর্ত্তব্য করিতেছে, নিজের জীবনের পথ নিজ কর্ম্মফলে ক্রমশঃ জটিল ও দুঃখময় করিয়া তুলিতেছে—এবং ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে সে কীট পতঙ্গ নয়, সে মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরু আর দেয়ালই থাকে। মানুষ চুরি করে, মিথ্যা কয় আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।" মানুষ সাধারণত প্রকৃতির ক্রীড়া পুত্তলী, দুর্দ্দম প্রবৃত্তির ইঙ্গিত অনুসারে সে জীবনের পথে ছুটিয়াছে পূর্ব্বভাব বাহ্যাবস্থার নিষ্পেষণ তাহাকে যন্ত্রবৎ যথানির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য করিতেছে। অতীতের কর্ম্মসূত্র তাহার বর্ত্তমানকে নিয়মিত করিতেছে কিন্তু তথাপি মানুষ—মানুষ। প্রবল নিয়তির অনুশাসনে মানব জীবন ভাসিয়া যায় বলিয়াই মানুষ যে স্বাধীন, স্বাধীনতাই যে তাহার ধর্ম্ম তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষকারের অর্থ প্রারব্ধ লঙ্ঘন। প্রারব্ধ না থাকিলে পুরুষকারের কোন অর্থই থাকিত না। জড় জগতের সহস্র বন্ধন অজড় আধ্যাত্মিকতার প্রকাশের আয়োজন স্বরূপ। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

জ্ঞানবান্‌গণও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করেন। প্রাণীসমূহ

প্রকৃতির অনুসরণ করে অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কে করিবে?" অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেই প্রকৃতির দাস। যতদিন তাহাদের সুখ দুঃখের অনুভূতি বিকশিত হয় নাই, ততদিন সহজাত সংস্কারে তাহার প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে এবং সুখ দুঃখের অনুভূতি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব অনুরূপ প্রকৃতির নির্দ্দেশে দুঃখ পরিহারে অথচ সুখের অভিলাষে ধাবিত হইতেছে। বুদ্ধি-সম্বল জ্ঞানী-অজ্ঞানী বিদ্বান-মূর্খ সকলেরই একপথে গতি এবং ইহাই মানবের সাধারণ জীবন। স্বভাব অর্থ দাসত্ব, মানব যখন স্বভাবের সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধ করে তখন সেই স্বভাবকে কিরূপেই বা অতিক্রম করিবে?

কিন্তু মানুষ হার মানে নাই। মনুষ্যত্বের বীজ অবিনাশী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

ভোগসুখ তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, সুবর্ণ রাশির চাপেও সে ধ্বংস হয় না, সম্মানের মাদকতার স্রোতেও তাহা ভাসিয়া যায় না। জগতে যত কিছু ভোগ সুখ সম্ভব নৃপতি শুদ্ধোধন তাঁহার কুমারের জন্য তাহা আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সুখ-বিলাসের কুসুম-শয্যাতেই সহসা কুমারের মনে বিষাদের উদয় হইল। এই বিষাদ যোগেই গীতার প্রারম্ভ। (ক্রমশঃ)

মুক্তির খেয়াল।

(বিমলানন্দ)

পড়ে থাকি মৃত্তিকায় সূতা বাঁধা আকাশেতে উড়ি।
যেই সূতা কেটে যায় পুনরায় মাটিতেই পড়ি॥
বন্ধন দিয়েছে মোরে জোর করে আকাশেতে তুলে।
আগে আমি বুঝি নাই মুক্তি আছে বন্ধনের মূলে॥

সেবা।

(বিশোক)

লোকের অভাব দেখলেই তা দূর করবার যে একটা প্রবৃত্তি, সেটা মানুষের ভিতরেই থাকে, সে ভাবের উদয় করতে বাইরে কিছু খুঁজতে যেতে হয় না। এই প্রবৃত্তিটিকে চলতি কথায় দয়া ব'লে থাকে এবং সেই দুঃখ নিবারণ করতে মানুষ যে উপায় অবলম্বন করে তাকেই সেবা বলে সকলে জানে।

মানুষ স্বভাবতঃই সমাজবদ্ধ হযে থাকতে চায়। হয়ত কোন স্মরণাতীত কালে মানুষ একলা বাস করত, কিন্তু বর্তমানে সমগ্র মনুষ্য জাতির মানসিক অবস্থা একটু পর্য্যালোচনা করলে জানতে পারা যায় যে, একলা বাস করা মানুষের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তবে কি মানুষ কখনও একলা বাস করে না, না করতে পারে না? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ— কোন নিয়মই পর্য্যাপ্ত নয়, সব নিয়মেই ব্যতিক্রম আছে বা থাকে। কবে মানুষ একলা বাস করত বা একেবারেই করত না, কিংবা কতদিন তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করছে এই প্রশ্নের মীমাংসা করবেন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। মোটের উপর আমরা দেখতে পাই যে যেদিন থেকে মানুষ গোষ্ঠিবদ্ধ হ'যে বাস করতে সুরু করলে, সেইদিন থেকে সে পরস্পরের অভাব বোধ করতে লাগল, এবং তার মনে এই ভাব উঠল যে, তার ভাইএর অভাব দূর করা যায় কি না? সকল মানুষই কিছু সকল বিষয়ে সবল ছিল না, কারও হয়ত দেহটা রুগ্ন- মনটা খুব দৃঢ়, আবার কারও হয়ত মনটা তত সবল না হলেও দেহটা বেস মজবুত ছিল। এখন গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে থাকার দরুন একটা সুবিধা হ'ল যে এক ভাই অন্য ভাইএর অভাব বুঝতে পাল্লে এবং সেই অভাব দূর করার ইচ্ছে একের মনে উঠল। এমনি করে সেই স্মরণাতীত আদিমকালে মানুষের ভেতরে যে দয়া ছিল তাই মূর্ত্ত হয়ে উঠল এবং সেই অভাব দূর করতে সেবারও

প্রবর্ত্তন হ'ল। বকমারা সেবা—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি। প্রথমতঃ অভাবের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না—কারণ তখন মানুষ জাতের ছেলেবেলা (একথাটা ধরে নেওয়া গেল, কারণ কবে যে মানুষের সৃজন হয়েছে বা মানুষ বরাবর আছে, এ মস্ত গবেষণার বিষয়)। যেমন আমাদের ছেলেবেলায় অভাব খুব কম থাকে—তেমনি মানুষ-জাতের ছেলেবেলায় যে তাদের অভাবের ফর্দ্দ আজকের তুলনায় ঢের কম ছিল, একথা বেশ বড় গলা করে যদি বলা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই নানা তর্ক উঠবে না, এবং এ বিষয়ে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি।

আমাদের মধ্যে যারা তাঁদের পিতামহদের দেখেছেন এবং তাঁদের দিনের কথা যদি কারও মনে থাকে বা অপরের কাছ থেকে শোনা থাকে, তা হ'লে তার সঙ্গে যদি নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের তালিকাটি মিলিয়ে দেখেন, তাহ'লে স্পষ্টই দেখবেন, যে আজ তাঁদের অভাবের ফর্দ্দে অনেক গুলি অঙ্ক বেড়ে গিয়েছে।

কেন যে এই অভাব বাড়ল, বা অভাব বাড়া উচিৎ কি অনুচিৎ—স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, দেশের পক্ষে কল্যাণকর কিনা কিংবা ব্যক্তি হিসাবে অভাবে কি সুবিধা বা অসুবিধা হয় তা আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বাইরে। আমাদের আলোচনার বিষয় যা অভাব দেখতে পাচ্ছি তা দূর করবার কোন উপায় আছে কিনা এবং থাকলে সে উপায়গুলি কতটা সমীচীন ও কার্য্যকরী।

উপায় আছে একটিমাত্র—সেবা।

আমরা এখন যা আলোচনা করব তা আমাদের দেশের অভাবগুলি এক একটি নিয়ে এবং তার উপায় সেবা দ্বারা হয় কিনা এবং আমাদের আলোচনার ফল নিয়ে অন্যান্য সমস্ত দেশগুলির বিষয় মাপকাটিতে মেপে নেওয়া যেতে পারে কি না।

এখন দেখা যাক সেবা কথাটা আমাদের দেশের সাধারণে কি অর্থে ব্যবহার করে? লোকে সেবা বলতে প্রথমে বোঝে রোগীর সেবা করা, তারপর বড় জোর সাধু অতিথি বা পূজ্য ব্যক্তির পরিচর্য্যা করা, তবে ভারতের কোন কোন প্রদেশে সেবা ভোজনের অর্থে ব্যবহৃত হয় শোনা

গিয়াছে। এ ছাড়া সেবা বহু রকমের হতে পারে সে সব বিষয় আলোচনা পরে হবে—এবারকার মত সেবার প্রধান অর্থ বা সাধারণ অর্থ 'রোগীর সেবা' করা এই ভাবটাই আমরা নিলাম। আমাদের দেশে আজকাল অনেক হাঁসপাতাল হচ্ছে বা আছে, সরকারী ও বে সরকারী যেখানে বিনা অর্থে রোগীদের সেবা করা হয়। কিন্তু তা পর্য্যাপ্ত নয়, তাই দেশে নূতন নূতন, হাঁসপাতাল এবং কোথাও কোথাও দেশী লোকে সেবাশ্রম খুলেছে। উদ্দেশ্য যাতে পীড়িতের চিকিৎসা যথাযথ হয়, এবং যথাসম্ভব পীড়িতদের না ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সরকারী বা বে-সরকারী হাঁসপাতালে কিরূপ চিকিৎসা ও সেবা হয় সে সম্বন্ধে যদি কাউকে সত্য মতামত প্রকাশ করতে অনুরোধ করা হয়, তা হলে অপ্রিয় আলোচনার হাত থেকে এড়াবার জন্যে তাঁরাও প্রসঙ্গ তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই বলেন —থাক্। আমরাও সেই পথই নিলাম। এতে সত্য গোপনের পাপ ও নীতি-শাস্ত্রের অপমান কল্লাম। কিন্তু নিরুপায়।—

সাধারণতঃ যারা সেবা ধর্ম্ম গ্রহণ করেন—অর্থাৎ যাঁরা আজীবন বা দীর্ঘ কিছুকাল ধরে সেবা করব এই ব্রত নেন—তাঁরা সকলেই গোপনে কাজ আরম্ভ করেন দেখা গিয়েছে। আর এই ভারতবর্ষে যেখানে আতুরের সেবা একটা কর্ত্তব্য ছিল সেখানে তাঁদের গোপনে কাজ করতে হয়। কেন? লোকে সহানুভূতি ত' করেই না, উপরন্তু ঘৃণা করে, কুকুর বেড়ালের অধম দেখে, তাঁদের বলে যে এরা সর্ব্বনাশের পথে গিয়েছে, মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কেননা এরা রোগী ঘাটে, মূত্র বিষ্ঠা পরিষ্কার করে, অতি ঘৃণিত নীচ বৃত্তি। হায় হায়। দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা! অথচ এমন একদিন ছিল —যেদিন এই ভারতবর্ষে—সন্ন্যাসীর কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ লোকের হিত করাই তাঁর একমাত্র কর্ম্ম—প্রত্যেক গৃহস্থ অপরের সেবা না করাকে —বিশেষতঃ সেই অপর যদি আতুর হয়—তাঁর সেবা না করাকে মহা অমঙ্গল ও অকল্যাণের কাজ বলে মনে করত।

যাঁরা সেবা করতে প্রথমে সুরু করেন, তাঁরা একাধিক হলে, বেশ সুবিধার সহিত মিলে মিশে কাজ করেন, কিন্তু যদি একলাই হন তাতেই বা ক্ষতি কি?—একলা কাজ করবেন তিনি। মহাপ্রাণকর্ম্মী সঙ্গীর

অপেক্ষায় বসে থাকেন না, তিনি কাজ সুরু করলেই অনেক গুণগ্রাহী কর্ম্মী এসে জোটে।

এখন একটা দরকারী কথা এর সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে। সেবা কি ভাবে চলবে? অনেকে হয়ত ভাব্‌বেন যে 'ভাবে আবার কি রকম?' সেবা ত 'সেবা'ই তার আবার 'ভাবটার' কি? আর ঐ সব ভাবের কথায় তোমরা সমস্ত কাজ নষ্ট কর, কাজের আবার ভাব কি রকম, কিন্তু ভাব আছে—কাজ আর কিছুই নয় ভাবেরই ঘন মূর্ত্তি—আর কাজের সঙ্গে—সেবার সঙ্গে যদি ভাবের অনৈক্য হয় তা হলে সেবা কাজ চলে না। মূলতঃ তিনটে ভাব নিয়ে সেবা চলতে পারে: প্রথমতঃ দয়ার ভাবে—দ্বিতীয়তঃ উপাসনার ভাবে—তৃতীয়তঃ আত্ম ভাবে। এখন দেখা যাক কোনটা বেশী কার্য্যকরী।

সাধারণ লোকের অপরের দুঃখ দেখলে তা মেটাবার ভাব দয়া থেকে উঠে। রাম দুঃখী এবং পীড়িত, তার কেউ নেই যে তাকে দেখে, বা তার শুশ্রূষা করে, শ্যামের অর্থ ও সামর্থ আছে—সে রামের দুঃখ দেখে অনুকম্পা পরবশ হয়ে তাহার সাহায্য করতে উদ্যত হল—যতটা তার দেবার অভিরুচি হল, যতটা তার সমাজ ও পদমর্য্যাদা ও অন্যান্য জিনিষ করতে বল্লে। এই সমাজের ও পদমর্য্যাদাদির কথা তুললাম এই জন্যে যে প্রায়ই দেখা যায় যে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁরা পদস্থ ও ধনী ব্যক্তি হন। সুতরাং তাঁদের পদমর্য্যাদা—মান এবং লোকের কথায় বেশ একটু খেয়াল রাখ্‌তে হয়। অবশ্য তাঁরা অনেকের দুঃখ মেটান, অনেকের সেবা করেন একথা খুব সত্যি কিন্তু একটা জিনিষ যা তাঁদের সেবাটাকে সুচারু ও পরিপূর্ণ করেনা তা হচ্ছে তাঁরা যা করেন তার বেশীর ভাগই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয় না। হয়ত কেউ শুন্‌লেন অমুক জাগায় খুব মহামারী হচ্ছে—খবরের কাগজ পড়ে ও অন্যান্য সূত্রে জান্‌তে পারলেন, পীড়িতদের কিঞ্চিৎ অবস্থা, কেউ কেউ ফুরসৎ করে মহামারীর স্থান, সেখানকার পীড়িতদের অবস্থাও দেখে এলেন, কিন্তু সেখানে তিনি নিজে থেকে ব্যবস্থা করতে পারলেন না অর্থ ও কিছু লোক সাহায্য করে তিনি চলে এলেন। তাতে ফল হল এই যে, তাঁর দয়ার সবটা কাজে এলোনা। কারণ নিজে

নিজে না দেখ্‌লে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না, অনেক সময় গভীর ক্রটি থেকে যায়। দয়ার ভাবে এই ক্রটি সেবাকে অনেক সময় সুচারু করে না, এবং দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে মোটেই কার্য্যকরী হয় না। কারণ দয়ার ভাবে একটা মস্ত দোষ যে, সর্ব্বদা দাতা ও গৃহীতার মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান সৃজন করে। আজ উদ্দেশ্য বিহীন দয়া করতে ও ত কই আজ পর্য্যন্ত কাউকে দেখলাম না, তবে অনেকে বলেন যে, ওই না দেখাটা যুগের দোষ—কিন্তু যুগের দোষ হলেও নিছক্ সত্যি কথা।

নিজের হাতে কোন কাজ না করলে যেমন সেটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, তেমনি আবার কাজের শেষে আনন্দও পাওয়া যায় না। আর আনন্দই হ'ল আসল জিনিষ। দয়া থেকে উদ্ভূত সেবাকাজে যে আনন্দ পাওয়া যায় না একথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হবে, কিন্তু সে আনন্দও পর্য্যাপ্ত নয়। দয়ার ভাবে সেবা বিশেষ কার্য্যকরী না হলেও ওর খুব দরকার আছে কারণ ওটা প্রাথমিক।

এই যে এত প্রাথমিক জিনিষ দয়া—অপরের দুঃখ দেখে তা দূর করবার একটা সৎভাবের উদয়, তাও আজকাল আমাদের দেশে বিরল হয়ে পড়ছে। অথচ আমরা শুন্‌ছি দেশের উন্নতি হচ্ছে। যে দেশের লোকে একলা খেতে পারত না—সে দেশের লোক অপরের বিপদ দেখ্‌লে নিজের বাড়ীর কথা—সুবিধা অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে পীড়িতকে সেবা করে সারা রাত্রি কাটিয়ে দিত—পীড়িতের জাতি ধর্ম্ম, স্ত্রী পুরুষ কিছু ভেদ ছিল না—পীড়িত হলেই হ'ল—তাকে সেবা করাই ধর্ম্ম ছিল সেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থা জেনে শুনেও যাঁরা জান্‌তে চান্‌না তাঁদের আজ আমি বলছি, আজ যে তুমি রোগী দেখ্‌লে দশহাত দূরে সরে যাও—পাগল দেখ্‌লে পুলিশে দেও, যে ভাই তোমার জন্যে খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলছে তার দিকে না তাকিয়ে তারই উপার্জ্জন তারই রক্ত—সেই রক্ত মাখান টাকা নিয়ে ফূর্ত্তি করছ, আর ভাবছ তুমি ত নিজে বেশ সুখে আছ, তাতে জগতের যাই হোক না কেন? সুখে তুমি কিছুতেই থাক্‌তে পার না, ভগবানের রাজ্যে এত অবিচার হয় না। যে করুণ দৃষ্টি আজ তুমি উপেক্ষা করছ—যে অশ্রুজল তুমি ঘৃণা করছ—যে আর্ত্তনাদ তুমি সঙ্গীত দিয়ে

ঢাকবার প্রয়াস করছ—যে বুভুক্ষু—তুমি নিজে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে অন্ন খাচ্ছ বলে একবার ফিরেও দেখ্‌লে না, তারা তোমায় কিছুতেই শান্তি দেবেনা, একদিন আসবে যেদিন তোমার অন্তরাত্মা তা সহ্য কর্ত্তে পারবেন না, তিনি ব্যথিত পীড়িতের দুঃখে কেঁদে উঠবেন—সেইদিন তোমার হয়ত সামর্থ্য কমে যাবে, অর্থের অনটন হবে, তখন তুমি 'কি করেছি' বলে সারাজগতে হায় হায় করে বেড়াবে। তাই বল্‌ছি, হে ধনি, আজ সময় আছে, আজই তুমি সেবাব্রত লও, সেবা করে ধন্য হও ফূর্ত্তিকে আর শান্তিকে এক বলে ভুল করো না। ফূর্ত্তির অবসাদ সঙ্গে সঙ্গে, আর শান্তি নিত্য, অক্ষয়।

(ক্রমশঃ)

উদ্দেশে।

(ললিত)

আসিয়াছ দীনবেশে দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে,
করিবারে বিদ্যাগর্ব্ব আদর্শ জীবনে খর্ব্ব,
হে মহিমময়।
পঞ্জিকায় আছে লেখা বিশ আড়া জল,
নিঙাড়িলে নাহি মিলে কিছু।
পুঁথিগত বিদ্যা যাহা তথা ফলপ্রদ তাহা,
অভিমানী ফিরে যায় পিছু।
কি তপস্যা—কি সাধনা—কি সে আত্মজয়,
আচরিয়া দেখায়েছ হইয়া সদয়।
জগতের পাপ-তাপ, করি দেহ পণ
ব্যাধিরূপে করিলে হে কণ্ঠের ভূষণ।
এই রোগ-জীর্ণ দেহে তব স্নিগ্ধ তব স্নেহে।
দীন আমি কিবা ক'ব করুণ-কাহিনী তব!

গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া। *

(শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্, বি।)

আমাদের দেশে গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া হইলে প্রায়ই গর্ভিনীর অকাল মৃত্যু বা শিশুর অপমৃত্যু হইয়া থাকে। এজন্য আমাদের সকলেরই এসম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

উৎপত্তি।

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে ম্যালেরিয়া একপ্রকার বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আনুবীক্ষণ পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে ইহা এক-প্রকার জীবাণুর কার্য্য। শুধু ম্যালেরিয়া নয় আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রায় সকল রোগই জীবাণু সম্ভূত,—যথা কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে কলেরার সময় জল ফুটাইয়া খাইলে ঐ রোগ হয় না—কারণ ঐ সব জীবাণু মরিয়া যায়। এই জীবাণু আমাদের দেশে এক প্রকার মশা আছে যাহাকে এনোফিলিশ বলে তাহাদের দংশন হইতেই মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

এই ম্যালেরিয়ার বীজাণু সম্বন্ধে পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথমে ইটালি দেশে হয় তৎপরে ক্রমে অন্যান্য স্থানেও পরীক্ষিত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া-কীট-বহনকারী-মশা সাধারণতঃ জলাস্থানে বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন পুষ্করিণী পানা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ দ্বারা আবৃত থাকে তথায় ইহাদের জন্মিবার প্রধান স্থান। এই সব পুষ্করিণীর পাড়ের দিকে ইহারা ডিম পাড়ে। ভাঙ্গা কলসী বা হাঁড়ি প্রভৃতিতে জল কিছুদিন জমিয়া থাকিলে সেখানেও মশা জন্মাইয়া থাকে। গরুর বিচালি-খাইবার-ডাবা প্রত্যহ পরিস্কার না করিলে ঐ সঞ্চিত পচা জলেও মশা জন্মায়।

প্রতিবিধান।

(ক) এই জন্য যাহাতে আমরা এই সকল মশার দংশন হইতে

* কৃষ্ণনগর—"শিশু-মৃত্যু-নিবারণী" সভায় পঠিত।

পরিত্রাণ পাইতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের দেখা উচিত যে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যেন ভাঙ্গা চুরা অব্যবহার্য্য মৃৎপাত্রাদি পড়িয়া না থাকে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে। বাড়ীর নিকটে পুরাতন জঙ্গলাবৃত পুষ্করিণী থাকিলে তাহা পরিষ্কার করাইয়া লওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ গাছপালা যতদূর পরিষ্কার রাখা সম্ভব সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। *খুব সামান্য খরচে এই মশা মারিতে হইলে কিছু কেরোসিন* তৈল ঐ সকল জলাস্থানে ছিটাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

(খ) মশারি টাঙ্গাইয়া শুইলে ইহাদের হাত হইতে কতকটা পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

(গ) কুইনাইন্ সপ্তাহে ১০ গ্রেণ্ করিয়া দু'বার খাওয়া উচিৎ—বিশেষতঃ বর্ষাকালে।

এই জীবাণু কি প্রকারে আমাদের শরীরে মশকদংশনের সহিত প্রবিষ্ট হয় এবং তাহার ক্রিয়ায় কিরূপ জ্বরের প্রকাশ ঘটে তাহাও আমাদের সামান্যভাবে জানিয়া রাখা উচিত।

এই শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া যখন কোনও সুস্থকায় ব্যক্তিকে দংশন করে তখন ঐ সুস্থ ব্যক্তির রক্ত শোষণ কালে ম্যালেরিয়ার বীজ তাহার শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় এবং ঐ বীজ রক্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনা আপনিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বেশী পরিমাণ বীজ রক্তে জমিয়া গেলেই জ্বর প্রকাশ পায়। এই রোগ মানুষের শরীর যে একেবারে ধ্বংস করিয়া দেয় ইহার পরিচয় কৃষ্ণনগরবাসীগণকে বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে না।

গর্ভাবস্থায় এই রোগ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ :—

(১) মা সুস্থ ও সবল না হইলে ছেলে কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। দেখা যায় যে গর্ভাবস্থায় এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই প্রসব সমাপ্ত না হইলে প্রসূতির জ্বর ত্যাগ হয় না। আবার অনেকলোকের ধারণা যে গর্ভাবস্থায় কুইনাইন না দেওয়াই উচিত। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রায়ই গর্ভিনীকে কুইনাই দেওয়া হয় না। ফলে রোজই অল্প অল্প জ্বর দেখা দেয় এবং গর্ভিণী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতে থাকে।

অনেক সময় এমন দুর্ব্বল হইয়া যায় যে প্রসব করিবার পর্য্যন্তও ক্ষমতা লোপ পায়। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে উপযুক্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থায় কুইনাইন সেবনে কোন গর্ভিণীর কখনও কোনও কুফল হইতে পারে না। পরন্তু এইভাবে ভুগিয়া ভুগিয়া অনেক গর্ভিণী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন বা প্রত্যহ খুব বেশী জ্বর হইলে গর্ভপাত পর্য্যন্ত সম্ভব। প্রত্যেকের জানা উচিত যে মাতা বা শিশুর পক্ষে প্রবল জ্বরের উত্তাপই ক্ষতি করে—কুইনাইন নহে। কারণ জ্বর বৃদ্ধির সহিত জরায়ু মধ্যস্থ যে তরল পদার্থ যাহাতে ভ্রূণের অবস্থিতি তাহা উত্তপ্ত হয়। উহা অধিক উত্তপ্ত হইলেই ছেলের পক্ষে হানিকর হয় এবং অত্যধিক জ্বরে গর্ভপাত হইতে পারে। কুইনাইন কখন খারাপ করে না—যদি উহা ঠিক ভাবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা সময় মত ব্যবস্থিত হয়—বরঞ্চ ইহাতে এই প্রবল জ্বর শীঘ্রই প্রশমিত হয়।

(২) গর্ভাবস্থায় মাতার শরীরে অধিক পরিমাণে রক্তের আবশ্যক। এই জন্য এই সময় প্রসূতির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। কারণ গর্ভাবস্থায় তাহাকে নিজের শরীর পালন ছাড়া আর একটী শিশুর পুষ্টিসাধন করিতে হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া আমাদের শরীরের রক্তবীজ নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া রোগী রক্তহীন হইয়া পড়ে। গর্ভাবস্থায় যখন অধিক রক্তের প্রয়োজন সেই সময় ঐ বিষ আরও রক্তহীন করিয়া দেয়। বিশেষতঃ যদি কুইনাইন না খাইয়া অনেকদিন ধরিয়া রোগিণী ভুগিতে থাকে লাভে হয় এই পীড়িতা প্রসবের পূর্ব্বে রক্তহীন হওয়ায় ফুলিয়া পড়ে। যদি সময়মত চিকিৎসা হয় তবে ঐরূপ হইতে পারে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এখানেও সেই কুইনাইন সম্বন্ধে কুসংস্কার নানাপ্রকার দুঃখের কারণ সৃজন করে।

(৩) গর্ভাবস্থায় বেশীদিন এই রোগে ভুগিলে মাতা স্বাস্থ্যহীনা হইয়া পড়েন। ফলে শিশু উপযুক্ত পুষ্টি অভাবে স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে পারে না এবং ক্রমশঃই মাতার দুর্ব্বলতার সহিত শিশুও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রসবের পর দেখা যায় যে একটী ক্ষীণাঙ্গ শিশু ভূমিষ্ঠ

হইয়া বাঙ্গালায় জড়তার ভাব বৃদ্ধি করিয়াছে। মাতা ম্যালেরিয়ায় বেশীদিন ভুগিলে—বিশেষতঃ কুইনাইন খাওয়া অভ্যাস না থাকিলে—দেখা যায় যে এই সদ্যজাত শিশুর পেটেও প্লীহা হইয়াছে। কখনও কি আশা করা যায় যে এই সব প্লীহাগ্রস্ত শিশু অধিকদিন জীবিত থাকিয়া দেশের ও দশের উপকারে আসিবে? দেশের এই শারীরিক অধঃপতনের দিনে প্রত্যেক মায়ের প্রধান কর্ত্তব্য যাহাতে এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত এবং ক্ষীণাঙ্গ শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়।

(৪) বেশীদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিলে স্বাস্থ্যহীনতা ও উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে প্রায়ই মাতার প্রসবের পরে স্তনে দুগ্ধ থাকে না। ফলে সুস্থকায় শিশু জন্মাইলেও (যদিও সে আশা খুব কম) উপযুক্ত স্তন্য দুগ্ধ অভাবে শিশুর শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয় এবং কোন রকমে শিশু ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলেও ricket (রিকেট্) প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে শিশুর পক্ষে মাতৃ দুগ্ধ ছাড়া অন্য কোন দুগ্ধ বা পেটেণ্ট খাদ্যাদি বিষবৎ। দুঃখের বিষয় এই যে কোন কোন মাতা—অবশ্য বড়লোকের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আলোকিতা হইয়া আয়া প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন এবং শিশুকে স্তন দিতে আপত্তি করেন—তাঁহাদের জানা উচিত যে ইহার ফলে শিশুর মৃত্যু বা ক্ষীণ-জীবী হওয়ার পথ প্রসারিত করিতেছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে :—

কুইনাইন কখনও গর্ভাবস্থায় মাতার বা শিশুর কোন ক্ষতি করে না যদি সময় মত এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা দেওয়া হয়।

২। ম্যালেরিয়া জ্বর হইলেই প্রথম হইতে ভালভাবে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা গর্ভিণীর চিকিৎসা করান উচিত। তাহা হইলে প্রসবের সময় বা পরে আক্ষেপের কোনও কারণ থাকে না।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় জানান যাইতেছে যে সূতিকাগার উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। কারণ, স্যাঁতসেতে, বদ্ধবায়ু, অন্ধকার, ম্যালেরিয়া-বিষবাহী মশকের আবাসভূমি। আরও জানা উচিত যে শিশুদের পক্ষে ম্যালেরিয়া

বিষ বিশেষ মারাত্মক কারণ ঐ বিষ উহাদের শরীরে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পরিব্যাপ্ত হয়। অনেকেরই ধারণা শিশুদের পক্ষে কুইনাইন ক্ষতিকর—তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

ম্যালেরিয়াগ্রস্থা গর্ভিনীর প্রসবের সময় শিক্ষিতা দাই বিশেষ দরকার। কারণ স্বাস্থ্য খারাপ থাকার দরুণ ইঁহারা শীঘ্রই সুতিকা জ্বরে আক্রান্ত হন। গৃহিনীদের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা বেশ করিয়া দেখিয়া লন, ধাইরা যেন প্রসব করানর পূর্ব্বে কারবলিক সাবান দিয়া গরম জলে তাদের হাত ধুইয়া লয়। সম্প্রতি একটী রোগিনীর অবস্থা উল্লেখযোগ্য। এই রোগিনী উপরিউক্ত সামান্য ক্রটীর জন্য অর্থাৎ ধাত্রী হাত না ধুইয়া জরায়ুর মধ্যে হাত দেওয়ায় টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। উহাকে এখানকার সিভিল সার্জ্জন সাহেব ও আমি উভয়েই দেখিয়াছি—পাঁচ পয়সা বাচাইতে গিয়া লক্ষ টাকারও অধিক দামী প্রাণটী খোওয়াইতে হইয়াছে।

শেষে বক্তব্য এই যে যদিও আমরা জানি, দারিদ্র্যই ম্যালেরিয়ার একটী প্রধান কারণ—দরিদ্র হইলেই গর্ভিনার যা দরকার তাহা অপেক্ষা কম খাইতে হয়, উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও বিশ্রামের সুযোগ পায় না এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য পায় না—তবুও গর্ভাবস্থায় কুইনাইন বর্জ্জন, কোষ্ঠবদ্ধ রাখা, যথেষ্ট বিশ্রাম না দেওয়া প্রভৃতি কুসংস্কার ত্যাগ করিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

বদ্ধ জ্বর-বা কুইনাইন আটকানো জ্বর।

লোকের ধারণা যে কুইনাইন খাইলে জ্বর চাপা থাকে। অর্থাৎ কিছুদিন পরে উহা পুনঃ প্রকাশ হয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে আমরা

* প্রশ্ন হইতে পারে—সাবান প্রভৃতির ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল না, তখন লোকে সুস্থ থাকিত কি করিয়া? উত্তর—(১) দেশকালের পরিবর্ত্তনে আমরা সহরবাসী হইয়া পড়িয়াছি। (২) রেল জাহাজের মধ্য দিয়া নানা দেশের ব্যাধি আমাদের দেশে প্রসারলাভ করিতেছে। (৩) সহরের ঘনসন্নিবেশ এবং নাগরিক জীবনের সাধারণ নিয়মাবলীর অনভিজ্ঞতায় মল মূত্র, নিষ্ঠিবনের ইতস্ততঃ বিক্ষেপ—এই তিনটী কারণের অভাবহেতু পূর্ব্বের লোক সবল সুস্থ থাকিত।

প্রায়ই ২।৪ দিন কুইনাইন সেবন করিয়া ছাড়িয়া দিই। আমাদের রক্তে যে বীজাণু থাকে—এক এক শরীরে এক লক্ষ বা ততোধিক; তাহা অল্প পরিমাণ কুইনাইনে মরে না।—ফলে কিছু থাকিয়া যায়। ১০।১৫ দিন পরে উহা বাড়িতে বাড়িতে পূর্ব্ব সংখ্যা প্রাপ্ত হইলেই জ্বর দেখা দেয়। কিছুদিন ধরিয়া কুইনাইন খাইলে উহা হয় না। তবে খারাপ বীজাণু হইলে আলাদা কথা।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেই বাসনাত্রয় অর্থাৎ লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা অবিবেকীদিগের নিকট 'উপাদেয়' বা গ্রহণীয় বলিয়া প্রতীয়মান্ হইলেও, বিবিদিষু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের অন্তরায় বলিয়া এবং বিদ্বান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার বিরোধী বলিয়া বিবেকী ব্যক্তির নিকট হেয়।

এই হেতু স্মৃতিশাস্ত্রে (সূতসংহিতা, যজ্ঞবৈভবখণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধ, ১৪ অধ্যায়)—

লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে ॥*

লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা বশতঃ লোকের যথোপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না।

আর যে দম্ভ দর্প প্রভৃতিরূপ আসুর সম্পদ্‌স্বরূপ মানস বাসনা আছে

---

* টীকা—চৈত্র সংখ্যায় ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাহা নরকের কারণ বলিয়া, তাহার মলিনতা সর্ব্বজনবিদিত। অতএব যে কোন উপায়ে এই চারিপ্রকার বাসনার বিনাশ সম্পাদন করিতে হইবে।

বাসনার বিনাশ সম্পাদন যেরূপ আবশ্যক, মনের বিনাশও সেইরূপ আবশ্যক। বেদমার্গাবলম্বী ব্যক্তিগণ (বৈদান্তিকগণ) তার্কিকদিগের ন্যায় মনকে একটি নিত্য ও অণুপরিমাণ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহা হইলে মনের বিনাশ সম্পাদন দুঃসাধ্য হইত বটে। তবে মন কি প্রকার বস্তু? মন সাবয়ব অনিত্য বস্তু, সর্ব্বদা জতু সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় বহুবিধ পরিণামের যোগ্য। বাজসনেয়িগণ (বৃহদারণ্যক উপনিষদে ১।৫।৩) মনের লক্ষণ ও মনের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ এইরূপে পাঠ করিয়া থাকেন :—

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি র্হ্রী র্ধী-র্ভী-রিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি—

কাম—স্ত্রী প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধাভিলাষ, সঙ্কল্প—ইহা নীল ইহা শুক্ল ইত্যাদি প্রকারের বিশেষ বিশেষ নিশ্চয়, বিচিকিৎসা—সংশয় জ্ঞান, শ্রদ্ধা—অদৃষ্ট বিষয়ে আস্তিক্য বুদ্ধি, অশ্রদ্ধা—তদ্বিপরীতবুদ্ধি, ধৃতিঃ—ধারণ অর্থাৎ দেহাদি অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে উত্তম্ভন করা অর্থাৎ চাগাইয়া তোলা; অধৃতিঃ—তাহার বিপরীত, হ্রীঃ—লজ্জা, ধীঃ—প্রজ্ঞা, ভীঃ—ভয় ইত্যাদি সকল মনই, কেননা, এইগুলি বৃত্তি হইলেও বৃত্তিমান মন হইতে ভিন্ন নহে। ইহা মনের লক্ষণ। ঘটাদি যেরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় সেইরূপ কামাদি বৃত্তি ক্রমে উৎপন্ন হইয়া সাক্ষিপ্রত্যক্ষ হইয়া অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এই সকল বৃত্তির যাহা উপাদান, তাহাই মন, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

"অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শ মন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি" ইতি (বৃহদা ১।৫।৩)

আমি অন্যত্রমনা বা অন্যমনস্ক হইয়া ছিলাম, এইহেতু দেখি নাই আমি অন্যমনস্ক হইয়া ছিলাম অতএব শুনি নাই। যেহেতু লোকে (আত্ম-সাক্ষিক) মনের দ্বারাই দেখিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শ্রবণ করিয়া থাকে। ইহাই মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ চক্ষুর নিকটবর্ত্তী এবং পূর্ণ দৃষ্টির

বিষয়ীভূত ঘট এবং কর্ণের সন্নিকৃষ্ট উচ্চৈঃস্বরে পঠিত বেদ, যে বস্তু সংযোগ না থাকিলে প্রতীত হয় না এবং যাহার সংযোগ থাকিলে প্রতীত হয়, সর্ব্ববিধ উপলব্ধির সাধারণ কারণ বলিয়া সেইরূপ একটি পদার্থ মন—অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। "তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি"—(বৃহদা ১।৫।৩)

মন বলিয়া একটি বস্তু আছে বলিয়াছি, কাহাকেও তাহার চক্ষুর অগোচরে স্পর্শ করিলে সে মনের দ্বারা জানিতে পারে।—ইহা (উক্ত শ্রুতিবাক্যের) এক উদাহরণ। যেহেতু (শ্রুত্যুক্ত) লক্ষণ ও প্রমাণ দ্বারা মন বলিয়া একটি বস্তু আছে ইহা সিদ্ধ হইল, সেই হেতু তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে এইরূপে উদাহরণ দিলেই হইবে। দেবদত্তকে কেহ পৃষ্ঠভাগে (অর্থাৎ তাহার দৃষ্টির অগোচরে) স্পর্শ করিলে দেবদত্ত বিশেষরূপে জানিতে পারে—ইহা হস্তস্পর্শ, ইহা অঙ্গুলিস্পর্শ ইত্যাদি। যেহেতু সেস্থলে দৃষ্টি চলে না (অর্থাৎ চক্ষু হস্তস্পর্শ দেখিতে পায় না) এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের সামর্থ্য কেবল মৃদুতা ও কঠিনতা উপলব্ধি করা পর্য্যন্ত (তদধিক আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না), সেইহেতু পারিশিষ্যের নিয়ম দ্বারা (Law of Elimination) ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মন বলিয়া সেই বস্তুটিই সেই হস্তস্পর্শ অঙ্গুলিস্পর্শ-রূপ বিশেষ জ্ঞানের কারণ। মনন করে বলিয়া তাহাকে মন এবং চিন্তন * করে বলিয়া তাহাকে চিত্ত বলে। সেই চিত্ত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণময়, কেননা, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ যাহারা যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য তাহারা সেইমনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকাশ প্রভৃতি যে (সত্ত্বাদি) গুণের কার্য্য তাহা ভগবদ্গীতার (চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ২২শ্লোকে) গুণাতীত লক্ষণ হইতে জানা যায়। কেন না—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।"

সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ। রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের কার্য্য মোহ হে অর্জ্জুন, ইত্যাদি।

---

* চিন্তন শব্দে অনুসন্ধান, প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতি ও অনুভববৃত্তি বুঝাইতে পারে।

সাংখ্যশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে--

প্রকাশ প্রবৃত্তিমোহা নিয়মার্থাঃ ।*　সাংখ্যকারিকা (১২,)

সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, রজোগুণ দুঃখস্বরূপ এবং তমোগুণ মোহস্বরূপ। সত্ত্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজোগুণের প্রয়োজন প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের প্রয়োজন নিয়মন, নিরোধ বা অনিয়ত গতির প্রতিরোধ।

এস্থলে প্রকাশ শব্দের অর্থ শুভ্রোজ্জ্বল রূপ নহে কিন্তু জ্ঞান ; কেননা, ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে—

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসোলোভ এবচ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেবচ ॥ (গীতা—১৪।১৭)

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে, আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ মোহ এবং অজ্ঞান জন্মে।

জ্ঞানের ন্যায় সুখও সত্ত্বগুণের কার্য্য--তাহাও কথিত হইয়াছে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মনি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ (গীতা—১৪।৯)

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখের সহিত সংশ্লেষিত করে— অর্থাৎ, দুঃখ শোকাদির কারণ উপস্থিত থাকিলেও দেহীকে সুখাভিমুখ করে। রজোগুণ, সুখাদির কারণ উপস্থিত থাকিলেও দেহীকে কর্ম্মের সহিত যোজিত করে, এবং তমোগুণ, মহতের সঙ্গ হইতে সঞ্জাত জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের উপদেশ সম্বন্ধে অনবধানতায় যোজিত করে এবং আলস্যাদিতেও সংযোজিত করে।

উক্ত গুণত্রয় সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে ; তন্মধ্যে কোন সময়ে কোনটি প্রবল হয় এবং অপর দুইটি তদ্দ্বারা অভিভূত হয়। তাহাই গীতায় (১৪।১০) কথিত হইয়াছে :—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বংরজস্তথা ॥

হে ভারত, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব যেমন প্রবল

* সাংখ্যকারিকার পাঠ (১২ সংখ্যক)। কিন্তু—প্রীত্যপ্রীতিবিষয়াত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ। তদনুসারেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

হয়, তেমনি আবার রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে।

"বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে *"

সাগরের তরঙ্গসমূহ যেমন পরস্পর বাধ্যবাধকভাবাপন্ন, গুণত্রয়ও সেইরূপ, অর্থাৎ "ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের আবির্ভাবের হেতু, পরস্পরই পরস্পরের নিত্যসঙ্গী" †।

তন্মধ্যে তমোগুণের উদ্ভব বা প্রাবল্য হইলে আসুর সম্পদের উদয় হয়; রজোগুণের উদ্ভব হইলে লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা এই বাসনাত্রয় উদিত হয়, সত্ত্বগুণের প্রবলতা হইলে দৈবীসম্পৎ উৎপন্ন হয়। এই অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ইতি (গীতা ১৪।১১)

এই ভোগায়তন শরীরে শ্রোত্রাদি সমুদয় বাহেন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে যখন শব্দাদি নিজ নিজ বিষয়ের আবরণ-বিরোধী পরিণামবিশেষ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন, এবং (সময়ান্তরে সুখাদি চিহ্নের দ্বারাও) বুঝিতে হইবে যে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে।

যদিও অন্তঃকরণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণের দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি সত্ত্বগুণই মনের মুখ্য উপাদানকারণ। আর রজঃ ও তমঃ এই দুইটি গুণ সেই সত্ত্বগুণের উপষ্টম্ভক। যে উপকরণ উপাদানের সহকারীরূপে থাকে তাহাকে উপষ্টম্ভক বলে ‡।

---

* অচ্যুতরায় বলেন, এই শ্লোকার্দ্ধ "বৃহদ্ বাশিষ্ঠ বচন", কিন্তু বাশিষ্ঠ রামায়ণে এই বচনটি এযাবৎ আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

† "অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ"—সাংখ্যকারিকা, ১২,।

‡ গ্রন্থকার সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংখ্যাকারিকা হইতে এই উপষ্টম্ভক শব্দটি সংগ্রহ করিয়াছেন, তথায় আছে—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ"—ইহা এইরূপে বুঝান হইয়াছে—

এই হেতু যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানীর রজঃ তমোগুণ অপনীত হইলে মনের স্বভাবগত সত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে। ইহাই বুঝাইবার জন্য কথিত হইয়াছে—

"জ্ঞস্য চিত্তমচিত্তং স্যাজ্‌জ্ঞচিত্তং সত্ত্বমুচ্যতে"—জ্ঞানীর চিত্ত চিত্তই নহে, জ্ঞানীর চিত্তকে সত্ত্ব বলে এবং সেই সত্ত্বগুণ চাঞ্চল্যের হেতু যে রজোগুণ, তদ্বর্জ্জিত হওয়াতে, (সর্ব্বদাই) একাগ্র এবং যে তমোগুণ ভ্রান্তিকল্পিত অনাত্মস্বরূপ স্থূল পদার্থাকারের হেতু তাহা তাহাতে না থাকাতে সেই সত্ত্ব সূক্ষ্ম। এই হেতু সেই সত্ত্বগুণ আত্মদর্শনের যোগ্য।

"সত্ত্ব লঘুতাপ্রযুক্ত কার্য্যতৎপরতাযুক্ত হইলেও, স্বয়ং ক্রিয়াহীন, যেমন বড় বড় এঞ্জিন, চালাইয়া দেও খুব চলিবে, কিন্তু না চালাইলে একেবারে জড়। রজোগুণ স্বয়ং ক্রিয়াশীল এবং প্রবর্ত্তক অর্থাৎ চালক, রজোগুণের চালনে সত্ত্বগুণ পরিচালিত হয়, তখন তাহার কার্য্যতৎপরতা প্রকাশ পায়। কিন্তু এই দুইগুণ জগতে শৃঙ্খলা রাখিতে অসমর্থ,—ক্রিয়াশীল চালক রজোগুণ এবং কার্য্যতৎপর সত্ত্বগুণ উভয়ে মিলিত হইলে সত্ত্বগুণের সকল কার্য্য একেবারেই হইয়া পড়িতে পারে। মনে কর— অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন সত্ত্বগুণের কার্য্য, কিন্তু এই ঊর্দ্ধজ্বলনের সীমা হয় কেন? দুই হাত দশ হাত পর্য্যন্ত অগ্নি শিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। কিন্তু অনন্ত আকাশের উন্মুক্তমার্গে অসীম ঊর্দ্ধজ্বলন না হয় কেন? এরূপ না হওয়ার জন্যই তমোগুণের প্রয়োজন, গুরুত্বযুক্ত তমোগুণ ঐ দুইগুণের কার্য্যকে নিয়মিত করে। গুরুত্ব কার্য্যতৎপরতার প্রতিবন্ধক, ঊর্দ্ধগমনের প্রতিবন্ধক। তমোগুণের বাধা বশতঃই ঊর্দ্ধজ্বলন অসীম হয় নাই। সত্ত্বরজগুণের সকল কার্য্য সম্বন্ধেই তমোগুণের এইরূপ বাধা আছে জানিবে। সত্ত্ব বা রজঃ প্রবল হইলে তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্যই কতকটা ঊর্দ্ধজ্বলন হয়, নতুবা তাহাও হইত না। এদিকে নিষ্ক্রিয় তমোগুণের কার্য্য হইবার পূর্ব্বে রজোগুণ তাহার সহায় হয়। রজোগুণ দ্বারা চালিত হইয়াই তমোগুণ স্বকার্য্যসাধনে সক্ষম হয়"—পঞ্চাননতর্করত্ন সম্পাদিত সাংখ্য দর্শন, ১০২ পৃষ্ঠা।

গোকুল তনয়া দেবী ঠাকুরানু দাসী।*

(শ্রীম—)

কে গো সতি! কাঁদিছ নীরবে
　　লয়ে শিশুপুত্র শ্রীমধুসূদন!
ক্রন্দনের রোল চারিদিকে হায়
　　উঠিছে, কাঁদে তব পুত্র কন্যাগণ,
পিতৃহারা আজ তারা, না মানে প্রবোধ।
　　শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরঙ্গ, কর্ণপুর পিতা—
সাধু-শিবানন্দ-কুলোদ্ভবা,
　　স্নেহময়ী মাতা তব
গোকুল-গৃহিনী সতি,
　　কাঞ্চন পল্লীর গঙ্গাকূলে অনুমৃতা—
যবে ভ্রাতা তব শ্রীগুরু প্রসাদ
　　কর্ম্মস্থলে প্রবাসে পিতার
ঈশ্বর-প্রাপ্তি আনিল বারতা।
　　হায়! স্মরিয়া সে সব বিবরণ
অনুরূপা কন্যা তুমি দেবি,
　　তাই কি ভাবিছ বারবার
পতি-সহ-মরণের কথা।
ভাবিছ কি (আর) স্নেহময় শ্রীগোকুলচন্দ্র
সহমৃতা পতি, পিতা তব যিনি,
প্রেমে মাতুয়ারা ভাই রামপ্রসাদ মুখে,
কভু তব সঙ্গে—বালিকা তখন তুমি,

---

* প্রাপ্তি অনুমান, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ। ৺মধুর জন্ম ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মাতুলালয় কাঞ্চন পল্লীতে।—কথামৃতের লেখক।

কভু শুনিতেন কীর্ত্তনের মধুর লহরী,
যাহে, ব্রহ্মময়ী শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী
প্রত্যক্ষা হ'তেন ভক্ত হৃদি পদ্মাসনে।
কেঁদো না কেঁদো না সতি,
অতি সুকুমার তব মধু,
আর কিছুদিন তারে করহ পালন।
হে সাধ্বি। রামকুমার ঘরণি,—
ভয় নাই—তব গুণে আজ
অমৃতের অধিকারী পতি তব।
এবে নারায়ণরূপে সেবো গো তনয়ে
গৌরীভাবে পালহ তনয়া।
প্রসাদ ব্রহ্মময়ী সুত, স্নেহ দৃষ্টি তাঁর
পড়েছে শৈশবকালে তোমার উপর,
তবে কেন সতি ত্যজিবে এ দেহ
সাধনের জন্য যাহা পেয়েছ ধরায়!
দুর্লভ এ মনুষ্যজনম—
অনিত্য জানিয়া এ সংসার
লহ ব্রহ্মচারিনীর ব্রত সনাতন,
পতি তব শ্রীপতির ছায়ারূপ
ভজ শ্রীপতিরে যতদিন রহে প্রাণ
যাঁর তরে মাতৃভাবে করেন প্রসাদ।
পরম পবিত্র বংশ— বংশধরগণ *
তব করিবে দর্শন রাতুলচরণ
শ্রীনাথের, যখন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে
ধরাধামে আসিবেন নারায়ণ
জগন্মাতা শক্তি সঙ্গে মা আমার,

* গুরু প্রসাদের প্রপৌত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত ৺রাধানাথ রায় প্রভৃতি।

ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে—
দুরিতে জীবের দুঃখ।
সার্থক হইবে তব প্রত্যহ অর্চ্চনা
মহাদেবী জগজ্জননীরে,
যবে অপরাহ্নে গৃহকার্য্য সব সারিবার পরে,
স্নান করি পবিত্র জাহ্নবী জলে তুমি,
পূতবারি-পূর্ণ-কুম্ভ-কক্ষে,
বাটী ফিরিবার পথে,
অষ্টধাতু মাতা জগদ্ধাত্রীর মন্দিরে
নীরবে পূজিতে মার অভয়চরণ,
প্রেম ভক্তিভরে জপিতে মায়ের নাম।
হে দেবি! তব বংশে হবে শ্রীহরি দর্শন।
ধন্য পুত্র তব শ্রীমধুসূদন, *
হৃদয়ে যাহার প্রবাহিবে ইষ্ট ধ্যান,
হাস্যমুখ, বাল্যভাব, মুখে দুর্গা নাম,
আসিবেন পুত্রবধূ লক্ষ্মী স্বরূপিনী
বিদ্যারূপা সরলা মাতা স্নেহের পুত্তলী,
সর্ব্বংসহা জন্মিবে নন্দন শ্রীরামকৃষ্ণ দাস—
তস্য-অনুদাস,
সার্থক জনম যার হবে
করিয়া শ্রীহরি পাদপদ্ম-দরশন।

---

* ভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন, সম্পর্কে গোকুলের পিসাতো ভাই তখন কাঞ্চন পল্লীগ্রামে (কাঁচড়া পাড়ায়) ছিলেন, পরে হালিসহরে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন।

নবীনের কথা।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

তর্কে বহুদূর—তত্রাচ তর্ক করিতে হয়। তরুণ মনের নবজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা ক্ষুধিতশার্দ্দুলের মত জীবন ও জগতের রহস্য চিরিয়া চিরিয়া দেখিতে চাহে, উপলব্ধি করিতে চাহে। জানিতে চাহে কোন্ সার্ব্বজনীন আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মানুষ তাহার ধর্ম্ম-নীতি সমাজ-নীতি গড়িয়াছে। মানুষের সমষ্টিহিসাবেই হউক আর ব্যষ্টিহিসাবেই হউক—প্রত্যেকটী কার্য্য ও চিন্তা আদর্শের অনুকূল-ভাবে ব্যক্ত হইতেছে কি না? যদি ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধ ও প্রতিবিধান কল্পে কোন্ পন্থায় অগ্রসর হইলে সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। এই স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম ইচ্ছা শক্তিকে প্রাচীনপন্থিগণ অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়া অনেক সময় করুণা বিমিশ্র ধিক্কার প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে খেলার তাসের মত মানুষ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে একই নিয়মে কতকগুলি নিয়ম ও অনুষ্ঠানের ছায়ানুবর্ত্তন করিবে—প্রশ্ন করিবে না, বিচার করিবে না। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য বা সত্যযুগ (তাঁহাদের বর্ণিত) নামিয়া আসিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেরূপ হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না বরং ইহাই দেখা যায়—ভালমন্দ বিচারের প্রাচীন মাপকাঠিটার প্রতি আমরা ক্রমেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠিতেছি। ইহাতে প্রাচীন ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূকুটী প্রদর্শন করেন, নবীন বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখনই তর্ক উঠে। যুক্তি ফুরাইয়া আসিলেও প্রাচীন পশ্চাৎপদ হন না। বিশ্বাসের পুরাতন ঝুলিটা বাহির করিয়া একেবারে বিশকোটী মানুষকে তাহার মধ্যে পুরিবার বন্দোবস্ত করেন। এই ঝুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে আপত্তি প্রকাশ করার অর্থ—নাস্তিক, শাস্ত্রে অবিশ্বাসী ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাচীনের মতে, জীবনে কোন সমস্যাই আর আসিতে পারে না; সব 'জলবৎ তরলং' রূপে প্রাচীন কালেরই মীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে। কতযুগ যুগান্তর গভীর গবেষণার ফলে যে নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি তাঁহারা গড়িয়া তুলিযাছেন—মানুষের পক্ষে উহাই যথেষ্ট, সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিযা কি বলিতে হইবে কাঁহাদের প্রণাম করিতে হইবে, কোন্ পা অগ্রে মৃত্তিকায় স্থাপন করিতে হইবে—এইরূপে শৌচ, স্নান, আহার ইত্যাদি বাঁধা নিয়ম রহিয়াছে। এগুলি ঠিক ঠিক পালন করিয়া গেলেই হইল আবার সমস্যা কি?

দুঃখের বিষয় তবুও তর্ক উঠে। নবীন বলেন, সমগ্র জাতিটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমভাবে ঐরূপ জীবন বংশপরম্পরা যাপন করিযাছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, তবে যদি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বুকে পাষাণ, পিঠে গণ্ডারের চর্ম্ম বাঁধিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক খুঁটিনাটী মানিয়া চলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও মানব জাতির ইতিহাসে সেটা খুব বড় কথা নয়। মানুষের মধ্যে রুচির বৈচিত্র্য ও মতের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশেই বর্ত্তমান ছিল, আছে ও থাকিবে। কতকগুলি সার্ব্বজনীন স্বার্থের খাতিরে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক জীবন বহুদিন হইল যাপন করিতেছে সত্য কিন্তু বহুবর্ষেও চিন্তায় ও কর্ম্মে মানুষ সকলেই সমান হইয়া উঠিতে পারে নাই হইবেও না। তাই একটানা আদর্শে মানবজাতি চলিতে পারে না। যুগে যুগে জাতীয় স্বার্থ ও আদর্শ কত বিচিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈদিক যুগের সমাজ যে সমস্ত নিয়মে শাসিত হইত তাহার কতকগুলি আধুনিক মানব বর্ব্বরতা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে—গ্রহণ করিতেও রাজী নহে। এই নবযুগের অতীতপ্রায় প্রথম প্রচারেই সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে ইহার পরিণাম সম্বন্ধে প্রাচীনের যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও তরুণের নাই। সে দেখিতেছে এই ক্ষুদ্র জাতিগুলি যদি অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবী সমাজ বিপ্লবে বাঙ্গালীর জাতীয় সভ্যতা বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

বড় বড় সমস্যা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে দেখা দিয়াছিল, বাঙ্গালী

তাহার মীমাংসাও করিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নহে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচণ্ড বন্যা ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের উপপ্লাবনে যখন বাঙ্গালী সমাজ থর থর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল তখন অসাধারণ মনীষী রঘুনন্দন দণ্ডায়মান হইয়া সে সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। প্রাচীন স্মৃতির ব্যবস্থা কতক গ্রহণ কতক পরিহার করিয়া তিনি নব্যস্মৃতি প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধান দেওয়াটাই বড় কথা নয়, কেমন করিয়া সে বিধান সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটা মাথা পাতিয়া লইয়াছিল সেইটাই আজকার দিনে বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয়।

তর্ক ছাড়িয়া বিশ্বাস করিলেই যদি মিলিবার অধিক সুবিধা হয় তাহা হইলে এ ঘটনা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি কি? একবার বাঙ্গালী যে উপায়ে সমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল সেই উপায়েই বর্ত্তমান সঙ্কটের মীমাংসা করিতে হইবে, ইহাই নবীনের নিবেদন। নবীন প্রাচীনকে ত্যাগও করিতে চাহে না অস্বীকারও করে না বরং প্রাচীন যদি অগ্রসর হন তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞতার সহিত পশ্চাতে চলিতে রাজী আছে। কিন্তু প্রাচীন যদি নিশ্চিন্তে অচল হইয়াই থাকেন মনুষ্যত্বের বিনিময়ে প্রাচীন তত্ত্বটাকেই সকলের চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া শ্রদ্ধা সম্মানের দাবী করেন তাহা হইলে নিরুপায় নবীন তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিবেই। প্রাচীন তাহাকে উদ্ধত আত্মাভিমানী বলিতে পারেন কিন্তু তিনি একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবেন *এ যুগ প্রয়োজনের তাড়না• ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল নহে।*

ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল বলিয়াই আজ অতি বড় মহামহোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও সদুপদেশ জাতি মানিয়া লইতে চায় না। সে পাণ্ডিত্য চায় না, যুক্তি বিচার চায় না, শাস্ত্রের গূঢ়ার্থের মীমাংসা সে প্রচুর শুনিয়াছে—সে চায় তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন! সে চায় মানুষ ও মনুষ্যত্ব।

অবিচারে অত্যাচারে তাই আজ বাঙ্গালার বাঞ্ছিত গণবিগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছেন। মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল মন্দিরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবীন পূজারী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত!" যদি পার তবে এসো প্রাচীন তুমিও

এসো, ভক্তি বিনম্র চিত্তে—অর্ঘ্য হস্তে লইয়া—জাতি তোমাদিগকে মাথায় তুলিয়া লইবে। যদি না পার তবে অনর্থক কূটতর্ক তুলিয়া এ মহাপূজায় বিঘ্ন ঘটাইও না। একজনের কাজ আজ দশজন করিবে, দশজনের দায় একজন মাথা পাতিয়া লইবে—এ মহাব্রতে যে আসিবে সেই ধন্য, সে যে ভগবানের ডাক শুনিয়াছে। ভগবান যাহাদিগকে ডাক দিয়াছেন তাহারা বাঁধন ছিঁড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবেই—হে প্রাচীন এ দুর্নিবার গতিরোধ করা তোমার অসাধ্য। বহুদিন পর বাঙ্গালী আজ একটা আদর্শের সন্ধান পাইয়াছে। এই আদর্শকে জাতীয় জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইলে যে শক্তি যে অধ্যবসায় যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, নবীন তাহা বুঝিয়া লইতে চায়। যদি শক্তি সামর্থ্যে কুলায় তাহা হইলে সে অগ্রই কর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইবে। না কুলাইলে নীরবে শক্তি সাধনা করিবে। আত্ম দৌর্ব্বল্যের উপর দম্ভের গিলটী করিয়া সে আর আদর্শকে ব্যঙ্গ করিবে না। সে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে পরমুখাপেক্ষী হইবার জন্য নহে, সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ কৌশলে কার্য্যকে অধিকতর তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য।

হাসিও না প্রাচীন—এ ক্ষণিকের খেলা নহে। নবীন জানে যে গুরুদায়ীত্ব ভার সে স্কন্ধে লইয়া মরণের মধ্যদিয়া অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছে। জাতি নষ্ট হইবার আশঙ্কায় প্রাচীন বিধান দিতেছেন সমুদ্র যাত্রা নিষেধ। নবীন জাতিকে রক্ষা করিবার জন্যই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া বৃহস্পতিপুত্র কচের মত দৈত্যপুরে যাইতেছে, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার জন্য। কোমরে ছেঁড়া নেকড়া জড়াইয়া শূন্য উদরে সে আর সনাতন আচার নিয়মের বড়াই করিতে চায় না। সে, শক্তিমান পুরুষ সিংহের মত পর্য্যাপ্ত ভোগাযোজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া বসিতে চায়। "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।" নবীন জানে যে তাহার অব্যাহত নিষ্ঠাকে তর্কে নহে কার্য্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। নব জীবন বিকাশের গভীর আনন্দে সে সবখানা বাঙ্গালাকে বুকদিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য সেবা উন্মুখ বরবাহু বিস্তার করিয়াছে।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

এরিষ্টটল।

(গ্রীকদর্শন)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা দেখিয়াছি একটী হেতু বাক্যের (middle term) সাহায্যে অনুমান কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, নিগমনমূলক যুক্তিপ্রণালীর (Deductive method) হেতু-বাক্যটীই অবলম্বন স্বরূপ। এই হেতু-বাক্যের সহিত অন্য অবয়বের মোটামুটী তিন রকমের সম্বন্ধ হইতে পারে উদাহরণ সাহায্যে সেইটী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

১। মানুষ মর, রাম মানুষ, সুতরাং রাম মর, এস্থলে দেখা যাইতেছে "মানুষ" "রাম" অপেক্ষা অধিক ব্যাপক এবং 'মর' অপেক্ষা কম ব্যাপক অর্থাৎ হেতু-বাক্য (middle term) 'মানুষ' মধ্যস্থানীয়।

২। বিনয় একটী সদ্‌গুণ, ভীরুতা একটী সদ্‌গুণ নয়, সুতরাং ভীরুতা ও বিনয় একই নয়—এস্থলে হেতুবাক্য "সদ্‌গুণ" "বিনয়" ও "ভীরুতা" অপেক্ষা ব্যাপকতর অর্থাৎ হেতুবাক্য সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক।

৩। স্বর্ণ উজ্জ্বল, স্বর্ণ ধাতু, সুতরাং কোন কোন ধাতু উজ্জ্বল। এস্থলে হেতুবাক্য "স্বর্ণ" "উজ্জ্বল" ও "ধাতু" উভয়—পদার্থ অপেক্ষা অব্যাপক অর্থাৎ হেতু বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা অব্যাপক। এরিষ্টটল বলেন প্রথম প্রণালীই একমাত্র বিশুদ্ধ ব্যাপক-বাক্যে (Universal proposition) সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ। দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বনে কেবলমাত্র ব্যতিরেক (Negative) সিদ্ধান্ত করা চলে—যেহেতু বিনয় একটী সদ্‌গুণ, ভীরুতা একটী সদ্‌গুণ, এই দুই বাক্য হইতে অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

তৃতীয় প্রণালী অবলম্বনে কেবলমাত্র অব্যাপক (Particular) সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে প্রথম প্রণালীই আমাদের অবলম্বনীয়।

এই তিনটী উপায় অবলম্বনে যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু প্রথমটী একমাত্র Universal Proposition বা ব্যাপক বাক্য সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম। এরিষ্টটল বলেন কোন সিদ্ধান্ত সৎ কিনা সেটী পরীক্ষা করিতে হইলে যুক্তি প্রণালীর অবয়ব অর্থাৎ সাধ্যাবয়ব, পক্ষাবয়ব দুটীকে প্রথম প্রণালীর সাধ্যাবয়ব ও পক্ষাবয়বের আকারে আনয়ন করিতে হইবে এবং প্রথম প্রণালী অবলম্বনে সেইটীর সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইবে। আবর্ত্তন অবলম্বনে অন্য প্রণালীর অন্তর্গত বাক্যগুলিকে প্রথম প্রণালীর অন্তগত করা যাইতে পারে। কিম্বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রণালী অবলম্বনে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি সেইটীর বিপরীত সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রথম বাক্য বা সাধ্যাবয়বের বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, ইহা দেখাইতে হইবে। মনে কর সকল ক হয় খ, সকল ক হয় গ, সুতবাং কতক্ খ হয় গ, কথ যদি কতক্ খ, গ না হয়, তবে কোন খ, গ নয়। এখন দাঁড়াইল কোন খ, গ নয়, সকল ক হয় খ, সুতবাং কোন ক, গ নয়—কিন্তু এটী হইতেই পারে না কারণ সকল ক হয় গ, এইটী গোড়ায় আছে।

ন্যায় শাস্ত্র কেবলমাত্র নিগমনমূলক যুক্তি প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না—ব্যক্তি নিরূপণ প্রণালী Inductive method ইহার অপরতম আলোচ্য বিষয়। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি—নিগমনমূলক যুক্তি প্রণালী Deductive method অবলম্বনে একটী ব্যাপক বাক্য হইতে অব্যাপক বাক্যের সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। ব্যক্তি নিরূপণ প্রণালী অবলম্বনে আমরা অব্যাপক বাক্য হইতে ব্যাপকতর বাক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হই। বিশেষ বিশেষ পদার্থের মধ্যে সাধারণ সত্তা কি? সাধারণ কোন নিয়মের তাহারা অধীন কি না, তাহাদের সাধারণ গুণ কি? ইত্যাদি আলোচনাই ইহার উদ্দেশ্য। এরিষ্টটল এই Inductive method বা ব্যক্তি নিরূপণ প্রণালীর সবিশেষ পরিচয় দেন নাই, তবে তিনি বলেন পর্য্যাবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা এই ব্যাপ্তি নির্ণয় সম্ভব এবং সহ পরিবর্ত্তন প্রণালী Method of concometant variation কে এই ব্যাপ্তি নির্ণয়ের একটী প্রকৃষ্ট পন্থা

বলিয়া উল্লেখ করেন। এই বিষয়ে আব একটী কথা মনে রাখিতে হইবে —এই ব্যাপ্তি নিরূপন ব্যাপারটী প্রত্যক্ষ অনুভূতিব উপর নির্ভর করে।

অব্যক্তন্যায় (Enthymeme) ও উদাহবণ Examples বস্তুতঃ Deductive method নিগমন মূলক অনুমান প্রণালী বা Inductive method ব্যাপ্তি নিরূপন প্রণালীব অন্তর্ভূত। অব্যক্ত ন্যায় ন্যায় অবয়বের কোন একটী অবয়ব উহ্য বা অব্যক্ত থাকে এবং উদাহরণ সাহায্যে কোন একটী বিশেষ বাক্য হইতে অপব একটী বিশেষ বাক্যেব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মানুস মব, সুতরাং রাম ও মবিবে, ইহা অব্যক্ত ন্যায়ের একটী দৃষ্টান্ত এখানে রাম ও মানুষ, এই পক্ষ অব্যক্ত আছে।

থিবিস (Thebes) এবং ফেসিস (Phocis) প্রতিবেশী বিষয়ে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ অশুভ সুতরাং এথেন্স (Athens) ও থিবিসের (Thebes) মধ্যে যুদ্ধ ও অশুভ জনক হইবে যেহেতু তাহাবাও প্রতিবেশী। ইহা (Aristotle) এরিষ্টটল মতে (Examples) উদাহরণের দৃষ্টান্ত বিশেষ। তিনি বলেন প্রথম দৃষ্টান্ত হইতে আমরা ধরিয়া লই—প্রতিবেশীর মধ্যে যুদ্ধ মাত্রেই অশুভ জনক।

বুঝা গেল আমবা যাহা কিছু জানি বা সিদ্ধান্ত করি তৎ সমস্তই পূর্ব্বোক্ত দুই প্রণালী অবলম্বনে হইয়া থাকে। কোন প্রণালী অবলম্বনে আমাদের কি জ্ঞান লাভ হয় সেটী বিচার করিলে দেখা যায়, কারণ দেখিয়া কার্য্য অনুমান করাই Deductive method বা নিগমন মূলক যুক্তি প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। এবং কার্য্য দেখিয়া কারণ অন্বেষণ করাই Inductive method ব্যাপ্তি নিরূপণ প্রণালীর উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ কার্য্য ছাড়িয়া কারণ নাই, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য ঘটিতে পারে না সুতরাং একই পদার্থকে দুইদিক হইতে দেখা যায় এবং এই দুইটী প্রণালীই সেই উদ্দেশ্য সাধন করে।

এইস্থলে প্রমান (Proof) বলিতে এরিষ্টটল কি বুঝাইয়াছেন দেখা যাউক। ব্যাপক বাক্য হইতে অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক বাক্য অনুমান করায় কোন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

মানুষ মাত্রেই মর এই ব্যাপক বাক্য জানা থাকিলে যদুও মর এই সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ হইবেই হইবে, যেহেতু মানুষ এমন একটি ব্যাপক বাক্য যাহার মধ্যে যদুকে অবশ্য থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে অব্যাপক বাক্য হইতে ব্যাপক বাক্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটি তত সহজ নহে। যেখানে যেখানে ধূম সেইখানে সেইখানে বহ্নি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম ধূম থাকিলেই বহ্নি আছে। বিশেষ বিশেষ স্থলে যাহা দেখি সেটী অব্যাপক বাক্যের অন্তর্গত তাহা হইতে ব্যাপক বাক্য সিদ্ধান্ত করিলাম। কিন্তু সদ্য নির্ব্বাপিত বহ্নি হইতে ধূম উদ্গীরণ দেখিয়া অথবা পর্ব্বতের সানুদেশে বহ্নি থাকায় পর্ব্বতের চূড়ায় ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া তত্তৎস্থলে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা ভ্রান্ত হইবে। তাই এরিষ্টটল বলেন অনুমান বা নিগমন মূলক যুক্তি প্রণালী Deductive method অবলম্বনে যাহা সিদ্ধান্ত হয় তাহাই প্রমাণিত (Proved) হইয়াছে বলা হয়। এই প্রণালীই মূলে অর্থাৎ প্রথম পক্ষ বা সাধ্যাবয়বের (major premise) সত্যতা প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয় হওয়াচাই—সে কথা মনে রাখা দরকার। প্লেটোর ভাব পদার্থের সেই মূল প্রতিজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাব পদার্থ বলিতে কি বুঝায় সে কথার পুনরুল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন তবে সেটী যে একটা সাধারণ গুণ "Common quality" বা abstraction নয় এটী ভুলিলে চলিবে না। আর এক কথা যদু মরে, এ কথা বলি কেন? না মানুষ মাত্রেই মরে বলিয়া। অন্য কথায় ব্যাপক পদার্থই কারণ (Cause) আবার এই কারণকে জানিলেই ন্যায়াবয়বের জন্য-বাক্য বা হেতু-বাক্য (Middle term) ও জানা হয়। মানুষ মর, যদু মানুষ, সুতরাং যদু মর।

এই অনুমানের প্রথম বাক্য অর্থাৎ সাধ্যাবয়ব মানুষ মর এইটী জানা থাকিলেই যদু মর, সিদ্ধান্ত করা যায় কারণ হেতু বাক্য যদু মানুষ, এইটী প্রথমটীর অন্তর্ভূত।

সাধারণতঃ দেখা যায় কোন বাক্য একটা বিশেষ্য এবং বিশেষণের পরিচয় দেয়। একটীকে আমাদের ন্যায়ের ভাষায় দ্রব্য ও অপরটী গুণ

আখ্যা দেওয়া চলে। অপব দার্শনিক ভাষায় একটীকে বস্তু অপরটীকে শক্তি বলা হয়। এবিষ্টটলেব মতে বস্তুব সহিত তৎ শক্তিব যথার্থ সম্বন্ধ বা কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় ন্যায় শাস্ত্রেব প্রধান আলোচ্য বিষয়—একমাত্র আলোচ্য বিষয় বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

প্রত্যক্ষ অনুভবে আমবা ব্যষ্টির পবিচয় পাই জাগতিক ব্যাপারকে খণ্ড খণ্ড কবিয়া দেখি। বিজ্ঞানের কার্য্য এই ব্যষ্টিব মূলে যে সমষ্টি আছে, এই বহুব অন্তবালে যে এক বর্ত্তমান, বহু যে একেবই প্রকাশ বা বিকাশ মাত্র সেই এক বা মূলকাবণেব অনুসন্ধান কবা। এই মূল কাবণেব অন্বেষণ কবা ব্যাপাবটী ন্যাযেব ভাষায় নিগমন মূলক যুক্তি প্রণালীর হেতু বাক্য নিরূপন রূপ কার্য্যটীব সহিত অভিন্ন মনে কবা চলিতে পারে। মানুষ মব, এই বাক্যটি সিদ্ধান্ত কবিতে হইলে মবত্ব "মানুষ" এব বিশেষ ধর্ম্মই ইহাই প্রমান কবিতে হইবে। ইহাই ন্যাযেব প্রতিপাদ্য সংজ্ঞা নির্দ্ধাবণ। Definition বলিতে কি বুঝি সে কথা সক্রেটীস প্রথম ব্যক্ত কবিযা যান। তাঁবমতে সত্যজ্ঞান লাভেব ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিপূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইযাছে তাহা হইতে বুঝা যায এবিষ্টটলও তাহাই বলিতে চান। যুক্তি প্রণালীব উদ্দেশ্য কি? বিজ্ঞানেব প্রয়োজন কেন? এই সকল কথা বিচাব কবিলে বেশ বুঝা যায় সক্রেটীস যে পন্থা নির্দ্দেশ কবিযা যান এবিষ্টটল সেইটীকে প্রণালীবদ্ধ ন্যাযাবয়বেব আকারে (syllogism) গঠিত কবিতেই প্রয়াস পাইয়াছিলেন।—কোন পদার্থের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কবিতে হইলে সেই পদার্থেব বাস্তবিক স্বরূপ পবিচয় জানিতে হইবে। কোন পদার্থকে সাধাবণ ভাবে বুঝা এক কথা এবং বিজ্ঞানেব চক্ষে দেখা অন্য কথা। সাধাবণের জন্য পদার্থেব সাধারণ ভাবকে বুঝাইবাব প্রয়োজনীয়তা আছে সুতবাং এবিষ্টটল সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ব্যাপার বলিতে কেবল মাত্র স্বরূপ পবিচয়েব কথাই বুঝান নাই, অবশ্য সেটী যে মূল উদ্দেশ্য নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। আব এক কথা সাধারণ লোকের যে সকল ধারণা (Opinion) আছে সেইগুলিকে পরিশুদ্ধ কবিয়া লইয়াই সত্যজ্ঞান (Truth) লাভ হইযা থাকে; সুতরাং প্রথমে ধারণার পরিচয় আবশ্যক। এস্থলে একটী

কথা মনে রাখিতে হইবে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ব্যাপাবটী Abstraction মাত্র নহে।

এরিষ্টটল বিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিযাছিলেন সেই কথার আলোচনায় অতঃপব অগ্রসর হওয়া যাউক। রাম বা মনুষ্য বলিতে কি বুঝি সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। রাম বলিতে কোন একটী বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝায়। মনুষ্য বলিতে চৈতন্য বিশিষ্ট বা জ্ঞান সম্পন্ন জীবকে বুঝায়। সাধারণ ইহাই আমবা বুঝিয়া থাকি। এই যে সাধাবণ জ্ঞান, ইহার নাম ধারণা। রাম বলিতে সাধারণ একটী বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার ধাবণা ভুল হইতে পাবে। সে কোন্ জাতিব অন্তর্গত এবং সেই জাতির অন্তর্গত অপব বিশেষ হইতে তার পার্থক্য কোথায়, সেইটুকু জানিলেই তবে বাম সম্বন্ধে আমাদেব জ্ঞান সত্য হইবে। বিশেষ পদার্থ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল সেই প্রণালী অবলম্বনে আমাদেব বিজ্ঞানেব পথে চলিতে হইবে। সুতবাং ফলে দাড়াইল বিজ্ঞানেব (১) আলোচ্য বিষয় একটী থাকা চাই (২) সেই আলোচ্য বিষয়েব বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম কি সেটী নির্ণয কবিতে হইবে (৩) ও জ্ঞান লাভের বা সত্য লাভেব মূল উপায বা পন্থা কোনটী সেটীও স্থির কবিতে হইবে। শেষেব কথাটী একটু পবিষ্কাব কবিযা বুঝিতে চেষ্টা কবা যাক। অবশ্য এ কথাটী পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে তবে এস্থলে উহার প্রয়োজনীয়তা কোথায় সেইটাই আলোচ্য। ক হয খ, অথবা খ নয়, এই দুইটী বাক্যেব একটী বাক্য অবশ্য সত্য হইবে, দুইটীই সত্য হইতে পারে না, বা দুইটীই মিথ্যা হইতে পাবে না। ইহা যুক্তিব একটী মৌলিক নিযম, শুধু যুক্তিব মৌলিক নিযম বলি কেন এবিষ্টটলেব মতে সত্য লাভের পন্থা। এইরূপ মূল কয়েকটী নিযমের উপর বিজ্ঞানের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত কবিতে এবিষ্টটল প্রয়াসী ছিলেন। এই নিয়মের বলেই সত্যলাভ সম্ভব হয। এই প্রসঙ্গে এরিষ্টটল একটী কথা বিশেষ ভাবে জানাইযাছেন যে বিজ্ঞান এক নহে, বহু, যেমন জ্যামিতি, রসায়ন, দর্শন, পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি এবং সকল বিজ্ঞানের সাধারণ মূল ভিত্তি ছাড়া প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি নিয়ম,

আছে এবং কোন বিশেষ এক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেটী ভিত্তি স্থানীয় অপর বিজ্ঞান সম্বন্ধে সেটী তাহা নাও হইতে পারে। অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞানের বিশেষ যে নিয়ম আছে জ্যামিতি বিজ্ঞান সে নিয়ম মত নাও হইতে পারে। বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য এই বিশেষ বিশেষ শাখা বিজ্ঞানের মূলে যে সত্য আছে তাহাই নির্ণয় করা—বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচনা ইহার গৌণ উদ্দেশ্য।

সক্রেটিস বলেন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করাই সত্য জ্ঞান লাভের প্রধান পন্থা, যুক্তি প্রণালী অবলম্বনে সেই কার্য্য সুসিদ্ধ হয় এবং বিজ্ঞানের মূল ভিত্তিও এই যুক্তি প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই মূল সত্যের অনুসন্ধান করা সুতরাং ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি ন্যায়-শাস্ত্রের সহিত তত্ত্ব নির্ণয়ের কোনও প্রভেদ নাই।

প্লেটো বলেন বিশেষ বিশেষ শাখাবিজ্ঞানের যে সকল বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে তাহারা একটী মূল নিয়মেরই অন্তর্গত। প্লেটোর সহিত এ বিষয়ে এরিষ্টটল একমত ছিলেন না এবং তিনি একপ কথা সিদ্ধান্ত করিতে কোনও প্রয়াস পান নাই। এরিষ্টটল জ্ঞান বলিতে কি বুঝিতেন সে কথা আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

দেখা গিয়াছে ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, পক্ষান্তরে আমাদের "চৈতন্য" শক্তির মর্য্যাদা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। প্লেটোর মত আলোচনা করিলে মনে হয় বাহ্য পদার্থ আমাদের চৈতন্য শক্তির উপর একান্ত অধীন—তাহাদের সত্তা আমাদের উপর নির্ভর করে বলিলেও চলে। এরিষ্টটল এই মতে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতে পারেন নাই, তিনি বলেন প্লেটোর যদি উহাই মত হয় তবে সেটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পক্ষান্তরে উহাদের স্বাধীন সত্তা আছে এ কথাও তিনি স্বীকার করিতেন না এবং যাঁহারা সে মত প্রকাশ করিতেন তাহাদের ভ্রান্ত মনে করিতেন। তিনি বলেন "জ্ঞান" লাভ বলিতে অবক্ত্য অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া বুঝায়। ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানলাভের প্রথম কার্য্যটী সম্পন্ন হয় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, স্মৃতি সেই অনুভূতিকে অভিজ্ঞতার নিকট উপস্থিত করে,

অভিজ্ঞতা তাহাকে বিজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া দেয়, বিজ্ঞান তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করে—জ্ঞানলাভ হয়। এই প্রণালীর একদেশে ইন্দ্রিয় অনুভূতি অপর প্রান্তে জ্ঞানলাভে চৈতন্যের প্রকাশ। বুঝা গেল, তিনি দুইটীরই আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন, তাই কোনটীকে ত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। পরন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ তাহার গ্রন্থ বিশেষের বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে বিজ্ঞানবাদী বা জড়বাদী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সে চেষ্টা নিরর্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক নয়।

শিক্ষাদান প্রণালী।

(উদ্ধৃত।)

"আমেরিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-প্রণালী * * * অধিকাংশ স্থানেই শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত পাঠের 'আবৃত্তি' (Recitation) শুনিয়াই সময় কাটাইয়া দেন। তিনি নিজে পাঠ শোনা ব্যতীত, অতি সামান্য কাজই করিয়া থাকেন। অবশ্য এই যে "আবৃত্তি" তাহা তোতাপাখীর ন্যায় পুথিগত ভাষার পুনরাবৃত্তি নয়। ছাত্র গৃহে যে কায করিয়াছে, বিদ্যালয়ে নিজের ভাষায় শিক্ষকের নিকট বর্ণনা করে। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দেন, ছাত্র সে সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া পরদিন বিদ্যালয়ে উপনীত হয়। শিক্ষক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সেই সেই পুস্তকে ছাত্র যে যে নূতন কথা শিখিয়াছে, তাহা আদায় করেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রতি ছাত্রকে সরল, সহজ ও অনর্গল (fluent and clear language) ভাষায় প্রদান করিতে হয়। এরূপ প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে, ক্লাসের 'অপরাপর' ছাত্রগণ তাহাদের সহাধ্যায়ীদিগের সহিত পাঠের বিষয় ও আবৃত্তির প্রণালী সম্বন্ধে

সমালোচনার করে। বন্ধুভাবে সমপাঠীর ভ্রম প্রদর্শণ ও ভ্রম সংশোধন এই সমালোচনার উদ্দেশ্য। এইরূপে যখন তুইজনে বাদানুবাদ চলিতে থাকে, তখন শিক্ষক বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদিগকে ঠিক পথে চালিত করেন। এবং তর্ক বিতর্ক কালে বাদানুবাদের ভদ্রোচিত রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহ কোনরূপ অন্যায় আচরণ না করে, শিক্ষক সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যে প্রশ্নের সদুত্তর কোন ছাত্রই দিতে পারে না, শিক্ষক সেই স্থানেই শুধু নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। ইহা ভিন্ন তিনি ছাত্রদের পাঠালোচনা ব্যাপারে আর কোনরূপ সাহায্য করেন না।"

*　　*　　*

"এই শিক্ষার গুণেই তাহারা নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নে পতিত হইয়াও আত্মশক্তিতে সন্দিহান হয় না। এই শিক্ষার গুণেই তাহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করুক না কেন, যে কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা অবতীর্ণ হউক না কেন, স্বকীয় যত্ন ও চেষ্টার বলে অচিরেই সাফল্য লাভ করে। ইহাই আমেরিকার শিক্ষকদের অভিমত।"

*　　*　　*

"শিক্ষক যেখানে বক্তা, ছাত্র শুধু শ্রোতা। শিক্ষক যেখানে দাতা ছাত্র শুধু গৃহীতা, সেখানে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। সেখানে শিক্ষক ছাত্রের 'অন্ধের যষ্টি', শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, সে সর্ব্বদাই নিজকে অক্ষম ও তুর্ব্বল মনে করে এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে।"

*　　*　　*

আবার, আমাদের দেশের কলেজ সমূহে কোন কোন অধ্যাপক বিপরীত পথ অবলম্বন করেন। তাঁহারা অন্যভাবে তাঁহাদের শক্তির অপব্যবহার করেন। তাঁহারা কখনও ছাত্রকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সময় নষ্ট করেন না, মা সরস্বতী যেন তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে আশ্রয় লন, আর তাঁহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বকিয়া যান। কখনও কখনও বা ছাত্রদের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া তাঁহারা নোটস্ (Notes) বলিয়া

যান, আর ছাত্রগণ সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় মহার্ণব তরণের একমাত্র ভেলা মনে করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে। এখানেই শেষ নয়। কোনও সহানুভূতিপূর্ণ অধ্যাপক ছাত্রগণের শ্রমলাঘবার্থ (কিঞ্চিৎ অর্থলাভের প্রত্যাশা যে তাঁহাদের না আছে তাও নয়) পরীক্ষা কালে পাঠ্য পুস্তক হইতে যৎপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে, সকলেরই উত্তর লিখিয়া স্বল্প মূল্যে অর্থ পুস্তক বাহির করেন। এই রূপে যে তাঁহারা কত যুবকের মাথা খাইতেছেন, ছাত্র-বন্ধুগণ তাহা একবারও ভাবেন না। শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর হীন কার্য্য কি হইতে পারে ?—

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম এ, বি-টি।

(—ভারতবর্ষ পৌষ ১৩২৭)

সমালোচনা।

বিশেষাপল্লীর চিঠি। (সৎসঙ্গী—অগ্রহায়ণ ১৩২৭)। চিঠি খানি নিরপেক্ষ, তাই আমরা ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বেদান্তে একটি সত্য আছে তাহা দুই ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে—একটা আত্মস্বরূপবোধ ক'রে নিশ্চেষ্ট হওয়া, আর একটা আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চেষ্ট হওয়া। এই দুইটি ভাবকে উপলক্ষ ক'রে ইদানীংএর কর্ম্মীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'রে থাকেন যে এইরূপ ভাব দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হ'লে দেশ একেবারে জড় হ'য়ে যা'বে। লেখক তাঁ'দের একটি বেশ জবাব দিয়েছেন।

"ঐ অদৃশ্য শক্তি প্রচণ্ডবেগে নৃত্য ক'রতে ক'রতে লীলার ছলে জগৎ সংসারে নিজেকে প্রকাশিত ক'রেছেন। তুমি, আমি, কেষ্ট, বিষ্টু সকলেই ঐ শক্তির লীলার কেন্দ্র মাত্র। অজ্ঞাতসারে সকলেই ঐ শক্তির স্রোতে গা ভাসিয়েই চ'লছে। কিন্তু ভাই, শক্তিরূপী ঐ

ঠাকুরটি এমনি কুটবুদ্ধি যে নির্ব্বিবাদে কাউকেই গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে দিচ্ছে না, প্রতিপদেই নাকে মুখে জল ঢুকিয়ে বেশ ঝটাপটি করিয়ে নিচ্ছে। সুখের তরঙ্গশীর্ষে উঠিয়ে আবার পরক্ষণেই দুঃখের ঘূর্ণীপাকে চুবন খাওয়াচ্ছে।" যদিও—"কবিতার ছন্দে গা-ভাসানোটা শোনায় ভালই, বসন্তের হাওয়ায় গা-টা আপনি বেশ সটান ভেসেই যায় বটে, কিন্তু গন্ধময় বাস্তবের মধ্যে যখন কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে, তখন বড় কষ্টেই ভাসে।"

লেখক যে শক্তিটির কথা বলেছেন—তিনি যখন স্থির হ'ন তখন তাঁ'র ব্রহ্ম আখ্যা হয় এবং সাধকেরা নেতি নেতি করে তাঁহাকে বলেন সোহহং, সোহহং এবং আত্মস্বরূপ বোধ করেন, আর যখন সেই শক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, এক হয়ে বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন তখন সাধকেরা নাহং নাহং করে সেই আদ্যাশক্তি 'তুহুঁ'র পরিচয় পেয়ে আত্ম-সমর্পণ করেন।

তা'র পর পূর্ব্বপক্ষী প্রশ্ন করেছেন "তবে কি তুমি ব'লতে চাও যে ত্যাগের মধ্যেই শান্তি আছে।" উত্তরে লেখক বলেচেন, "সুখ আর দুঃখের ঢেউগুলো কাটিয়ে সাধক চলে শান্তির পথে বটে, কিন্তু শান্তি লাভটা ঘটে উঠা অত সুলভ নয়। আমরা ব'লেছি অশান্তি থেকে শান্তিতে, অল্প থেকে ভূমাতে, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে মৃত্যু থেকে অমৃত, এই সবে গা ভাসিয়ে দিতে শিখ্ছি বটে। আর এই রকমে জ্ঞাতসারে আত্মসমর্পণ মন্ত্ররূপের প্রথম সুরে এবং কিঞ্চিদ্দূর পর্য্যন্ত আমাদের মনকে নিশ্চয় ত্যাগমুখী রাখ্তে হবে।"—আমরা কিন্তু মনটাকে আরও কিছুদূর ত্যাগমুখী হ'য়ে এগিয়ে যেতে বলি—সেটা 'বুড়ী না ছোঁয়া পর্য্যন্ত'—কিম্বা 'পরেশ পাথর ছুঁলে ঘটি যখন সোনা হয়ে যায়, তখন আর তা মা'জতে হয় না।'

পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় বলেছেন "ত্যাগটা এ যুগের ধর্ম্ম নয় ইত্যাদি! প্রত্যেক মানুষ এখন নিজ ব্রহ্মস্বরূপ বুঝ্তে আরম্ভ ক'রেছে ইত্যাদি। এ যুগে সকলেই অবতার, সকলেই ভগবান। ভোগানন্দে ডুবে থাকবার জন্যই পরমাত্মার এই সৃষ্টি রচনা; তাই এ যুগের মানুষ তুরীয়ে অবস্থিত

হ'য়ে, ভগবানের মন্ত্রস্বরূপ হয়ে ব্রহ্মানন্দ ও কামিনীকাঞ্চন সম্ভোগানন্দ একযোগে উপভোগ ক'রে পূর্ণ বৃন্দাবন লীলাকে ধরায় প্রচারিত ক'রবে। এমন দিনে আপনার ত্যাগের কথা শোনবার মানুষ কই ?" ইহার উত্তরটি বড় চমৎকার "নবযুগের মহাবির্ভাব বার্ত্তা আর পূর্ণযোগ ও তুরীয়ের বার্ত্তা ঢাক যোগে ঘোষিত হ'চ্চে ব'লেই আমরা হুজুগে পড়ে কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিতে পারছি না যে, সকল কামনাকে জয় বা দগ্ধ কর্‌বার পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীভগবানে অর্পণ কর্‌বার পূর্ব্বে" বিষয় "* * সুধার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ভোগের কিছুমাত্র আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে।"

লেখক বলেন "ত্যাগের অনুশীলনের জন্যে আমরা মঠের ভিতরে পলায়নের বিরোধী"—এ কথাটা লেখকের পক্ষে খাটতে পারে, কিন্তু সকলকেই স্ব-ভাব ত্যাগ ক'রে ঐ কথায় সায় দিতে হবে, এ কথা নিশ্চয়ই লেখকও মানেন না, কারণ তাহ'লে অপরের ব্যক্তিগত ভাব এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। আর "এই গৃহস্থাশ্রমটাকেই মঠ ক'রে তু'লতে হবে" একথাটাও যেমন ঠিক, মুক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করা যায় না "আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত" লেখকের এ কথাটাও তেমি ঠিক। "বিষয়কে পরিহার ক'রে কৌপীণ এঁটে মঠে বা জঙ্গলে গেলেই বাসনা রাশি আমাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হয় না" যেমন সত্য কথা, "আত্মসমর্পণ ক'রলাম, বল্লেই অমনি মুক্ত ভাবে বিষয় ভোগ কববার আদেশ পাওয়া যায় না" এটাও তেম্নি যথার্থ সত্য। কিন্তু সিদ্ধপুরুষেরা যদি প্রবর্ত্তক সাধকের নিমিত্ত

অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্ যঃ
কুণপমিব সুনারীং ত্যক্তুকামো বিরাগী।
বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্,
জয়তি পরমহংসো মুক্তি ভাবং সমেতি ॥ ৯ ॥

এই সত্য না প্রকাশ করে, সিদ্ধির পর যে অবস্থা হয়

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা
গাঙ্গং বারি সমস্তবারি নিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।

বাচঃ প্রাকৃত সংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তু বিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥১০

(ধন্যাষ্টক—শ্রীশঙ্করকৃত)

এই অপূর্ব্ব অবস্থার কথাই যদি কেবল প্রকাশ করতে থাকেন, তাহা হলে সাধারণের যা হ'বে তা লেখকের ভাষায় ব'লতে গেলে ব'লতে হয় "সিদ্ধির উপায়রূপে ত্যাগের আশ্রয় না নিয়ে, যদি আমরা বলি 'এই সৃষ্টিটা ব্রহ্মেরই আত্ম বিস্তারের ফল, ব্রহ্মের সহিত বিষয়ের একান্ত বিরোধী কোন সম্বন্ধ নেই', আর এই বলে" অসত্যের "ভিতর ব্রহ্মের যে আত্মবিস্তার, সেটাকে ত্যাগ না করে ভোগ করতে অগ্রসর হই", তাহ'লে দুঃখকষ্টরূপ "আত্মবিস্তারের উপলব্ধি"ও ঘন ঘন হ'তে থাকবে।

ভারতে এখন ভোগবাদটাকে প্রচার করবার একটা উপযোগিতা আছে বলে "কৃষ্ণ বুদ্ধাদি রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকল অবতার ও মহাপুরুষগণের মুণ্ডুপাত করে" ত্যাগের বিরুদ্ধে অভিমান করাতেই কর্ম্ম যোগীদের বিশ্বাত্ম বোধটা কিরূপ তা লেখক ধরে ফেলেছেন। "প্রতিপক্ষের সমালোচনার ভাষা একটু কঠিন হয়েই থাকে চতুর প্রচারক তাতে অধীর হয় না।" কিন্তু দুঃখের বিষয় চতুর প্রচারক এতই অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন যে শেষে আস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা সকলসম্প্রদায়কে ছুড়ে মারতে কসুর করেন নি। "তত্ত্বনিয়ে তর্ক-বিচার করতে গিয়ে কেবল লুপ্ত বিদ্বেষ বৃত্তিকে জাগ্রত করা হয় মাত্র" তা বেশ জাগ্রতও হয়েছে, সহরের লোকেও নানা কথা বলছে, যা লিখ্‌লে বিদ্বেষের অগ্নিকুণ্ডগুলিতে ঘৃতাহুতি হ'বে মাত্র। কিন্তু সেই সব জঘন্য ময়লা গুলো একটা একটা দল বেঁধে পরস্পরের প্রতি যদি আমরা নিক্ষেপ কর্ত্তে আরম্ভ করি তা হলেই সমষ্টি সাধনার সিদ্ধি একেবারে হাতে হাতে ফলবে—সাম্য, মৈত্রীর ধ্বজা আকাশে ফৎ ফৎ করে উড়বে।

পত্রের শেষাশেষী পূর্ব্ব পক্ষী আবার প্রশ্ন করেছেন, "এই সৃষ্টি লীলার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ, এই কথাটার মধ্যে কি কোন সত্যই নেই?" লেখক উত্তর দিয়েছেন "দ্বান্দ্বাতীত গুণরহিত অবস্থাটাকে উপলব্ধি করে আবার এই দ্বন্দ্বান্বিতা গুণময়ী সৃষ্টি লীলার মধ্যে

যখন ফিবে আসা যায় তখন এই সৃষ্টিব প্রত্যেক রসটি ব্রহ্মানন্দেরই রস বলে অনুভূত হয়। চবম সিদ্ধিব পবের অবস্থাটা আব হাতে খড়িব অবস্থা এই দুটোকে একযোগে তাল পাকালে যে বিভ্রাট উপস্থিত হয় তাকে সাধনা বলে না, তাব নাম আধ্যাত্মিক dyspepsia।" এ কথাটা যে খাঁটী সত্য এবং শাস্ত্র সঙ্গত তা পূর্ব্বে আমরা শ্রীশঙ্কর বচন উদ্ধৃত কবে দেখিয়েছি।

কাব্য ও কল্পনা—(সবুজ পত্র, কার্ত্তিক, ১৩২৭)। লেখক বলচেন "বুদ্ধি কেবল জীবনেব পবিধিটুকুব মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সে জীবনের আলোচনা কবে, ভাষ্য কবে, কখনও কখনও জীবনকে প্রকাশ কবে।" কিন্তু বুদ্ধি বাক্য মনের অতীত সত্তাব পবিচয কিছু জানে—তাকে প্রকাশ কবাটা বুদ্ধিবও যেমন দুঃসাধ্য মনেব অপব বৃত্তিবও তাহাই। "গণ্ডীব বাহিবে কিন্তু কখনো সে সীতাব মত পা দেয না—সীতাহরণও হয় না, বামাযণও রচিত হয না। কল্পনা কিন্তু বুদ্ধিব মত ভীরু নয়।" কিন্তু ভ্রান্তিময়ী—যে ভুলেব জন্য তা'কে আজীবন সীতাব মত অশ্রুপাত কব্‌তে হয। ভুল না কবলে বামায়ণ লেখা হ'বে না এব জন্য সকলকেই ভুল কবতে হ'বে এ কথাব কি সার্থকতা আছে? তবে যদি বলা যায় "মবণকে সে মধুব করে এবং মবণাধিক যাহা তাহাকে মধুবতর করিযা তোলে। * * স্বর্গকে সে ভালবাসে, কিন্তু নবককে সে ভয় কবে না"—বুদ্ধিবাদী বলেন যদি একথা বল তা হলে তোমার সঙ্গে মিতালী হ'ল কাবণ বুদ্ধিবও চবম পবিণতি উহাই—তোমার একদিক দিয়ে আমাব আব একদিক্ দিয়ে। তুমি যেমন "সীমার মধ্যে খেলা কবতে কবতে * সীমাহীনের রাজ্যে গিয়া" পড আমিও ঠিক তাই। তবে তুমি যেমন "নীল আকাশের মধ্যে * আপনাকে" হারিয়ে ফেল আমি কিন্তু আরও একটু বড হয়ে অমন সুন্দর আকাশ নিজের মনেব মধ্যে বেঁধে দেই, আব ঐ যে "নীল চোখেব কাছে আত্মহারা" হয়ে পড আমি কিন্তু তোমাব ভাব দেখে একটু গোলে পড়ি।

"মর্ত্তেব সহিত স্বর্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সংসাবের মধ্যে থাকিয়াও সংসারকে ছাড়াইয়া যায় বলিয়া স্বর্গকে কথনো কথনো সুদূর বলিয়া

মনে হয়।” এই “স্বর্গটী” কি সুখ-সৌন্দর্য্য স্মৃতি না ভূমার নামান্তর? যদি সুখ-সৌন্দর্য্য স্মৃতি হয় তবে তা এই সংসারারণ্যের ঘনান্ধকারে ক্ষণিক দীপ লেখা; আর যদি উহা ভূমা হয়, অর্থাৎ “সাধারণ লোক সংসারের লোক। সে কেবল বাহিরের জগতের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া রাখে। পরিবর্ত্তন হইতে পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে ক্ষণিকের সহিতই তাহার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিচয় ঘটিতে থাকে। শাশ্বতের সাক্ষাৎ পাইবার অবসর তাহার নাই। এই বহির্জগতের অন্তরে এবং বাহিরে কিন্তু আর এক জগৎ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছে। তৃতীয় নেত্র যাহার উন্মীলত হইযাছে সেই কেবল এই লোকের সন্ধান পাইযাছে।” ইহার সহিত বুদ্ধিজীবীর নিগমনের বিরোধ কোথায়? “দেশকালের অতীত বলিয়া এই জগতের জরা নাই” তাহা হ'লে “জগৎ” শব্দটী বদলাইতে হয় কারণ “জগৎ” মানেই “পরিবর্ত্তন হইতে পরিবর্ত্তন” অর্থাৎ গমনশীল। “এই মানস লোকে বিচরণ করেন বলিয়া মর্ত্তের মানুষ হইয়াও কবি অমর।” উপনিষদে ‘কবি’ ঠিক এই অর্থে ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু ইদানীং কবিদের বড় একটা তৃতীয় চক্ষু দেখা যায় না। “সংসার” যখন “নশ্বর” তখন—“স্বর্গ” নিশ্চযই “অনশ্বর” অরূপ নির্ব্বান সাগর—কারণ “নশ্বর” বলিতে আমরা “পরিবর্ত্তনশীল” বুঝি যা “সংসার”। কিন্তু ইহাই যদি সত্য হয় তবে “পুরুষের হৃদয়ের শাশ্বতী কামনা” কি করিয়া “কবির কল্পনার ভিতর দিয়া কাব্যের আকাশ পথে উর্ব্বশীরূপে আবির্ভূতা হইল”—এক বিশেষ সীমার পরিধায়? “শাশ্বতী কামনা” ত সকল সীমার মধ্যেই অসীমকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে?

মোহমুদ্গরঃ—শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ, M R A S., (London) সম্পাদিত। মূল্য ৵৹ আনা। ইহাতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত মোহমুদ্গর, এবং তাহার অন্বয়, বাঙ্গলা টীকা ভাবার্থ এবং পদ্যানুবাদ আছে। ইহাতে আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভোগ-পরতন্ত্র সাহিত্যের দিনে মোহের মুদ্গরস্বরূপ এইরূপ পুস্তিকা হিন্দুর ঘরে ঘরে থাকা প্রয়োজন।

সশিষ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ M R. A S. (London) বিরচিত। ইহাতে অতি সংক্ষেপে দক্ষিণেশ্বরের বর্ণনা, গুরুশিষ্যের জীবনী, সাধনা, সিদ্ধি, উপদেশ ও কীর্ত্তি গীতি লিখিত হইয়াছে। একখানি কাল্পনিক চিত্রও আছে। এইরূপ পুস্তিকার যতই প্রচলন হইবে ততই নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষীর ভাব কম পড়িবে।

এক সত্যে হিন্দু মুসলমান—পূরা সাঁচ্চা কামেল পীরের কৃপালব্ধ এই পুস্তিকা কোরাণাদির সার সংগ্রহ। ভারতের এই যুগসন্ধি ক্ষণে এইরূপ পুস্তকের যথেষ্ট উপযোগীতা আছে। গ্রন্থের একটী বাণী আমরা ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—"ধর্ম্মের মূলভিত্তি লইয়াই ছিল একমাত্র বিরোধ। মুসলমানেরা জানিতেন হিন্দুরা একেশ্বরবাদী নহেন, হিন্দুরা পৌত্তলিক, বহু দেবদেবীর উপাসক। আধুনিক মহর্ষিবৃন্দের মুখে বেদান্ত তত্ত্বের যে গভীর হৃদয়স্পর্শী ঝঙ্কার উঠিয়াছে, সে ঝঙ্কারে নিদ্রিত জাগরিত হইতেছে এবং জাগরিত উত্থিত হইতেছে, আবার উত্থিত আচার্য্য সন্নিধানে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছে, সেই বেদান্ত তত্ত্বকুশল বহু হিন্দু আচার্য্য বাহু সম্প্রসারিত করিয়া মুসলমান ভাই সকলকে আলিঙ্গন করিতে সমুদ্যত। হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পক্ষে এই এক মহাসুযোগ।" সঙ্কলয়িতা মহম্মদ খলিলর রহমান।

বাঙ্গালীর ব্যবসাদারী—অধ্যাপক শ্রীপার্থ সারথি মিশ্র, এম, এ প্রণীত—সরল শুদ্ধ ভাষায় লেখক আমাদের জাতীয় অঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা সকল পচনোন্মুখ অংশ সকল খুলিয়া দেখাইয়াছেন। যাতির ধর্ম্ম কাটা গড়া নয়—সমাজের উন্নতি এই যাতি-ধর্ম্মকেও অপেক্ষা মাঝে মাঝে করে। কিন্তু লেখক যেমন মক্ষিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তীর্থ, সন্ন্যাস, গার্হস্থ্য, ছাত্র সমাজ ও মাতৃ সমাজের সকলব্রণগুলির অনুসন্ধান করিয়াছেন সেইরূপ যদি মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া (যদিও বেলুড় মঠ, রামমোহন রায় প্রমুখ দুই চারিটী বড় ফুলের উল্লেখ করিয়াছেন) আমাদের জাতীয় উদ্যান হইতে জনসাধারণের মধ্যে যে ত্যাগ তিতিক্ষার কুসুম সকল ফুটিয়া আছে তাহার অনুসন্ধান

করিয়া দেখাইতেন তাহা হইলে পুস্তিকাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আজ দেড় শত বৎসর ধরিয়া সমাজ সমালোচকদের গালাগালি খাইয়া আসিতেছে—তাহাকে খাওয়াইবার জন্য কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দিলেই বোধ হয় এক্ষণে ভাল, নচেৎ জনসাধারণে বুঝিয়া বসিবে সমালোচনাটাও একটা বাঙ্গালীর ব্যবসাদারী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২৯ ফাল্গুন, সন ১৩২৭ ইংরাজী ১৩ মার্চ্চ ১৯২১ রবিবার (তিথিপূজা শুক্লা দ্বিতীয়া ২৭ ফাল্গুন) বেলুড়মঠে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ-দেবের ষষ্ঠ্যশীতিতম জন্মোৎসব হইবে। সকল ভক্ত একত্রিত হইয়া পার্থিব ভাগবতী লীলার সমৃদ্ধি করিবেন।

পূর্ব্বানুরূপ এবারও যথানিয়মে রামকৃষ্ণমিশন গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের তীর্থ-মেলনীতে ওলাউঠা রোগীর সেবা, শিশু বা নারী পথ হারাইলে অনুসন্ধান করিয়া নিজ নিজ আবাসে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং ওলাউঠা রোগীদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় মেলার অবসানে ডায়মণ্ড-হারবার সরকারী হাঁসপাতালে রাখিয়া আসা হয়।

সানফ্রান্সিস্‌কোর (San Francisco) বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী প্রকাশানন্দজির কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আশ্বাসিত। কালিফোর্ণীয়ার অন্তর্গত সেণ্ট এন্টয়নি (St Antoine) নামক স্থানে শান্তি-আশ্রম নামক কেন্দ্রে গত জুনমাসে বহু ছাত্র এবং ছাত্রীর সমাবেশ হয়। তিনি তাহাদিগকে নিয়মিত ভাবে রামকৃষ্ণ জীবনী, বিবেকচূড়ামণি, গুরুগীতা এবং উপনিষদ শিক্ষাদান এবং ধ্যান ধারণার অভ্যাসও করাইয়াছিলেন।

বোষ্টন নগরীর (Boston) বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দ গত জুনমাসে সিনসিনেটি (Cincinnati) নামক স্থানে 'বেদান্ত' 'আধ্যাত্মিক উৎসর্গ' 'মৃত্যুরপর জীবন,' 'একত্ব ও বিশ্ব-জনীনত্ব' প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিয়া বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় রঞ্জন করেন।

ভ্রম সংশোধন।

মাঘের উদ্বোধনে ২৬ পৃঃ ১৩ পংক্তি 'তথাকথিত' শব্দের পর 'শূন্যবাদী-বুদ্ধ' এবং ১৪ পংক্তিতে 'রামকৃষ্ণ' শব্দেব পূর্ব্বে 'কামকাঞ্চ ত্যাগী' বসিবে। ৩১ পৃঃ ৯ পংক্তিতে 'গঠিত' স্থলে 'পঠিত' এবং ১৩ পংক্তিতে 'জাগিয়া উঠিযাছে', স্থলে 'জবিযা গিয়াছে' বসিবে। ৩৫ পৃঃ ২০ পংক্তি 'ব্যাধি' স্থলে 'ব্যাধ' হইবে। ৬৪ পৃঃ ৯ পংক্তি 'শুক্রা' স্থলে 'কৃষ্ণা' এবং ১৯ পংক্তি 'রবি' স্থলে 'তাবকা' ও 'নভঃ' স্থলে 'কক্ষ' হইবে।

"এই ছোট হইতেই বড় হইযা থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে।"

"অন্ন—অন্ন। যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস কবি না।"

'ভাবতকে উঠাইতে হইবে, গবিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার কবিতে হইবে, আর পুবোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহাবা যেন ঘুর পাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগবে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আব যিনিই হউন।"

"আমাদেব নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণেব নিকট হইতে অধিক ক্ষমতালাভের জন্য সভা সমিতি কবিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপবকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়।"—বিবেকানন্দ।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

উপরে অনন্ত নীলাকাশ—সোনালী রঙের কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে সূর্য্যদেব পশ্চিমাচলে ঢলিয়া পড়িতেছেন, রথের রক্ত আলোরের সিন্দুর আভায় তখনও দিক সকল মৃদু উজ্জ্বল—মধ্যাহ্নের সে প্রখরতা আর নাই—কেবল যেন একবার বিশ্রামের পূর্ব্বে করুণানয়নে দেখিয়া লইতেছেন, সারাদিন যে উত্তাপ দান করিয়াছেন তাহাতে জীবের কিছুকালের জন্য চলিবে কিনা। সহসা দূরে অতি দূরে সবুজ পৃথিবী ও নীলাকাশের সঙ্গম রেখায় কোন এক দুরন্ত অসুরের মসীবর্ণ কেশজালের প্রান্তভাগ দৃষ্ট হয়। তখনও পশ্চিমে দেবতার অনুরাগে বিচিত্র যক্ষপুরী অস্পষ্ট তুলিত হইয়া রহিয়াছে—যাহার দিকে তাকাইয়া জীব দ্যুলোকের বিরহ চিন্তায় চিত্তকে উধাও করিয়া দেয়। অসুর যেন উঁকি মারিয়া দেখে 'ওটা আবার কি। সে তখন গভীর গর্জ্জনে মেঘের বন্যায় অঙ্গ ভাসাইয়া ছুটিয়া আসে। অট্ট হাস্যে বিজলী খেলাইয়া ধ্বংসের নিমিত্ত সেই যক্ষপুরী গাঢ় অন্ধকারের অগাধ জলে ডুবাইয়া দেয়। পরে স্বর্ণপুরীর ধ্বংস ক্রীড়ার সমাপ্তির কঠোর পরিশ্রমে তার অঙ্গে জলের ধারা বহিতে থাকে, আবার কাহার মধুর অনীল বীজনে সে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

* * * *

ধীরে বাতাসে জোনাকি খেলিয়া বেড়ায়, আনন্দে শিশু ধরিতে চায়। আবার আকাশে একটির পর একটি করিয়া তারা ফুটিতে থাকে—লোকের দেখিয়া কত আনন্দ। শিশু ভাবে ঐ তারাটীর

মত এত উজ্জ্বল আর কোনও তারা বুঝি ফুটিবে না। কিন্তু সেই অনন্ত আকাশে আরও শত তারকা ফুটিয়া শিশু হৃদয়ের চিত্ত সরোবরে ঝিকমিক্ করিয়া আনন্দের কণায় ভরিয়া দেয়। ক্রমে যখন চন্দ্রমা আসিয়া আকাশ রঙ্গমঞ্চে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত আসনে উপবেসন করিয়া জীবলোকে সুধা বিতরণ করেন তখন জীব তাঁহার স্তুতি করে 'ওগো সোম, তুমি আমাদের রাজা।' কিন্তু প্রভাত বায়ু বহিয়া আনে এক মহাবার্ত্তা, মৃদু স্পর্শে সকলের কানে কহিয়া যায় 'রাজার রাজা ঐ পূর্ব্ব-দিকে আসে। ঐ দেখ তার অঙ্গ রাগে উষার আনন নব রাগে রঞ্জিয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ মাথার কিরীট কি উজ্জ্বল। কি জ্যোতির্ম্ময়। ঐ শুন তারকামণ্ডলীর স্তুতি 'হে সবিতা, তুমি আমাদের নিয়ামক, তোমার বিশ্রামে আমরা প্রহরী, চন্দ্র তোমার আলোকের প্রতিনিধি, এক্ষণে তুমি নিজেই প্রাণ ও আলোক জীব লোকে আশীষ ধারার ন্যায় বর্ষণ কর, আমরা অন্তর্হিত হই।'

* * *

প্রতি যুগ প্রভাতের প্রারম্ভে উদিত হন এক ঈশ্বর কল্প-জ্যোতি মানব—যাঁহার ম্লান কিরীটের উজ্জ্বল প্রভায় জগতের সকল অন্ধকার, সকল জড়তা দূর হইয়া আসে জীবলোকে পবিত্র প্রাণের স্পন্দন। যাঁহার আরক্তিম প্রেমময় আননের অঙ্গরাগে চৈতন্য ও দীপ্ত করে সমগ্র বিশ্ব হৃদয়ের ভাব রাজ্যের দেব মন্দিরের বিগ্রহ—যাঁহার নিশ্বাস প্রবাহিত করুণাবায় মানবের কানে কহিয়া বেড়ায় সেই ধর্ম্ম সম্রাটের আগমনের সুসমাচার। মানব তখন পরস্পর বলাবলি করে "The kingdom of heaven is at hand"—স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। "Prepare ye the way of the Lord, make his path, straight"—রাস্তা পরিষ্কার কর, তাঁহার আসিবার পথ সুগম কর। তখন অন্তর রাজ্যের লোকেরা ভাব সৌধে বাসর রচনা করিয়া প্রভুর আগমন প্রতিক্ষা করে আর বাহ্য জগতের লোকেরা পথ, ঘাট, বাগান মন্দিরের সকল আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য সকল জীর্ণ, সকল পুরাতন, সকল মিথ্যা, সকল কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া

চুরমার করিয়া ফেলে। কিন্তু বিচারহীন বাহ্য প্রাণী জানে না যে তাহারা গড়িতে অপারগ। তাহারা কেবল ভাঙ্গিয়াছে—তা যেমন খারাপও ভাঙ্গিয়াছে, ভালও ভাঙ্গিয়াছে। ভাবিয়াছিল আরও চমৎকার করিয়া গড়িবে কিন্তু এখন ভাঙ্গা চুরার দৈন্য নিষ্ফলতার মধ্যে কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবসাদে নিদ্রিত হওয়া ছাড়া তাহার আর কি আছে ?

* * *

ধীরে সেই ধর্ম্ম সূর্য্য আকাশ পথে আরোহণ করিতে থাকেন, তাঁহার প্রাণপ্রদ আলোক স্পর্শে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটিয়া উঠে। তখন সকল ভক্ত একত্রে তাঁহার পূজার নিমিত্ত সেই পদ্মের মালা গাঁথে—ইহাই নব যুগ-সঙ্ঘের আরম্ভ। ভক্ত তখন ডাকিয়া বলে 'কে আছ কোথায়, পূজার সময় উপস্থিত, দেবতা প্রসন্ন। তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজ স্বরূপ অবগত হও, মহিমাময় হও।' তখন নিদ্রিত চক্ষু মেলে আর প্রেমালোক তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুপ্ত বিগ্রহে চৈতন্য আনে। সেও তখন মধ্যাহ্ন গগনের ধর্ম্মজ্যোতির উপাসনায় তাহার তনু মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ধন্য হয়—আর সকল ভক্ত সঙ্ঘ স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া সেই মূর্ত্ত দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট লীলায় ব্রতী হয়। লীলাধার নবীন মানুষ, নবীন সঙ্ঘ, নবীন সমাজ, নবীন জাতি, নবীন বিশ্ব গড়িয়া তুলে এবং সেই দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে, প্রতি সঙ্ঘের বিগ্রহে, প্রতি সমাজের সংগমে, প্রতি জাতির আদর্শে, বিরাট বিশ্বের আত্ম স্বরূপে।

* * *

বহু শত বর্ষব্যাপি সে বিপুল লীলার গতি রঙ্গ ভঙ্গীর বিশ্রাম ছলে ক্রীড়া-সহায় সকল ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া, ধর্ম্মারুণ উদয়াচলে উপস্থিত হন এবং রাখিয়া যান এক সুদৃশ্য যক্ষপুরী—যাহাতে থাকে বহু শোভমান মঠমন্দির, উদ্যানবিদ্যালয়, বীথিকারিপণি কেবল আলোছায়ায় আঁকা ছবির মত। সে সব পরিচালিত হয়

যন্ত্রপুত্তলিকার ন্যায় গৃহস্থ সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ শূদ্রের দ্বারা। মনে হয় যেন একটা পুঁতুলের সমাজ একটা প্রাণহীন জাতি যন্ত্রেব দ্বারা পরিচালিত—সমগ্র মঠ মন্দিব পণ্যবীথিকায় নূতনত্বের সাড়া শব্দও নাই। মানুষের বাক্যগুলিও যেন কলেব গানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি মাত্র—যাহা বলে তাহার অর্থ বুঝে না জানে না। প্রাণ-দেবতাও যেন শ্রীভগবানের সেই অবতাব লীলার সমাপ্তিব সহিত মহাপ্রস্থান করিয়া বসেন, কেবল রাখিয়া যান যন্ত্রবৎ খাওয়া পরার মত শক্তিটুকু। কিন্তু সে দৈন্যের মধ্যেও নির্গত হয় পতিতেব দীর্ঘনিশ্বাস, জাগিয়া উঠে সেই প্রাণহীন যক্ষপুবী দর্শনে এক অতীতেব দেব স্মৃতি।

* * *

ধর্ম্মরাজেব অপ্রতিহত প্রতাপে হৃদয়েব পশুটা এতদিন চুপ করিয়া থাকে। চক্রবৎ পবিবর্ত্তনশীল সৃষ্টচক্রেব ভাগবতী লীলাব পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত সুযোগ বুঝিয়া ভীম হুহুংকারে সে অসুব গৰ্জিযা গর্জ্জিয়া সকল বিশ্বে অজ্ঞান অন্ধকাব ঢালিয়া দেয়—সে সুদৃশ্য যক্ষপুরীও হাওয়ায় বিলীন হইয়া যায়। ঐন্দ্রজালিকেব মত নানা মূর্ত্তি ধবিয়া জাতিতে, সমাজে, ব্যক্তিত্বে সে মহা বিপ্লবেব প্রলয় ইন্ধন স্তবে স্তরে সাজাইযা দেয। পরস্পবেব আঘাতে অঙ্গে শনিত ধারা প্রবল বেগে বহিতে থাকে আব প্রজ্জ্বলিত ইন্ধনে মঠ মন্দিব সমাজ জাতি পুড়িযা ভস্মস্তূপে অবসান হয। শেষে ধ্বংশেব কঠোব শ্রমেব অবসাদে নির্জ্জীব হইয়া নিজেই ঢলিয়া পড়ে।

* * *

সহসা ধরিত্রীব শ্মশান বক্ষে শ্রীভগবানেব করুণা নিশ্বাস শীতান্তে মলয়াব মত বহিয়া বহিয়া জড় দেহে জীবন সঞ্চাব কবে—কি এক যাদুবলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্থি, কঙ্কাল যোড়া লাগে—আকাশ নির্ম্মল পবিত্র হয—ধীবে কত খদ্যোতপ্রায় সৎলোক, নক্ষত্রেব মত একটীব পর একটী করিয়া কত মহাপুরুষের আবিভাব হয়। তাঁহাদেব জ্ঞান বিচ্ছুরিত দেহের প্রেম কণায় তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়া শিশু-মানব বলিতে থাকে 'এমনটী আর

বুঝি হইবে না।' কিন্তু তেমন শত শত শ্রীভগবানের অগ্রদূত আসিয়া নানা বিপ্লব দুষ্ট সমাজে, জাতিতে আবির্ভূত হইয়া শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। ক্রমে সনাতন আদিত্যের আলোকের প্রতিনিধি স্বরূপ চন্দ্রকল্প এক অতি-মানব জগৎ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম কৌমুদীতে জগৎ উদ্ভাসিত করেন। তৎপ্রদত্ত সুধাপানে এক সমাজ অপর সমাজে মিশিয়া যায়. এক জাতি বিজাতির গায় ঢলিয়া পড়িয়া বলে, 'তুমি আমার ভাই।' সে গুণ জ্যোতিতে স্তব্ধ ও মুগ্ধ মানব ঈশ্বরের 'ইতি'-স্তোত্র পাঠ করে 'হে ঈশ্বর পুত্র, হে স্বর্গীয় দূত তোমার ভাব একমাত্র সত্য, তোমার বাণী একমাত্র সত্য, অপর সকল মিথ্যা, আর কেহ তোমার মত আসে নাই—আসিবে না—তুমিই একমাত্র আমাদের রাজা।'

* * *

—আবার এই যুগ সন্ধিক্ষণে শুন বিশ্ববাসী প্রভাত বায়ুর মত পবিত্র নির্ম্মল ভাগবতী করুণাবাতাসের অলক্ষিত বাণী। ঐ শুন প্রেমোজ্জ্বল নবীনা উষার গোলাপীওষ্ঠ ঘোষিত মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি 'রাজার রাজা এই পূর্ব্বদিকে উদিত। ঐ দেখ কি জ্ঞানোজ্জ্বল কিরীট। যাহার জ্যোতিতে ম্লান সকলতারা, চন্দ্র। ঐ শুন তাঁহাদের স্তুতি "তোমার বিশ্রামে আমরা ধর্ম্ম রাজ্যের প্রহরী—তোমার উদয়ে আমাদের সকল ভাব, সকল অনুভূতি, সকল বাণী সার্থক—আমরা তোমার লীলার সহচর।' ওঠ জড় প্রাণ, জাগ নিদ্রালস, ভক্তি বিনম্র হৃদয়ে দর্শন কর ঐ অখিল ভাবানুভূতি-ঘন মূর্ত্ত-নারায়ণ ধর্ম্মসম্রাট। জাগ্রত কর, চৈতন্য কর স্বীয় হৃদয় মন্দিরের আত্ম-বিগ্রহ।

(২)

জগতের উন্নতি স্রোত যখন বহিতে থাকে তখন দেখা যায় সকলেই আপন আপন চরকায় তেল দিতে ব্যস্ত—কে কি করিতেছে—কে কি বলিতেছে—তাহা দেখিবার, ভাবিবার সময় পর্য্যন্ত তখন হয় না। সে যে ভাবাশ্রয় করিয়া কাজে লাগিয়াছে তাহাকে সর্ব্বাংশে সুন্দর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকে—তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, লক্ষ্য স্থির, ভাষা সংযত।

অবনতির সময় মানুষ কার্য্যতৎপর না হইয়া বাক্ চতুর হইয়া থাকে, নিজের চরকায় তেল না দিয়া অপরকে তাহার চরকায় তেল দিবার উপদেশ করে—নিজে কি ভাবে জীবন কাটাইতেছে না দেখিয়া, অপরের দোষানুদর্শনেই ব্যস্ত—অপরের কার্য্য প্রণালী না ভাবিয়া, বুঝিয়া অবিবেচকের মত যা তা একটা মতামত প্রকাশ করে, আর নিজে যাহা বলিয়া, করিয়া থাকে—তাহার আদর্শ হয় সে নিজেই—প্রাচীন অভিজ্ঞতা এবং সত্যগুলিকে বিচার না করিয়া বলে 'ও সব পুরাতন ফেলিয়া দেও'—অর্থাৎ যাহা তাহাদের চিন্তা গণ্ডীর বাহিরে, যাহার সম্বন্ধে কখনও সে ভাবে নাই বা নিজ চরিত্রের বিরোধী বলিয়া ভাবিতে পারে না—সে সব হেয়, মন্দ, ঘৃণিত—ইহার নাম অনধিকার চর্চ্চা।

* * *

হিন্দুর শাস্ত্র বেদ। আবার বেদানুকূল নানা যুগের উপযোগী নানা শাস্ত্র ভক্তজ্ঞানী মহাপুরুষেরা নিরপেক্ষ ভাবে জীব-কল্যানকামী হইয়া রচিয়া গিয়াছেন—যাহার দৃঢ় ভিত্তির উপর এই হিন্দু সমাজের বিপুল প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত—বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক বহু উপপ্লাবনে ও বিপ্লবে যাহা অটুট। যত দিন পর্য্যন্ত কোনও জাতি বা সমাজ ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীবন ধাত্রোপায় না দেখাইতে পারিতেছেন ততদিন হিন্দু তাহা গ্রহণ করিবে না। মনে কর যদি কোনও শিশুমস্তিষ্ক তথা-কথিত-হিন্দু ইউরোপীয় অতি-সাম্যবাদীদের দোহাই দিয়া বলে 'এই যে হিন্দুসমাজের ব্রহ্মচর্য্য এবং বিবাহ, অত্যন্ত crude এবং archaic অর্থাৎ বড় সেকেলে, ঐ সব দূর করিয়া দেওয়া হউক, তখন কোনও হিন্দু, যাহারা ইউরোপীয় শান্তি, সভ্যতা এবং স্বাধীনতার ফলাফল প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন,—উহা কি গ্রহণ করিতে পারেন ?

* * *

এই চতুরাশ্রম সম্পন্ন বিরাট হিন্দু জাতির প্রতি-আশ্রমীদের একটা করিয়া আদর্শ ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এখন যদি কোনও আশ্রমী—ধরিয়া লওয়া যাক কোনও সন্ন্যাসী—নিজ আদর্শ ত্যাগ করিয়া

ধ্যান ধারণা ছাড়িয়া, ভেদবুদ্ধি বিবহিত হইয়া জীবের সেবা ছাড়িয়া, নারীতে মাতৃবুদ্ধি ত্যাগ কবিয়া, বিলাসী হইয়া, গৃহস্থেব ন্যায় দাব পরিগ্রহ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন,—বাজনৈতিক, সমাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলেন—স্বীয় বিষয় ত্যাগ করিয়া গৃহস্থের সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ কবেন, কে কি বলিল না বলিল শুনিয়া বিচলিত হন সে ক্ষেত্রে তাঁহাব অনধিকাব চর্চ্চা হইতেছে বুঝিতে হইবে—এবং তাঁহাব সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ সাধুসঙ্ঘই কবিয়া থাকেন ও কবিবেন।

*　　*　　*

আবার যদি কোনও গৃহস্থ সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন না করেন, মাতৃবৎ পবদাবকে দেখিতে না পাবেন, সত্যে নিষ্ঠা বাখিয়া বিষয় পবিচালন করিতে না পাবেন—পিতা মাতাব সেবা না কবেন—একান্নবর্ত্তী পবিবাবেব সকলকে সমান দেখিতে না পাবেন—বিপন্ন এবং আশ্রিতকে বক্ষা না কবিতে পাবেন—সর্ব্বোপবি মানবেব জন্মগত দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বজায় না বাখিতে পাবেন—সে জন্য যে ধিক্কার তাঁহাবই প্রাপ্য। এ সকল ত্যাগ কবিয়া যদি কোনও গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে 'জ্ঞান বাতাইতে' যান তখন বাঙ্গালা দেশেব একটী চলতি প্রবাদ মনে পড়ে "চালুনী বলেন ছুঁচুনীকে, তুমি বড ভাই ছাঁদা।" "নির্ব্বৈবঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ" প্রভৃতি ভিক্ষু বাক্য গৃহস্থকে জোর কবিযা শুনান যেমন সন্ন্যাসীব অনধিকাব চর্চ্চা, তেমনি 'টাকা বোজকার কর, 'কামিনী ত্যাগ করা উচিৎ নয়,' 'বিজাতিব বিরুদ্ধে অভিযান কব' প্রভৃতি সন্ন্যাসীব প্রতি উপদেশ গৃহস্থেব তেমনি অনধিকাব চর্চ্চা।

*　　*　　*

এই গুণ কর্ম্মানুযায়ী আশ্রম বিভাগ বেদশাসন। এই সমাজসঙ্ঘ যাঁহারা মানিতে অনিচ্ছুক—সেই—বেদাবজ্ঞাকাবীদেব সমাজ হিন্দুবলিতে কুণ্ঠিত। সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য সম্বন্ধে নিজ নিজ মন গড়া আদর্শ ভারতবর্ষে চলিবে না—বেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাচীনকাল হইতে ইদানীং পর্য্যন্ত বেদ-বিজ্ঞানী পুরুষেবা যেরূপ ব্যবস্থা দিতেছেন সেইরূপে চলিতে হইবে,

কারণ যাঁহারা চক্ষুষ্মান তাঁহারাই পথ দেখাইতে পারেন—পথ দেখান অন্ধের কার্য্য নহে।

* * *

আশ্রমের শাসন মানিতে হয় আদর্শে পৌঁছিবার জন্য। কোন আশ্রমের সকল ব্যক্তিই আদর্শ হইতে পারে না। সকল আশ্রমেই মেকি আছে। যেমন ব্রাহ্মণ পুলিস, পাচক দেখিয়া ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ বুঝা যায় না, সেইরূপ ধনি-পুষ্পের চতুঃপার্শ্বস্থ মধুকর সন্ন্যাসী দেখিয়া সন্ন্যাসের আদর্শ বুঝা যায় না। তাহা হইলে পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা যেমন এক নিশ্বাসে ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বলিয়া থাকেন 'ইহারা অর্দ্ধ সভ্য' সেইরূপ নিগমন সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতি আশ্রমস্থ কোনও ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী হয় তাহাতে সেই আশ্রমের আদর্শের হানি হয় না দোষ সেই ব্যক্তির। আদর্শই আমাদের লক্ষ্য—ঝগড়া বিবাদ নহে। যদি কোনও ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীর দোষ দেখাইয়া একখানি পুস্তক লেখা যায় তবে অপর বর্ণ বা আশ্রমের দোষ দেখাইয়া দশখানি পুস্তক লেখা যায়। অতএব বুদ্ধিমানেরা ঝগড়া বিবাদ স্থগিত রাখিয়া Example is better than precepts এই সরল নীতি অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ চরিত্রের উন্নতি বিধান করিবেন।

* * *

সন্ন্যাসী ভুঁই ফোঁড় নহে। সন্ন্যাসীর পিতামাতা গৃহস্থ। সন্ন্যাসীর আদর্শে পৌঁছিবার প্রধান সহায় পিতা মাতার বিলাস-হীনতা, পবিত্র চরিত্র ও ধর্ম্মভাব। আবার সন্ন্যাসী যখন সকল বর্ণের এবং আশ্রমের গুরুর আসন দাবী করেন তখন প্রকৃত ত্যাগ ও সংযম তাঁহাদের দেহে, কর্ম্মে এবং চিন্তায় না দেখিলে সমাজ চুপ করিয়া থাকিবে না। কোন আদর্শই হেয় নহে—সকলেরই আদর্শ সমাপ্ত হইয়াছে চরম ত্যাগে। তবে কাহার কোন্ 'ভেকে হরি' মিলিবে তাহার যখন স্থিরতা নাই তখন সকল আদর্শই সমাজচক্ষে ধারণ করা বর্ত্তমান সাহিত্যের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

অবতরণ।

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।)

আঁধারের অসীম সাগর। নিস্পন্দ! নিষ্কম্প! মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের জমাট আলিঙ্গনকে বিচ্ছিন্ন করে কাহার সাধ্য? চাঞ্চল্যহীন নিরালা অন্ধপুরীতে কে জানে কে আছে?—জীবিতের সাড়া নাই, গতির ধ্বনি নাই, সব যেন মরণ-কাঠির সংস্পর্শে সুপ্তির মোহে আচ্ছন্ন।

হঠাৎ একটি আলোক-গোলক ফুটিয়া উঠিল। তারপর আর একটি; তারপর আরো একটি। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র আলোক-মণ্ডলে অন্ধপুরী পরিব্যাপ্ত হইল। বিক্ষিপ্ত আলোক বহুবর্ণ সঞ্চিত আঁধারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। আঁধার পালাইল,—রাঙ্গিয়া উঠিল নবালোকের নবীন অনুরাগ।

নামিল ছন্দের ধারা গতি-ধ্বনির সামঞ্জস্যপ্রসূত। পুলক ঝঙ্কারে কম্পিত হইল আলোর ছন্দ, শব্দের সঙ্ঘাতে বাজিয়া উঠিল জীবনের ধ্বনি, অব্যাহত ছুটীল বিশ্বের গতি,—আলোর পিছনে আলোর নর্ত্তন, বিশ্বকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া বিশ্বের উল্লম্ফন।

বীজ উপ্ত হইল—অঙ্কুরে বৃক্ষ পল্লবিত হইল সবুজ সজ্জায়, মুকুলিত হইল রেশমী শোভায়। তারপর ফুল ফুটিল। সহস্র বৃক্ষের শীর্ষদেশে দুলিয়া দুলিয়া শোভন পুষ্পের রূপ-গৌরব নাচিয়া উঠিল। জগতে ফুলের হাট বসিল। জগৎ-পৃষ্ঠোপরি সুবিশাল মন্দিরের চতুঃপার্শ্ব ব্যাপিয়া পুষ্পোদ্যানের অশেষ সীমা পরিব্যাপ্ত হইল। সমীরণ ছুটিল হিল্লোলিত তরঙ্গে সেই পুষ্প-বীথিকা আন্দোলিত করিয়া,—পুষ্পের সুরভি নিশ্বাসে মন্দির পরিপূরিত করিয়া।

জগৎ ব্যাপিয়া একটা আবেশময় মাধুর্য্যের ললিত তরঙ্গ অপ্রতিহত ছুটীতে লাগিল। পিতা সন্তানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যাও বৎসগণ! নিম্ন জগতের মাধুর্য্য-মণ্ডিত আবাস তোমাদের খেলা ঘর। সেখানে যাইয়া তোমাদের ছেলে-খেলা সমাপ্ত কর। ঐ যে পুষ্পোদ্যান

পরিবেষ্টিত, সেই মন্দিরে নিত্য নূতন পুষ্প চয়ন করিয়া তোমাদের প্রাণের অর্ঘ্য প্রদান করিও। জানিও, পুষ্পের সৌরভের মাঝেই এই মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, আর এই পুষ্পার্ঘ্য প্রদানেই তোমাদের ছেলেখেলার সার্থকতা। সাবধান, মন্দিরকে সতত সৌরভ-সমাকুল রাখিতে ভুলিও না, তাহা হইলে তোমাদের খেলাঘর ডাইনী আসিয়া অধিকার করিবে,—তোমাদের বাল-প্রাণের আনন্দ-নির্ঝরগুলি বিশুষ্ক হইয়া যাইবে।"

পিতৃ আদেশ যথাযথ পালিত হইল। পুষ্পোদ্যান পরিবেষ্টিত মন্দির-অঙ্গন শিশু কণ্ঠের চপল হাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। পুষ্পের চয়ন হইল। রাশি রাশি পুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া মন্দির-তল নানা বর্ণ সমাবিষ্ট কুসুম-শয্যায় পরিণত হইল, রাশীকৃত ফুলের সৌরভে বায়ু ভারাক্রান্ত হইল, এমনি চলিল প্রতিনিয়ত বাল-প্রাণের পুষ্পার্ঘ্য। পুষ্পের সুষমালিপ্ত মন্দির সৌরভ-স্নাত হইয়া ভাবাবেশে তন্ময় যোগীর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল।

বহু যুগ অতীত হইল। পুষ্পোদ্যানময় ভ্রমরের রঙ্গীন পাখার নর্ত্তন সন্তানগণকে মুগ্ধ করিল। তাহারা ছুটিয়া চলিল ভ্রমরের রঙ্গিমার পিছনে পিছনে, পুষ্পোদ্যানের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত ভ্রমের বিধৃতির ব্যর্থ চেষ্টায়, ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে ক্লান্তি যখন দেহকে অচ্ছিন্ন করিল তখন তাহারা মন্দিরাঙ্গনে নিরানন্দের ছায়াতলে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, তাহাদের অনুপস্থিতির ফাঁক দিয়া ডাইনী আসিয়া মন্দির অধিকার করিয়াছে, সুতরাং সেখানে তাহাদের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু এই মন্দিরে যে যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে,—ইহার সহিত যে তাহাদের প্রাণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। চোখ ফাটিয়া কান্না আসিল, কিন্তু উপায় ত আর নাই। অর্ঘ্যের ডালা সজ্জিত করিবার জন্য উদ্যানে বহির্গত হইয়া দেখিল পুষ্প সব ঝরিয়া পড়িয়াছে, গাছগুলি ম্রিয়মাণ। সমস্ত উদ্যান ব্যাপিয়া আগাছার আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়াছে।—অর্ঘ্যের ডালা মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। পুষ্পোদ্যানের হাস্যময় মাধুর্য্য শ্মশানের ভীতিসমাকুল দৃশ্যে পরিণত হইল। শ্মশানের এই নীরসতার মাঝে সন্তান প্রাণের আনন্দ-নির্ঝরগুলি বিশুষ্ক হইয়া গেল। সন্তানগণের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে করুণ রোদন-ধ্বনি

বহির্গত হইয়া আকাশ ব্যাপ্ত করিল। আলোককে অন্তরাল কবিয়া আঁধার ঘনীভূত হইল, সেই আঁধাবের বক্ষে সজাগ থাকিল শুধু সন্তান প্রাণেব করুণ কাতব আর্ত্তনাদের ক্ষীণ ধ্বনি।

সহসা ঊষাব কনক-হাস্যের আভায় জগৎ বঞ্জিত কবিযা আলোব মূর্ত্ত বিগ্রহেব মত কে এক নূতন সন্তান পুষ্পোদ্যানেব আবর্জ্জনা-স্তূপেব মস্তকে দণ্ডায়মান্ হইল। আঁধাবেব পক্ষ ধবিয়া ডাইনী পালাইল। সন্তানের দীপ্তিব আলোকচ্ছটায় উদ্যানেব আবর্জ্জনা-স্তূপ ভস্মীভূত হইল। আলোব নর্ত্তনেব কম্পনে দুলিত হইযা ফটিযা উঠিল সহস্র পুষ্প উদ্যান সমীরকে সৌরভ সমাকুল কবিযা। তাবপব মন্দিব পূর্ণ কবিয়া রাশি বাশি পুষ্পের অর্ঘ্য নিবেদিত হইতে লাগিল,—মন্দিব-বায়ু সৌরভ ভাবাক্রান্ত হইল। সন্তানগণ এই নব সন্তানেব অনুকবণে বহুযুগ পর নব উষাব সঙ্গে সঙ্গে নবীন প্রাণেব নূতন অর্ঘ্য প্রদান কবিল। তাহাদেব এই অর্ঘ্য দানেব ফাঁক দিযা বাশিকৃত পুষ্পেব অন্তবালে নব সন্তান উজ্জ্বল হইল।—কেহই বুঝিল না কে এ, নবালোকেব বঙ্গীন রথে অবতীর্ণ হইযা আঁধাব দূর কবিল, মন্দিব মুক্ত কবিল, পুষ্পোদ্যানেব মলিনতাকে সজীবতায পবিবর্ত্তিত কবিল।

আবাব কুসুমেব হাস্য-বঞ্জিত হইযা সন্তানেব ছেলেখেলা চলিতে লাগিল। অর্ঘ্যে অর্ঘ্যে পূর্ণ হইযা মন্দিব-তল কোমল কুসুমের সজীবতায়, হাস্যে, বর্ণে, সৌবভে, আবেশময ফুলশয্যায পবিণত হইল।—সন্তান-প্রাণেব আনন্দ-উৎসগুলি লহবে, লহরে ফেনিল হইযা উঠিল।

হেমন্তেব শেষ তোরণ উত্তীর্ণ হইযা জগৎ তখন শীতের প্রবেশ-দ্বাবে আসিয়া দাঁড়াইল। কি এক অস্বচ্ছন্দতাব স্রোত সন্তান-প্রাণেব পবতে পবতে নাচিয়া চলিল। শীতের কুহেলিকায উদ্যান আচ্ছন্ন হইল, মন্দির পবিব্যাপ্ত হইল, সন্তানেব ছেলেখেলা আড়ষ্ট হইয়া থামিযা গেল। কুয়াসাব ফাঁকে ফাঁকে ডাইনীব তাণ্ডব অট্টহাস্য গর্জ্জিয়া উঠিল,—কুহেলিকার অন্তবালে মন্দিব বিলুপ্তপ্রায় হইল। শীতেব দংশনে পুষ্পোদ্যান বিশীর্ণ হইল, ফুল পাতা ঝরিয়া পড়িল। শীতেব শৈত্য-স্রোতের মাঝে সন্তান-প্রাণ আড়ষ্ট বহিল যতক্ষণ ততক্ষণ কুয়াসা গাঢ় হইতে লাগিল।

শেষে সেই গাঢ় কুয়াসা ভেদ করিয়া সন্তান-প্রাণের চাঞ্চল্য পিতার চরণ স্পর্শ করিল কি না কে জানে ?

শীতের কুয়াসা ভেদ করিয়া আবার আলোকরশ্মি ফুটিয়া উঠিল। আবার সেই আলোক-মূর্ত্তি উদ্যান-কুহেলিকার মাঝে দাঁড়াইয়া বলিল, "সন্তানগণ। শীতের বর্ম্মে আত্মগোপন করিয়া নবযুগ আসিয়া তোমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছে, তাই তোমাদের উদ্যানের বহু পুরাতন পুষ্পের অর্ঘ্য ব্যর্থ করিয়া কুয়াসা মন্দির আচ্ছাদিত করিয়াছে—উদ্যান-বৃক্ষ নিচয় ম্রিয়মাণ হইয়াছে—কুহেলীর ফাঁকে ফাঁকে ডাইনী রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। উদ্যানের পুরাণো গাছগুলি বিনষ্ট করিয়া শীতের দৌরাত্ম্যসহ নবীন পুষ্পবৃক্ষে উদ্যান ব্যাপ্ত করিতে হইবে। তোমাদের পুরাণো উদ্যানে নবীন পুষ্প চয়ন করিয়া পুরাণো মন্দিরে প্রাণের অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে।"

দেখিতে দেখিতে মন্দির কুয়াসামুক্ত হইয়া নবীন আলোয় হাসিয়া উঠিল, আলোকিত পুষ্পোদ্যানে পুরাতন বিশীর্ণ বৃক্ষের সমাধি-ভূমিতে নবীন পুষ্পবৃক্ষনিচয় নূতন পুষ্পরাজি দোলাইয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইল।

আলোক-রথ ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল। সন্তানের শতেক কণ্ঠ এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"হে আলোর মূর্ত্ত বিগ্রহ। বল তুমি কে,—বার বার আমাদের খেলাঘরে আসিয়া আমাদের নিরানন্দ ক্রন্দনকে হাস্যের চাপল্যে নিমজ্জিত করিতেছ, পুষ্পোদ্যানের বিশীর্ণতাকে বাসন্তী ফুল-সজ্জায় সজ্জিত করিতেছ, বাল-ভীতি ডাইনীকে বিতাড়িত করিতেছ, আঁধারের মস্তকে তুলিকাঘাত করিয়া আলোর অভিব্যঞ্জনকে আঁকিয়া দিতেছ ? কে তুমি হে আলোর দুলাল, আমাদের খেলাঘরের পুনঃ পুনঃ জীর্ণের সংস্কারক ?"

আলোক-রথ শূন্যে নীমিলিত হইল। মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে, উদ্যানের প্রতি পত্র প্রতি পুষ্প হইতে, হাস্যময় আলোর স্রোত হইতে, সমীরের প্রতি স্বর হইতে, আলো-বাতাসের স্পন্দন-সম্ভূত বিদ্যুৎতরঙ্গের প্রতি কম্পন হইতে এক সঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিল—

—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"—

স্তম্ভিত সন্তানগণ এইবার চিনিল কে এ, আলোর জ্যোতির্ম্ময় রথে যাহার আনাগোনা। এ যে তাহাদের বহুযুগের অদর্শনে বিস্মৃতপ্রায় পিতা—এ যে জগৎপিতা! সন্তানের বেশে—বালকের বেশে—বালকের খেলাঘরে এ যে পিতার অবতরণ—খেলাঘরের ধূলিমলিনতাকে বিদূরিত করিবার জন্য,—খেলাঘরের দৈন্যকে গৌরবময় করিবার জন্য।

আবেগময় সন্তান-প্রাণ বলিয়া উঠিল,—'হে পিতঃ! তোমার উপদেশবিস্মৃত—আমরা ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়া শুষ্ক প্রাণে দণ্ডায়মান ছিলাম; তুমিই বার বার আমাদের ধূলাখেলার মাঝে আবির্ভূত হইয়া আমাদের ভিতর জীবনের সরলতা আনয়ন করিয়াছ—নবযুগের নবীনতা প্রতিফলিত করিয়াছ,—জীবনময় আমাদের বাল-প্রাণের সহর্ষ আনন্দকে মরণময় ক্রন্দনের বিষাদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আজ তোমাকে চিনিয়াছি। এই নবযুগের প্রভাতে উন্মুক্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান হইয়া, হে পিতঃ! তোমার পদে কোটী কোটী প্রণিপাত।

'জগদীশ্বর! জগতের পরিবিপর্য্যয়ের উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে শৃঙ্খলার আসন বিস্তার করিতে এ যে তোমারি অবতরণ। যতবার জগতে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছে, যতবার ধর্ম্ম ভ্রান্তিময় কুসংস্কারের লৌহজালে আবদ্ধ হইয়াছে, তত বারই তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়াছ।—সমস্ত জটিলতার উদর হইতে শাশ্বত সনাতন সত্যকে মুক্ত করিয়াছ।—মানবের জীবন-উদ্যানে ভোগ-ভ্রমর প্রবিষ্ট হইল। বিবেক-কুসুমকে উপেক্ষা করিয়া মানব ভোগ-ভ্রমরের পশ্চাতে ধাবিত হইল—ভোগের সুদৃঢ় নিগড়ে শৃঙ্খলিত হইল। ভোগ-ভ্রমরের রঙ্গীন পাখার বাহ্য রমণীয়তার পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া মানবের মনে অশান্তির, অস্বচ্ছন্দতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল—অভাবের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াও তাহার মন কেবলি নূতন অভাবের সৃষ্টি করিতে লাগিল, আর তাহা পূরণের জন্য অশান্তভাবে কেবলি ছুটাছুটী করিতে লাগিল। ভ্রমর ধৃত হইল না,—অভাব সমাপ্ত করিয়া ভোগের পরিণতি আবিষ্কৃত হইল না, তাই মানব সাফল্যহীনতার লজ্জার উপহাস মস্তকে বহিয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ভোগের পশ্চাদ্ধাবনের এই সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া ধর্ম্ম-মন্দিরে

জীবন-উদ্যানের উর্ব্বরতায় লালিত বিবেক-পুষ্পের অর্ঘ্য প্রদত্ত হয় নাই। তাই মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে মরণের অন্ধ ছায়া ঘনাইয়া আসিল,—পাপ-ডাইনীর বিকট অট্টহাস্যে মন্দির প্রকম্পিত হইতে লাগিল,—জীবন-উদ্যানে মরণ-আগাছার আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইল। ধর্ম্মের সজীবতাকে পাপের মলিনতা আসিয়া গ্রাস করিল।—মানবের বাহিরে ভিতরে অশান্তির, অস্বচ্ছন্দতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই অশান্তিকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিতে মানবের মন ব্যাকুল হইল—তাহার মনে প্রবল ইচ্ছার বান ডাকিল। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির হস্ত ধরিয়া, হে জগৎপতি! তুমি মানবের দ্বারে মানবশিশুরূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া নির্জ্জীব পাপকে জীবনের সজীবতার অন্তরাল করিলে, ভোগের নিগড় হইতে মানবকে মুক্ত করিলে, ধর্ম্মকে জীবনময় করিয়া মরণের সহস্র জড় অভিনয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিলে।

'সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই জগতের গতি চিরপ্রবহমান। জগৎ অবিরাম পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে একদিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হইল যে তখন পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনকে বরণ না করিলে জীবন ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। শীতের শৈত্য ও কুয়াসার অত্যাচারে পুষ্পোদ্যান যেমন বিশীর্ণ হইয়া যায় তেমনি নবযুগের দ্বার দেশে আসিয়া মানবের জীবনও পঙ্গু হইয়া গেল। জীবনের স্তরে স্তরে মরণের ছায়া বিন্যস্ত হইল। জীবন যাহার পঙ্গু, ধর্ম্মও তাহার আড়ষ্ট, সুতরাং ধর্ম্ম-মন্দিরও অধর্ম্মের বা তথাকথিত ধর্ম্মের অশেষ জালে আচ্ছন্ন হইল। পুরাতনের অন্ধ অনুশীলনে জীবন আরও ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, ধর্ম্ম আরও জটিল হইতে লাগিল, সুতরাং মানব নবযুগের অনুমোদিত নূতন পন্থা উদ্ভাবনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই চাঞ্চল্যের বক্ষে আরোহণ করিয়া, হে জগদীশ্বর! তুমি মানববেশে আবার মানবের ভিতর অবতীর্ণ হইলে। শীতের প্রকোপ হইতে উদ্যানকে রক্ষা করিতে গিয়া গ্রীষ্মোপযোগী গাছগুলিকে বিনষ্ট করিয়া শীতের শৈত্যানুমোদিত বৃক্ষে বাগান পরিশোভিত করিলে—পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া নবযুগের নবীন পদ্ধতিতে জীবন গড়িয়া তুলিলে, ধর্ম্মের জীর্ণ সংস্কার করিলে। আবার জীবনের সজীবতায়, ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে মানব মহীয়ান্

হইয়া উঠিল, নবযুগের নবীন কর্ম্মস্রোত জগৎ প্লাবিত করিয়া ধাবিত হইল।

'নবযুগ আসিয়াছে। নবযুগের নবীন মন্ত্র মানব-মনে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনকে বরণ করিবার সময় উপস্থিত। নবযুগের বার্ত্তাবাহী, হে ভগবান্! নবযুগের কর্ম্মনিয়ামক হে জগদীশ্বর! পুরাতনের সমস্ত আবর্জ্জনাকে ভস্মীভূত করিয়া নূতনের সজীব বক্ষে জীবন-উদ্যান পরিশোভিত কর। যাহা পুরাতন, যাহা মিথ্যা, যাহা জটিল, যাহা ভ্রান্ত তাহা দূরে পলায়ন করুক,—জাগিয়া উঠুক যাহা চির নূতন, যাহা সত্য, যাহা সরল, যাহা শাশ্বত। আত্মার গ্লানি আজ দূরীভূত হউক, সত্য, শিব এবং সুন্দরের অভিব্যঞ্জন আত্মাতে প্রতিফলিত হউক। —মানবত্বের বিশাল গৌরব গগন স্পর্শ করুক।'

এই নবযুগের প্রারম্ভে এক ভাবের সন্ধ্যা, অন্য ভাবের উষা, এক ভাবের আদি, অন্য ভাবের অন্ত, এক দিকে বোধন, অন্য দিকে বিসর্জ্জন, এক দিকে ভাঙ্গিবার পালা, অন্য দিকে গঠন সুরু। এই ভাঙ্গাগড়ার প্রবল সংঘর্ষের সঙ্ঘাতেই মানব-জীবন সচল হইবে, মানব-জীবন সজীব হইবে, মানব-জীবন বিকশিত হইবে। এই ভাঙ্গা-গড়ার মাঝেই তরঙ্গায়িত জীবনের প্রতি তরঙ্গের লীলাচাতুর্য্য ও ঘাত-প্রতিঘাতের অবিরাম ক্রীড়া চলিবে। ঐ পুরাতন যুগ কান্নার বোঝা বক্ষে চাপিয়া কালের আকাশে অস্ত যাইতেছে, আর ঐ হাসির হৈম কিরণে রঞ্জিত হইয়া নবযুগ উদিত হইতেছে। এক দিকে হাসি, অন্য দিকে ক্রন্দন। এই হাসি-কান্নার সুরের গানেই হে নবযুগের মহাপুরুষ! জগৎ তোমায় বরণ করিয়া লইবে। কাঁদিবে মরণময় ভ্রান্ত পুরাতনের আবর্জ্জনা রাশি, হাসিবে সজীব সরস নূতনের শাশ্বত সত্যের আলোকরাশি। হে যুগাবতার! আজ হাসি-কান্নার সন্ধিস্থলে তোমার বরণডালা সজ্জিত হইয়াছে। একদিকে পুরাতনের ক্রন্দন, অন্য দিকে নূতনের গৌরবময় হাস্য। বিসর্জ্জনের মাঝেই বোধনের কাঁশি ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, মরণের পাশেই জীবনের বাণী গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে,—ক্রন্দনের বক্ষ হইতেই হাস্যময় বোধনের সুর উত্থিত হইয়াছে। নবযুগের কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের প্রবল নর্ত্তনে জলধি

উদ্বেলিত, জগৎ শিহরিত, তারি পাশে পুরাতনের সুককণ বিসর্জ্জন-বিলাপ।—

—করুণ-রোদন-ধ্বনিত-সর্ব্ব,
শিহরিছে ধরা, বিশাল গর্ব্ব
শূন্যে তুলিছে শির,
অশ্রু-কণিকা-সিক্ত-পরাণ—
গাহিছে উচ্চে বন্দনা গান,
ধ্বনিত জলধি স্থির।।—

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

(২)

আমরা 'হিন্দু'। 'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে 'সিন্ধু' থেকে। সিন্ধু-নদের পূর্ব্বপারে যে আর্য্যেরা বাস কর্ত্তেন প্রাচীন পারসীকেরা তাঁদের হিন্দু বল্‌তেন—কারণ তাঁরা 'স এর স্থলে 'হ' উচ্চারণ কর্ত্তেন। জেন্দাবেস্তা নামক তাঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে 'সরস্বতী' নদীর স্থলে 'হরখতী' দেখা যায়। ইদানীং পূর্ব্ববঙ্গেও 'স' স্থলে 'হ' এর প্রয়োগ দেখা যায়। সেই হেতু আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় নাম বিদেশী এবং উচ্চারণ বৈকল্য হইতে উৎপত্তি। আমাদের প্রকৃত জাতীয় নাম হওয়া দরকার 'বৈদিক' বা 'বৈদান্তিক'। কারণ 'হিন্দু' বলতে যাদের বোঝায় তাদের সকলেই এই 'বেদ' নামক অক্ষর জ্ঞানরাশি সম্পন্ন পুস্তককে মানে, কিন্তু হিন্দু শব্দের শব্দগত মানে ধরলে শুধু হিন্দুদের বুঝায় না খৃষ্টান, পারসী, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলকেই বুঝায়। সেই হেতু ভারতবাসীর জাতীয় নাম হিন্দু হইতে পারে কিন্তু ভারত প্রসূত এই বিরাট ধর্ম্মের নাম বৈদিক

---

* উদ্ধৃত অংশগুলি ভারতে বিবেকানন্দ—জাফনায় বক্তৃতা—বেদান্ত হইতে গৃহীত।

বা বৈদান্তিক হওয়াই প্রয়োজন। "জগতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্ম্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা অন্য কোন অতি প্রাকৃত পুরুষ বিশেষের বাক্য সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি। পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদিগের বেদই প্রাচীনতম। অতএব বেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা আবশ্যক।

প্রত্যেক ধর্ম্ম কোনও না কোনও অতিমানবের ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি কোনও ক্রমে সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যায় তাহ'লেই সেই ধর্ম্ম-মন্দির একেবারে ভূমিস্মাৎ—যেমন খৃষ্ট ধর্ম্ম। যেই প্রত্ন-তত্ত্ব-বিদেরা খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম, Neo-Platonism প্রভৃতি মতবাদ হ'তে নির্দ্দেশ কর্‌লেন, তখনই সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মনে একটা মস্ত সন্দেহের ছায়া ঘনান্ধকারের মত ছেয়ে ফেল্‌লে এবং শ্রীভগবানের অবতার খৃষ্টের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও মহা সন্দিহান হয়ে উঠল এবং নবীন জড় বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপটা একটা নাস্তিকদের মস্ত দুর্গ হ'য়ে উঠল। কিন্তু আমাদের ভারতীয় ধর্ম্ম সে রকম নয়।

"বেদ নামক শব্দরাশি পুরুষ মুখ নিঃসৃত নহে। উহার সন তারিখ এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কখনও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। আর আমাদের হিন্দুদের মতে, বেদ অনাদি অনন্ত। একটি বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বর নামক ব্যক্তির অথবা ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায়, হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃ প্রমাণ, কারণ, বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনই লিখিত হয় নাই, উহা কখনই সৃষ্ট হয় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। বেদ অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি (বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা)। বেদান্ত নামক জ্ঞানরাশি ঋষি নামধেয় পুরুষ সমূহের দ্বারা আবিষ্কৃত।

ঋষির অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন অথবা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ভাবরাশির দ্রষ্টা মাত্র, ঐ ভাবরাশি, অনন্তকাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল। ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্ত্তা।"

এই বেদ দু ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে আর্য্যদের আজীবন নিত্য, নৈমিত্তিক, স্বর্গ-পুত্র বিত্তদায়ক যজ্ঞ প্রণালী, সামাজিক জীবনের বিধি নিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে। আর জ্ঞানকাণ্ডে আছে, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, দয়া, নিত্য, লীলা, ঈশ্বর, আত্মা ব্রহ্ম, পুনর্জন্ম, ক্রমবিকাশ, ক্রমসঙ্কোচ, সমন্বয় প্রভৃতি চিরন্তন সত্য-সকল, যাহা সকল যুগ বিপর্য্যয়ের মধ্যে অটুট ভাবে বর্ত্তমান। পৃথিবীতে যে সব বড় বড় ধর্ম্মমত আবিষ্কৃত হয়েছে তা সব এই জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্তের সার্ব্বজনীন মহাসত্য সকলকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। আজকাল যে নবীন জড়বিজ্ঞান যা সকল ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত কচ্চে সেও এই বেদান্ত ধর্ম্মেরই মূল সত্যগুলি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা কচ্চে। পক্ষান্তরে অপর ধর্ম্মসকলের স্থায়িত্ব এবং প্রাণ এই বেদান্তেই নিহিত। জেন্দা-বেস্তা, পুরাণ, স্মৃতি, ত্রিপিটক, বাইবেল, তন্ত্র, কোরাণ, প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র বাঁচতে পারে যদি তারা নিজেদের হৃদয় এবং মস্তিষ্ক বেদান্তের আলোতে আলোকিত করে।

কর্ম্মকাণ্ড চিরকালই পরিবর্ত্তিত হবে। বেদের সময়কার বিধি নিষেধ আচার ব্যবহার তৎপরবর্ত্তী যুগে বদ্‌লে গিয়েছিল। তার প্রমাণ মন্বাদি কুড়ি খানি স্মৃতি সংহিতা। প্রত্যেক সংহিতা খানির বিধি নিষেধ অপরের বিরোধী। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাদ্বয়ের মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয় তাও আবার বিভিন্নাংশ বিভিন্ন দেশে প্রতাপশালী। ইদানীংকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন জীমূতবাহনাদিরা নিজেদের প্রবর্ত্তিত বিধি নিষেধ দৃঢ় করবার জন্য সে সকল শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত

করেছেন তার বিরোধী শাস্ত্র বাক্য সকলও উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্ত বা উপনিষদ্ আবিষ্কৃত সত্যসকল চির কালই সমানভাবে জগতের সকল চিন্তাশীল মস্তিষ্ক অধিকার করে নিজ মহিমায় উজ্জ্বল রয়েছে। তাই "বেদান্তের পরই স্মৃতির (ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি) প্রামাণ্য। এগুলিও ঋষিলিখিত গ্রন্থ, কিন্তু এগুলির প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। কারণ, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের শাস্ত্র যেরূপ, আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে বিশেষ বিশেষ ঋষিমুনি এই সকল স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন, এই অর্থে অন্যান্য ধর্ম্মের শাস্ত্র সমূহের প্রামাণ্য যেরূপ স্মৃতির প্রামাণ্যও তদ্রূপ, তবে স্মৃতিই আমাদের চরম প্রমাণ নহে। স্মৃতির কোন অংশ যদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার কোন প্রামাণ্য থাকিবে না। আবার এই সকল স্মৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি, সত্যযুগে এই এই স্মৃতির প্রামাণ্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিতে আবার অন্যান্য স্মৃতির প্রামাণ্য। দেশকাল পাত্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলিয়া সময়ে সময়ে উহাদেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।" পুরাকালেও যেমন দেশ নায়ক ব্রাহ্মণেরা দেশকাল পাত্রানুযায়ী স্মৃতি রচনা করে এই বিরাট হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা সাধন করেছেন এ যুগেও যদি তাঁরা তাঁদের পিতৃ পুরুষদের মত কৃতিত্ব না দেখাতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে মুমূর্ষু জীবের প্রতি যেমন শকুনি উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে সেইরূপ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে সর্ব্বনাশ অতি নিকটেই এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের মৃত্যু প্রতীক্ষা করচে।

দেশনায়ক ব্রাহ্মণেরা অধিকারবাদকে উপলক্ষ করে শাস্ত্রের মহৎ তত্ত্ব সকল লুকিয়ে রেখে দেশে ছড়ালেন যত স্ত্রীআচার, কুলাচার আর দেশাচার। ফলে হয়ে উঠল এই দেশটা একটা মস্ত কুসংস্কারীদের ডিপো। মহিমোজ্জ্বল-আত্মবাদীদের দেশে তথাকথিত কতকগুলি ধর্ম্ম ধ্বজীর সৃষ্টি হ'ল যাঁরা নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য ধর্ম্মজ্ঞান বিরোহিত পশুপ্রায় এক বিরাট শূদ্র সমাজের সৃজন করে রাখলেন—

যে কর্ম্মের ফল ভোগ আমরা হাজার বছর ধরে করচি। সন্ন্যাসী যত বড়ই দোষী হউক না কেন তারাই পুনঃ পুনঃ কুসংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে ধর্ম্মের বন্যা এনে সকল দীন হীন নিম্ন হৃদয় ধুয়ে পবিত্র করবার চেষ্টা করেছে। প্রমাণ—বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য, কবির প্রভৃতি; আবার বর্ত্তমান যুগের প্রেমিক সন্ন্যাসী আপামর সাধারণে বিতরণ করচেন বেদের সেই মহতী বানী যে "জীবাত্মা সকল অনাদি অনন্ত—তাহারা স্বরূপতঃ অবিনাশী। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক আত্মার সর্ব্ববিধ শক্তি, আনন্দ, পবিত্রতা, সর্ব্বব্যাপীতা ও সর্ব্বজ্ঞত্ব রহিয়াছে।" সকল দৈন্য, নিষ্ফলতা প্রসূত হিংসা দ্বেষ দূর করে নিরুৎসাহী হতাশ হৃদয়ে প্রীতির আসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বলচেন "এই গুরুতর তত্বটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আত্মায় আত্মায় ভেদ নাই—কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমার ও ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে—স্বরূপতঃ তাহার সহিত আমার কোন ভেদ নাই, সে আমার ভ্রাতা, তাহারও যে আত্মা, আমারও তাহাই। ভারত এই মহত্তম তত্ত্ব জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছে। অন্যান্য দেশে সমগ্র মানবের ভ্রাতৃভাব তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া থাকে—ভারতে উহা সর্ব্ব প্রাণীর ভ্রাতৃভাব এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি, ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ পর্য্যন্ত আমার ভাই—তাহারা আমার দেহস্বরূপ। 'এবং তু পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্' ইত্যাদি। এইরূপে পণ্ডিতগণ সেই প্রভুকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে উপাসনা করেন। সেই কারণেই ভারতে তির্য্যগ্জাতি ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্ত্তমান, সকল বস্তু সম্বন্ধেই, সকল বিষয়েই ঐ দয়ার ভাব। আত্মার সমুদয় শক্তি বর্ত্তমান, এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলন ভূমি।"

আর আজকাল যে একটা সাম্যের ঝড় উঠেছে যা সমাজের মধ্যে বড় বলে কোন জিনিষ রাখ্‌তে চায় না—সব ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে একটা সমভূম সমাজের সৃষ্টি করতে চায়। এই অতি-সাম্য বাদীদের ভাঙবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে কিন্তু গড়বার ক্ষমতা নেই। কারণ সমাজ সৌধ নির্ম্মাণ করতে হ'লে যে প্রীতির মসলার প্রয়োজন

তার সন্ধান তাঁরা জানেন না—মেরে কেটে ইট কাট জোগাড় হ'তে পারে। বিভিন্ন জাতি বা ব্যক্তিকে অস্ত্রবলে এক করা যেতে পারে কিন্তু গড়বার মসলা যে প্রেমনীতির প্রয়োজন তার আকর কোথায় সেদিকে কারু নজর নেই। তাই আচার্য্য বিশ্বকে আহ্বান করে বলে দিচ্চেন "নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদই সর্ব্বপ্রকার নীতি বিজ্ঞানের ভিত্তি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—মনুষ্য জাতিকে আত্মতুল্য ভালবাসিবে। ভারতবর্ষে আবার মনুষ্য ও ইতর জাতিতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, প্রাণী নির্ব্বিশেষে সকলকেই আত্মতুল্য প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আবার প্রাণীবর্গকে আত্মতুল্য ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে একমাত্র সমর্থ। যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ড স্বরূপ জানিলে, তখনই তুমি জানিতে পারিলে, অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল।"

বহু বর্ষের দাসত্বের ফলে আমরা অতি হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছি, কোন একটা মহৎ কায করতে গেলেই আমাদের সামনে একটা ভীতি এসে দাঁড়ায় আর নানা বিভীষিকার সৃষ্টি করে কর্ত্তব্যের পথ থেকে পালাবার যুক্তি দেয়। সকল কার্য্যের প্রথমেই এসে দাড়ায় মৃত্যুভয় আর এর কারণ হচ্চে বেদান্ত প্রতিপাদিত আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। বেদান্ত বলেন "ভয়? কার ভয়? আমি প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তু মাত্র।" বেদান্ত প্রতিপাদিত এই আত্মবিচার এই আত্মধ্যান অভ্যাস করলে আসবে সেই সকল মহত্ত্বের মূলীভূত মহাশক্তি মহাবীর্য্য। যদি আমরা বসে বসে নিজেদের অপদার্থ, হতভাগা, দুর্ব্বল, পাপী, অপবিত্র বলে ভাবি তাহ'লে আমরা তাই হয়ে যাব। "অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু আপনাকে তেজস্বী, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়।" যে শাস্ত্র বা ব্যক্তি অপরকে পাপী, ছোট, অস্পৃশ্য বলে সেই দেহাত্মবাদী শাস্ত্র বা গুরু প্রকৃত-পক্ষে অন্তর্যামী আত্মাকেই গালাগালি করচে বুঝতে হবে—সেই দেহাভি-

মানী নাস্তিকদের কথা শোনবার আমাদের আর এখন অবসর নেই। আমাদের এখন প্রথম কর্ত্তব্য আচার্য্যের এই সত্য উপদেশ প্রতিপালন করা "অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্ব্বলতা, কোনরূপ অনুষ্ঠানপদ্ধতি শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক; সাহসী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বংসহ হউক।" এই সকল গুণ সম্পন্ন হ'তে হ'লে আমাদের বেদান্তকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'বে কারণ কেবল বেদান্ত নামধেয় একমাত্র শাস্ত্রেই মহিমাময় আত্মার জয় উচ্চারণ করা হয়েছে। "বেদান্তেই কেবল সেই মহান্ তত্ত্ব নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের ভাবরাশিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।"

আর একটা ব্যাপার নিয়ে ধর্ম্মরাজ্যে বরাবর লাঠালাঠি চলে আসচে কেষ্ট বড না কালী বড়, সগুণ উপাসনা বড় না নির্গুণ উপাসনা বড়, প্রতীকের মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিৎ কি ভাবের মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু বেদান্ত বলচেন "ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। * * * বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধনা প্রণালীর প্রয়োজন।" ইষ্ট নিষ্ঠা মানে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী পথে দৃঢ় থাকা আর অপর পথগুলোকে বিভিন্ন রাস্তা মনে করে শ্রদ্ধা করা। Tolerationএর দোহাই দিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা নয়। যাঁরা মনে করেন যে তাঁদের মতটাই সব—আর সব জাহান্নামে যাক—তাঁরা Iconoclastsদের (কালাপাহাড়) রূপান্তর মাত্র। "যদি কখন পৃথিবীর সর্ব্বলোক এক ধর্ম্ম মতাবলম্বী হইয়া এক পথে চলে, তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তা শক্তি ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব একেবারে বিনষ্ট হইবে। ভেদই আমাদের জীবন যাত্রার মূলমন্ত্র। সম্পূর্ণরূপে ভেদ চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। * * * যাহারা ঈশ্বরলাভোদ্দেশে বিভিন্নপথাবলম্বী ভ্রাতৃদিগের বিনাশ সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের মুখে প্রেমের কথা বড়ই অসঙ্গত ও অশোভন। তাহাদের প্রেমের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অপরে অন্য পথের অনুসরণ করিতেছে সে ইহা সহ্য করিতে পারে না, সে আবার

প্রেমের কথা বলে। যদি ইহাই প্রেম হয়, তবে আর দ্বেষ কি ?” আমরা এতকাল জান্‌তাম না যে একই ভগবান্ বাণী এবং চরিত্রের দ্বারা উন্নত করবার জন্য যুগভেদে, দেশভেদে আধারভেদে নানা অবতার হয়ে নানা ধর্ম্ম দান করচেন। কোন একটি ধর্ম্মকে গালাগালি দেওয়া মানে ঈশ্বর কর্ম্মকে গালি দেওয়া। “যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবাদ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি ঈশ্বর পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ। তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ, ক্রমশঃ পশুপদবীতে উপনীত হইতেছ।”

হিন্দু যতবড়ই অত্যাচারী হ’ক না কেন সে সদর্পে বলতে পারে যে সে কখনও বিষ, অস্ত্র, আগুন দিয়ে পরাজিত জাতির সর্ব্বনাশ করে নি। সে শূদ্রকে নিম্ন স্তরে স্থান দিতে পারে ঘৃণা করতে পারে কিন্তু তাদের কখনও জগৎ হতে মুছে ফেলে নি। “আমাদের ধর্ম্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কোলে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলি ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট আপাততঃ বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।” কিন্তু কালকের শিশু তুমি হঠাৎ একটা চক্‌মকে বাড়ি দেখে এসে যদি বল, পুরীর মন্দির ভেঙে দেও—ও পুরনো ও সেকেলে, নতুন করে ঐ চক্‌মকে বাড়িটার মত করে গড—তখন কি তাই শুনতে হ’বে না হেঁসে বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে কোলে করে নেবেন। সমাজ সংস্কারকদের উপদেশ শুনে স্বামীজি বলেছেন “এক্ষণে আমার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে। এক সময়ে আমি ঐগুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐগুলির কোনটীর বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐগুলি গঠিত হইয়াছে। * * * তোমরা দুদিন একটা ভাব ধরিয়া থাকিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও, ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন। বুদ্‌বুদের ন্যায় তোমাদের উৎপত্তি,

বুদ্বুদের ন্যায় নয়। অগ্রে আমাদের ন্যায় স্থায়ী সমাজ গঠন কর। প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্ত্তন কর, যাহাদের শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। তখন তোমাদের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার সময় হইবে, কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা বালক মাত্র।"

এখন এমন একটা সময় এসেছে যে কেবল বক্তৃতা দিলে বা শুনলে চলবে না। ছোট স্কুলের ছেলে, তোতাপাখী, প্রতিধ্বনি, গ্রামোফন, এরাও ত যা শোনে বা পায় তারই প্রতিশব্দ করে। এতে ফল কি? স্বামীজি বলচেন "আমি এক্ষণে বর্ত্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন কয়েকটী কথা তোমাদিগকে বলিব। মহাভারতকার বেদব্যাসের জয় হউক, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম। অন্যান্য যুগে যে সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা এখন আর চলিবে না।" কিন্তু আচার্য্য ব্যাসের দান-ধর্ম্মের প্রাণ ছিল দাতা ও গৃহীতায়, আর আচার্য্য বিবেকানন্দের দানধর্ম্ম বিশ্বদেবের পূজায় সমাপ্ত, এর প্রাণ হচ্চে সেব্য ও সেবক। কারণ দেহাভিমানী সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পরমাত্মার সেবা করতে হ'বে অন্নদানের দ্বারা, প্রাণদানের দ্বারা, বিদ্যা দানের দ্বারা এবং ধর্ম্ম দানের দ্বারা। আচার্য্য আর এক মহান্ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করেছেন, "যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয় ও মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তারত্নগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ সকল তত্ত্ব আবার শুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে, তাহা নহে, সমগ্র জগতে উহা ছড়াইতে হইবে। ইহাই আমাদের এক শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।" আর আমাদের সকল কর্ত্তব্য পথে মহা অন্তরায় যা তাও নির্দ্দেশ করচেন "সর্ব্বোপরি আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হায়, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইতেছি! আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের হিংসা করিতেছি। অমুক আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন হইল—আমি কেন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলাম না—অহরহ আমাদের এই চিন্তা। এমন কি, ধর্ম্মকর্ম্মেও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের

অভিলাষী—আমরা এমন ঈর্ষার দাস হইয়াছি। ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভাবতে কোন প্রবল পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষ্যাপরায়ণতা। সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহ প্রস্তুত নহে। প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্ব্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হইতে পারিবে।"

যোগমায়া।

(শ্রীসাহাজি)

শঙ্কর আর বুদ্ধের মতে, রাক্ষসী এই মায়া।
গ্রাস করেছেন হায় রে। একা, নিখিল জগৎ কায়া॥
শঙ্কর মতে সাধনা করিনু, বুদ্ধের নিনু দীক্ষা।
নিত্য বাসনা মায়ারে এড়াতে, কচ্ছ্র করিনু শিক্ষা॥
সাধনা-শেষে একি দেখি আজ, হয়ে গেছি আমি নিঃস্ব।
খেলা-ঘরে যে বদ্ধ আছিল, আজি সে জুড়েছে বিশ্ব॥
এড়াতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছি, বেড়াপাকে আজি বদ্ধ।
যা ছিল মায়া, আমারি মাঝে তা মা হয়ে ফুটেছে সদ্যঃ॥
খেলা-ঘরে যারা পুতুল আছিল, তারাই আজিকে পুত্র।
প্রসূতি নহি, তবুও জননী, একি রে মায়ার সূত্র?
দেবকী মোদের জননী বটে, মা যে মোদের যশোদা।
না বিয়িয়ে কানায়ের মা, হয়েছে কে কবে কোথা?
বুঝিনু রে সখী, বুঝিনু আজি, মায়াই প্রেমের ভাষ্য।
ভূমাই স্বর্গ, ক্ষুদ্র।—শুধু, ভূমারি মোহন হাস্য॥
নিঃসংসার সন্ন্যাসী যে, সংসার তাঁরি বিশ্ব।
সংসারীর ঐ ক্ষুদ্র গহ, রাজাই বটে গো নিঃস্ব॥
ত্যাগই সখীরে, পরম ভোগ, মুক্তি পরম বন্ধ।
কে বলে মায়া? যোগমায়া এ যে, তুচ্ছ মায়ারি ধন্ধ॥

দেশের কথা।

(১)

বস্ত্রবয়নশিল্প।*

যদি কেহ এই বস্ত্র-সঙ্কটের সময় বস্ত্র বয়নের সংকল্প করিয়া বয়ন শিল্পালয় স্থাপন করেন অথবা কোন ব্যক্তি বস্ত্র বয়ন করেন, তাহা হইলে এই কয়েকটী বিষয় জানিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে কতকটা সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়, কেননা গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকে বয়ন শিল্পকার্য্য প্রথম হইতে অসুবিধা দেখিয়া উক্ত কার্য্য করিতে অগ্রসর হন নাই। আবার কেহ বা কার্য্য আরম্ভ করিয়া অনেক রকম অসুবিধা দেখিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। যদি কেহ সেইরূপ অসুবিধায় পড়িয়া হিতকর প্রধান শিল্প এবং বর্ত্তমান সময়ে লাভ জনক বস্ত্র বয়ন কার্য্য করিতে অমনোযোগী হন অথবা কার্য্য আরম্ভ করিয়া হতাশ হইয়া পড়েন সেই আশঙ্কায় কয়েকটী কথা লিখিতেছি।

১। তাঁত—আমরা প্রায় দ্বাদশবর্ষ কাল উক্ত বয়ন শিল্পকার্য্য করিয়া যে কয়েক প্রকার তাঁত ব্যবহার করিয়াছি এবং ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি তন্মধ্যে ঠক্ঠকি (ফ্লাই সাটেল) তাঁতই হস্ত চালিত তাঁতের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে সুবিধা জনক বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই তাঁতের মূল্য অন্যান্য তাঁতের মূল্য অপেক্ষা কম। তাঁতের কোন অংশ খারাপ হইয়া গেলে গ্রাম্য মিস্ত্রী দ্বারা মেরামত হয়, এমন কি যন্ত্রাদি থাকিলে বস্ত্র বয়নকারী নিজেই মেরামত করিয়া লইতে পারেন।

এই তাঁতে কম পরিশ্রমে ১০নং মোটা সুতা হইতে ৮০নং সরু সুতার কাপড় পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি, এবং গড়পড়তায় অপেক্ষাকৃত

---

* স্বামী কেশবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন বয়ন বিদ্যালয় কোয়ালপাড়া, কতুলপুর পোঃ বাঁকুড়া।

বেশী কাপড়ও আদায় হয়, সুতরাং পারিশ্রমিকও বেশী পাওয়া যায়। হুগলি জেলায় শ্রীরামপুর, মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা প্রভৃতি অপরাপর অনেক স্থানেই এই তাঁত খরিদ কবিতে পাওয়া যায়। মূল্য সাজ সরঞ্জাম ও ফ্রেম সহ আন্দাজ ২৫।৩০৲ টাকা। শানা (Reed) "ব" (Helads), চর্কা, চর্কী ও টানা কাড়াব যন্ত্রাদি পৃথক মূল্য দিয়া খরিদ করিতে হয়।

এই তাঁত হস্ত পদ দ্বারা চালিত হয বলিয়া অনেকেই শুধু হস্ত দ্বারা চালিত উন্নত প্রকারেব বেশী দামেব তাঁত ব্যবহাব কবা সুবিধাজনক মনে কবেন, কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয না। মাকু চালান ও ঝাঁপ টেপা হস্ত ও পদ দ্বাবা হয় এই উভয় কার্য্য শুধু হস্ত দ্বাবা সমাধা করিতে হইলে পরিশ্রম বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। বেশী চেষ্টা ও পবিশ্রম করিলে যদিও কোন দিন উহাতে ঠক্‌ঠকি তাঁতেব অপেক্ষা কিছু বেশী কাপড় আদায হয় কিন্তু সেইরূপ পবিশ্রমে শুধু হস্তদ্বাবা চালিত তাঁত প্রতিদিন চালান বড কষ্টকব। আবাব একটু কলকব্জা খারাপ হইলে তাঁতখানিব দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কেননা নাগরিক অভিজ্ঞ মিস্ত্রী ব্যতীত উন্নত প্রকাবের তাঁত মেরামত হয না। এজন্য বেশী দামী তাঁত দেখিতে ও শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু কাপড আদাযেব পক্ষে তত সুবিধাজনক নহে। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে তাঁত চালাইতে হইলে ঠকঠকি তাঁতই বিশেষ উপযোগী।

২। শিক্ষক—বস্ত্র বয়ন করা বেশী কঠিন কার্য্য নহে, তবে সুতার পাট, টানা প্রস্তুত, টানা গুটান, সানা কিংবা "ব" গাঁথার একটু ইতর বিশেষ হইলে বস্ত্র বয়ন কবা কঠিন হইযা পড়ে। এই কার্য্যগুলি ঠিক ভাবে হইলে যে কোন ব্যক্তি হউন না কেন বস্ত্র প্রস্তুত কবিতে পারিবেন। এজন্য গোড়াব কার্য্যগুলিব দিকে লক্ষ্য বাখা বিশেষ আবশ্যক। এই কার্য্যগুলি শিক্ষা সহজেই হয। ছয়মাস কাল কোন বয়ন বিদ্যালযে শিক্ষা কবিযা কার্য্য আবম্ভ করিলে অথবা একটি শিক্ষক রাখিয়া ছয় মাস কাল মনোযোগ সহ শিক্ষা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে লোকসানের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীরামপুব, বাঁকুড়া, পাবনা প্রভৃতি

বয়ন বিদ্যালয়ে বয়ন শিক্ষার্থীগণকে অবস্থা বিশেষে মাসিক বৃত্তি দিয়া বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত বয়ন বিদ্যালয় হইতে অনেক শিক্ষকও বাহির হইতেছেন শুনিতেছি।

৩। সুতার পাট—তাঁতের কার্য্য লাভজনক ও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইলেও টানা, সুতার পাট অর্থাৎ সুতায় বিট দিয়া লাটায়ে গুটান বিষম ব্যাপার বলিয়া অনেকে বয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং অধিকাংশ বয়ন শিল্পালয়ে কোরা পাকান সুতার জামার ছিট প্রস্তুত হইয়া থাকে, পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করিতে চেষ্টা করেন না। এই সুতার পাট পরিধেয় বস্ত্র বয়নের সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান কার্য্য। ইহাতে বিশেষ অভ্যস্ত না থাকায় আমাদিগকে বিষম মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। এজন্য আমরা সুতা গুটাইবার লাটাইকে চরকা কলের সাহায্যে চালাইয়া সুতার পাটের সুবিধা করিয়া লইয়াছি। এই চরকা কলের সাহায্যে সুতা গুটান খুব সহজে সত্বর সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা যে কোন ব্যক্তি সুতার পাট করিতে পারিবে। সুতরাং এই কল ব্যবহার করিলে সুতার পাটের জন্য আদৌ চিন্তা করিতে হইবে না। তাহার পর লাটায়ের সুতা শুকাইয়া ছোট চর্কীতে চাপাইয়া টানা প্রস্তুত করা যায়, অথবা উহা হইতে নলী প্রস্তুত করিয়াও টানা দেওয়া হয়।

৪। "ব"—বস্ত্র বয়নের জন্য আমাদিগকে আর একটি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। টানা সুতা বার নরাজে গুটাই-বার পর বয়ন সময়ে ঝাঁপ তুলিবার যে "ব" (Healds) তন্তুবায়গণ সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত করিয়া থাকে সেই "ব" ভালরূপ প্রস্তুত হইলে কাপড়ও ভাল হয়, নচেৎ এত কাপড় খারাপ হয় যে বিক্রয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য আমাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আমরা অনন্যোপায় হইয়া বাঁধা "ব" যাহা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে ও শ্রীরামপুর উইভিং স্কুলে ব্যবহৃত হয় সেই "ব" বোম্বের গ্রীভস্ কটন কোংর দোকান হইতে আনিয়া ব্যবহার করিতেছিলাম। উপস্থিত নিজেরাই উক্ত বাঁধা "ব" প্রস্তুত করিয়া লইতেছি। বাঁধা "ব"

ব্যবহার করিলে কাপড় খুব সুন্দর হয়। অতএব বাঁধা "ব" ব্যবহার করাই উচিত।

৫। মাকু—ঠক্‌ঠকি তাঁতে সাধারণতঃ চক্রযুক্ত মাকু ব্যবহার হইয়া থাকে। চক্রযুক্ত মাকুতে প্রথম বেশ সুবিধা হয় বটে, কিন্তু চাকা কোন রকম খারাপ হইয়া গেলে তাঁত বন্ধ হইয়া যায়। মিস্ত্রী ব্যতীত ঐ চাকা মেরামত হয় না। এজন্য চক্রহীন মাকুই ব্যবহার করা উচিত। এই মাকুর মূল্যও সুলভ এবং কোন অংশ সহজে খারাপ হইবার আশঙ্কা নাই। আমরা উভয় প্রকার মাকুই ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। তন্মধ্যে চক্রহীন মাকুই কার্য্যোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। এজন্য উক্ত জে, গ্রীভস্ কোংর চক্রহীন মাকু ব্যবহার করিতেছি।

৬। সুতা—কেহ কেহ তাঁতের কার্য্য আরম্ভ করিয়াই ৪০।৫০নং সরু সুতার কাপড় বুনিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সে চেষ্টা প্রায়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে ১২ কি ১৬নং মোটা সুতার কাপড় বয়ন করিয়া ২।৪ মাস অভ্যাস করিলে পর ২০।৩০নং সুতার কাপড় প্রস্তুত করিতে কোন কষ্টই হইবে না। উহা আবার কিছুদিন অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ ৪০।৫০নং সরু সুতার কাপড় বুনিতে পারা যায়।

৭। তাঁতের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—তাঁতের কার্য্য চালাইবার জন্য অনেকগুলি জিনিষ পত্রের আবশ্যক। সেই সকল জিনিষ পত্র সকল সময়ে সকল স্থানে পাওয়া যায় নাই। এজন্য বস্ত্র বয়ন কার্য্যের বড় ক্ষতি হয়। যদি তাঁতের কার্য্য সম্বন্ধে কাহারও কোন পরামর্শ লইবার আবশ্যক হয়, উক্ত কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদি পাইবার ঠিকানা জানিবার প্রয়োজন যে কিংবা সুতা প্রস্তুত করিবার জন্য চরকার এবং তুলা চাষের জন্য ক্ষেত কাপাসের বীজের আবশ্যক হয় তাহা হইলে ডাক টিকিট সহ লেখকের ঠিকানায় পত্র লিখিলে যথা সম্ভব পরামর্শাদি দিবার চেষ্টা করা হয়।

(১)

শিশুর অপমৃত্যু।*

এই বাঙ্গালাদেশে তথা ভারতবর্ষে শিশুর মৃত্যু বা অপমৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃই এত ভীষণ ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে যে মনে হয় অচিরে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বুঝি বা লোপ পাইবে। একদিকে যেমন ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, দরিদ্রতার দরুণ অনশন প্রভৃতি কারণ মনুষ্য শক্তি শনৈঃ শনৈঃ হ্রাস করিতেছে, অন্যদিকে তেমনই শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এক বাঙ্গালাদেশে তিন লক্ষ শিশু এক বৎসরে হওয়ার পূর্ব্বেই মারা যায়—ইহার মধ্যে দুই লক্ষ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার একমাসের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। একবারও কি মনে হয় না যে এই ভাবে শিশু ক্ষয় হইতে থাকিলে এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন আমাদের নাম মাডাগাস্কার দ্বীপের ডাডোদের মত জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে। যে কোন গ্রামে যাও দেখিতে পাইবে শিশু সংখ্যা কিরূপে দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। যেখানে আগে হয় তো দুই শত শিশু ছিল এখন পঞ্চাশটীও আছে কি না সন্দেহ। আবার যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের জীবন্মৃত অবস্থা অর্থাৎ কতকগুলি প্রাণহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, প্লীহাযকৃৎ ভারগ্রস্থ পুত্তল মাত্র।

যাহাতে এই সকল সন্তানের জীবন রক্ষা হয় ও ভবিষ্যতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে সে বিষয় চেষ্টা সমগ্র জাতিরই কর্ত্তব্য, কারণ শিশুর উপরেই জাতীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। উপায় নারায়ণ বলিলে চলিবে না। ভগবান তো আছেনই কিন্তু আমাদের পুরুষকারটা কি একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হইবে? এই যে সেদিন দেখিলাম ইংলণ্ডবাসীরা যত্ন ও উদ্যমসহকারে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের বর্দ্ধিত শিশু-মৃত্যু-সংখ্যা কমাইয়া ফেলিল। মানুষে যাহা পারিয়াছে মানুষ তাহা পারিবে না কেন? আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি একটু

* কৃষ্ণনগর শিশু মৃত্যু নিবারণী সভায় ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় Municipal Chairman এর বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত।

চেষ্টা করিয়া জাগাইয়া তুলিলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। তবে একটা কথা আছে ইংলণ্ডবাসীরা ধনী আর আমরা গরীব—কিন্তু তাহা হইলেও চেষ্টা করিলে অনেকটা আমরা সফলকাম হইতে পারি। আর দুঃখের বিষয় শিশুর অকাল মৃত্যু আমাদের দীর্ঘকালের কুসংস্কার এবং সময়ের সহিত চলিতে না জানায় এত প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী উল্লেখ করা যাইতে পারে,—যথা পেঁচো পেঁচি পাওয়া, কাটা নাড়ীতে অপরিষ্কার মাটী দিয়া প্রলেপ দেওয়া ইত্যাদি।

কারণ :—

১। "গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া" শীর্ষক পূর্ব্ব প্রবন্ধে এবিষয় কিছু কিছু বলা হইয়াছে—

২। উপযুক্ত সূতিকাগারের অভাব। প্রায়ই দেখা যায় যে বাটীর নিকৃষ্ট ঘরটী এই জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘরটীর বায়ু বদ্ধ অনাচ্ছাদিত এবং অপরিষ্কার থাকে। নন্দদুলাল, ভাবী বংশধর, জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসা-স্থল সন্তানগণের শুভাগমনের জন্য কি সুন্দর ব্যবস্থা!!! ফলে অনেক প্রসূতি ও প্রসূত ঠাণ্ডা লাগিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পিতা পুত্রের অন্নপ্রাসনের সময় অর্থাৎ ছয়মাস পরেই চারি পাঁচ শত টাকা অনায়াসেই খরচ করেন তিনিও কিন্তু আতুড় ঘরটী সন্তান প্রসবের উপযুক্ত করিবার জন্য কুড়িটী টাকা খরচ করিতেও কুণ্ঠিত। শীতকালেও গর্ভিণী কিম্বা সদ্যজাত সন্তানের জন্য উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি দিতেও আমরা নারাজ। আমাদের মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত যে ঠাণ্ডা লাগিয়া সন্তান বা মাতার অসুখ করিলে ডাক্তারকে আমরা শতেক টাকা দিতে পারি কিন্তু একটী ছয় সাত টাকা দামের লেপ তাহাদের দিতে আমরা প্রস্তুত নয়। ইংরাজিতে যাহাকে বলে Penny wise Pound foolish আমরাও কি তাই নই? পিতা হয়তো পৌষ মাসে রাত্রিতে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন কিন্তু তাহার একমাত্র আদরিনী কন্যার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে এক ছিন্ন কাঁথা ও এক ছিন্ন কম্বল। যাদের "ক্ষণেক না হেরিলে দেখি অন্ধকার" সেই পুত্র বা পৌত্রের গায়ে হয়তো একটীও

জামা নাই। মানুষের কুসংস্কার ভালবাসাকেও এরূপ বিবেকহীন করিতে পারে, এ বড় আশ্চর্য্য। ছুৎমার্গীদের মতে কুড়ি দিন কিংবা একমাস পরে মাতা ও সন্তান অন্য ব্যবহৃত লেপ গায় দিলে ক্ষতি হয় না কিন্তু তাহাদের জানা উচিৎ যে প্রসবের পরেই মাতা ও সন্তানের পক্ষে উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও বিশ্রামের প্রয়োজন, আতুড় ঘরটী প্রশস্ত অন্ধকার বিহীন, নির্ম্মল পবন সঞ্চালনের উপযোগী, ধূমবিহীন হওয়া উচিৎ। অথচ সন্তান বা মাতার কোন প্রকারে ঠাণ্ডা না লাগে সে বিষয়ও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য—বিশেষতঃ শীত ও বর্ষা কালে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও খটখটে হওয়া উচিত। ঘরে কোন প্রকার অপ্রয়োজনীয় জিনিষ না থাকাই ভাল।

৩। কতকগুলি কুসংস্কার (ক) পেঁচো পাচি পাওয়া, গায়ে হাওয়া লাগা ইহা একপ্রকার রোগ—ভূত বা অপদেবতার খেলা নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সকল প্রকার রোগই কীটাণু বা জীবাণু সম্ভূত এই পেচো পাঁচি বা ধনুষ্টঙ্কার রোগেরও কারণ একপ্রকার জীবাণু। গর্ভিণীর এইরূপ শতকরা নব্বইটী রোগ অপরিষ্কার ভোঁতা কাঁচি বা চেচাড়ী দিয়া নাড়ী কাটা হইতে দেখা দেয়। নাড়ী কাটার কাঁচিখানি ধারাল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিৎ।

ঐ কাঁচিখানি এবং সূতা যাহা দিয়া নাড়ি কাটার পর বাঁধা হয় প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলেই অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ধরিয়া গরম জলে ফুটাইয়া লওয়া উচিত।

কাটা নাড়িতে মাটী কিংবা অন্য কোন অপরিষ্কার দ্রব্য লাগান মোটেই উচিৎ নয়। এত আয়াস সাধ্য রোগে প্রতি বৎসরে যে কত শিশুর অকাল মৃত্যু হয় বলা যায় না।

অনেকে তর্কের ছলে বলেন যে পূর্ব্বেও ত চেচাড়িদিয়া নাড়ী কাটা হইত তাহারা বাঁচিত কেমন করিয়া। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আগেকার মত সুস্থ সবলকায় কয়টা গর্ভিণী আজ কাল এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়? তখনও দেশে ম্যালেরিয়া প্রভৃব এত হাঁক ডাক ছিল না, এত অন্নাভাব ছিল না। বাঙ্গালী রমণীর জীবনি শক্তি যে

ক্রমশই অন্নাভাবে, রোগে, শোকে দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কাজেই রোগের প্রাবল্য বর্দ্ধিত হইতেছে।

(খ) শিক্ষিতা ধাত্রীর নিয়োগ—সন্তান প্রসব করা আজকাল বাঙ্গালি রমণীদের পক্ষে একরূপ বিপদের কথা হইয়াছে। বাংলাদেশে পচিশ হাজার হইতে ত্রিশ হাজার গর্ভিণী প্রতি বৎসর সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। লজ্জার কথা এই যে এমন রোগে তাঁহারা মারা যান, যে আমরা চেষ্টা করিলে অনেকটা কমাইতে পারি। এই হতভাগ্য রমণীদিগের মৃত্যুর প্রধান কারণ "আতুড় জ্বর"। অশিক্ষিতা ধাত্রীরাই এই মৃত্যুর কিঙ্করী স্বরূপা। তাহাদের হাত হইতে এই রোগের বীজ প্রসূতির শরীরে প্রবেশ করে। সুতরাং প্রত্যেক গৃহিণীর দেখা উচিত যে ধাত্রী প্রসব করানর পূর্ব্বে তাহার হাত-কারবলিক সাবান ও গরম জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া লয় কিনা। পাঁচ পয়সা খরচ করিলে অকারণে একটী প্রাণহানির সম্ভাবনা কমিয়া যায়। মাতার ও সন্তানের ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। ময়লা কাপড় চোপোড়ে এই রোগের বীজাণু থাকে। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

রামকৃষ্ণো জয়তি।

(বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

এলাহাবাদ।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

শ্রীচরণেষু,

গুপ্ত* আসিবার সময় একটা স্লিপ ফেলিয়া আসিয়াছিল এবং পরদিবসে একখানি যোগেনের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ

* শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত বা স্বামী সদানন্দ। স্বামীজির প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য।

এলাহাবাদ যাত্রা করি। পরদিবস পৌঁছিয়া দেখিলাম, যোগেন † সম্পূর্ণ আরোগ্য হইযাছে। পানিবসন্ত (দুই একটী ইচ্ছা ও ছিল) হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু অতি সাধু ব্যক্তি এবং তাঁহাদের একটী সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা অতি ভক্ত ও সাধুসেবাপরায়ণ। ইঁহাদের বড় জিদ—আমি এস্থানে মাঘমাস থাকি, আমি কিন্তু কাশী চলিলাম। গো—মা, যো—মা এখানে কল্পবাস করিবেন, নিরঞ্জন ‡ ও বোধ হয় থাকিবে, যোগেন কি করিবে জানি না। আপনি কেমন আছেন?

ঈশ্বরের নিকট সপরিবারে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুলসীরাম চুনীবাবু প্রভৃতিকে আমার নমস্কার দিবেন।

কিমধিকমিতি

দাস নরেন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

(বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

এলাহাবাদ।

৫ জানুয়ারি, ১৮৯০।

নমস্কার নিবেদনঞ্চ,

মহাশযের পত্রে আপনার পীড়ার সমাচার জ্ঞাত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বৈদ্যনাথ change (পরিবর্ত্তন) সম্বন্ধে আপনাকে যে পত্র লিখি তাহার সার কথা এই যে, আপনার ন্যায় দুর্ব্বল অথচ অত্যন্ত নরম শরীর লোকের অর্থব্যয় অধিক না করিলে উক্তস্থানে চলা অসম্ভব। যদি পরিবর্ত্তনই আপনার বিধি হয় এবং যদি কেবল সস্তা খুঁজিতে এবং গয়ং গচ্ছ করিতে করিতে এতদিন বিলম্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। * *

বৈদ্যনাথ হাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, কিন্তু জল ভাল নহে, পেট

† শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্নাসী শিষ্য ৺স্বামী যোগানন্দ।

‡ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্নাসী শিষ্য ৺স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

বড় খাবাপ করে—আমার প্রত্যহ অম্বল হইত। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে এক পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না bearing (বিনা মাশুলে প্রেরিত) দেখিয়া the devil takes it * করিয়াছেন? আমি বলি chage (পরিবর্ত্তন) কবিতে হয় ত শুভস্য শীঘ্রং। রাগ কবিবেন না—আপনাব একটী স্বভাব এই যে, ক্রমাগত 'বামুনেব গরু" খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখেব বিষয়, এজগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায না—আত্মানং সততং রক্ষয়েৎ। Lord have mercy (ভগবৎকৃপায়ই সব হয়) ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself (যে উদ্যমী, ভগবান তাহাকেই দয়া কবেন)। আপনি খালি টাকা বাঁচাতে যদি চান, Lord (ভগবান্) কি বাবার ঘব হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change (পবিবর্ত্তন) কবাইবেন? যদি এতই Lordএব উপব নিভর কবেন, ডাক্তাব ডাকিবেন না। * * * যদি আপনাব Suit না কবে (আপনাব সহ্য না হয়) কাশী যাইবেন—আমিও এতদিনে যাইতাম, এখানকাব বাবুবা ছাড়িতে চাহে না, দেখি কি হয়।

* * * *

কিন্তু পুনর্ব্বাব, বলি, changeএ (বায়ুপবিবর্ত্তনে) যদি যাওয়া হয়, কৃপণতাব জন্য ইতস্ততঃ কবিবেন না। তাহা হইলে তাহার নাম আত্মঘাত। আত্মঘাতীব গতি ভগবান্ও কবিতে পাবেন না। তুলসী বাবু প্রভৃতি সকলকে আমাব নমস্কাবাদি দিবেন।

ইতি

নবেন্দ্রনাথ।

---

* 'যা শত্রু পবে পবে।' ভাবার্থ—গ্রহণ না কবিয়া ফেবত দিয়াছেন।

বিবেকানন্দ স্মরণে।

(গান)

(শ্রীঅলিন মুখোপাধ্যায)

উষাব ললাম ললাট ভেদিয়া, উদিল যে জ্যোতিঃ উজলি বঙ্গ,
হেবিয়া যাঁহার বিমল কিবণ, মাগিল অমব লভিতে সঙ্গ ,
অতীত পুণ্য ভারত গবিমা, জাগাল কত না আয়াস ভবে,
জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম্মেব নীতি, প্রচাবি মানবে কল্যাণ তবে।
বন্দিল যাঁবে প্রাচ্য-প্রতীচ্য, অভিনব কত প্রীতিব ছন্দে,
ভাবতীব প্রিয়, ভাবত-ভাস্কব, আচার্য্য ঋষি বিবেকানন্দে।
উষার ললাম ললাট ভেদিয়া—(কোরাস)

(২)

তরুণ-তাপস, সংযত-চেতা, ব্রহ্মচর্য্য মহিমা দীপ্ত,
ললাটে শোভিছে বিজয়-তিলক, সিদ্ধ-গুরু-কৃপা প্রদত্ত ,
নেহাবি যাঁহাব দুর্ব্বার তেজ, বিপুল উদ্যম, ইষ্ট-নিষ্ঠা,
বিশ্ব-জননী আপনি দিলেন খুলিযা বিশ্ব-গ্রন্থ পৃষ্ঠা।
এ নব-যুগের নবীন-সাধক, স্বদেশ-সেবা যাঁহাব মন্ত্র,
ভাবত-আকাশে আলো কবা, সেই, বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র।
উষার ললাম ললাট ভেদিযা—(কোবাস)

(৩)

বিশ্ব প্রেমে হইযা মুগ্ধ, ভাসায়ে দিল বসুন্ধবা,
পাইল অগণ্য নব-নাবী যাব করুণা-আশীষ অমিয়ভরা ,
বিশ্ব-কল্যাণ সাধনা হলেও, স্বদেশ সেবা যাঁহাব ব্রত,
জীবনেব শেষ নিশ্বাসটুকু ছিলেন দেশেব কাজেতে বত।
সৌম্যমূর্ত্তী, দীপ্ত-আনন, সুনীল-শীতল-নীবদ সান্দ্র,
শক্তির সাধক, নিষ্কাম ত্যাগী, বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র॥
উষাব ললাম ললাট ভেদিয়া—(কোবাস)

(৪)

ধর্ম্মে যাঁহার অটল আস্থা, ছিল না কখন সংসারাশক্তি,
বিষয় বাসনা ছিল না কখন, চাহেনি নির্ব্বান অথবা মুক্তি !
নবীন-ভারতে, নব-যুগ-ঋষি, নব-মন্ত্র জপি সাধিল শক্তি,
ভারতী আপনি দিয়াছেন যাঁরে, অটল বিশ্বাস-অচলা ভক্তি।
মঠ-মন্দির, জীব-সেবাশ্রম, যাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা-কেন্দ্র,
ভারতের ঋষি, বঙ্গনভোমণি—বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র।
ঊষার ললাম ললাট ভেদিয়া—(কোরাস)

(৫)

ভারতের কর্ম্ম, কর্ম্মের তরে, প্রেমের প্রেরণা ভাবের চক্ষে,
জ্ঞান-ভক্তি লভে' কর্ম্মের ভিতর, ত্যাগ যাহার মহান লক্ষ্যে।
সাধিয়া জীবনে, প্রচারি আচারে, নাশি অবসাদ জড়তা ভ্রান্তি,
আচারি দেখান জীবন আদর্শ, ত্যাগই বিতরে বিমল কান্তি।
ধরি কৌমার্য্য গৈরিকবাস—হৃদয়ে জাগ্রত ঐক্য মন্ত্র,
ভোগী যোগী ত্যাগী কর্ম্মের সাধক, বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র।
ঊষার ললাম ললাট ভেদিয়া—(কোরাস)

(৬)

নয়নে ক্ষরিছে করুণাধারা, কণ্ঠে উঠিছে অভয় গীতি,
দ্বেষভেদ হীন, ব্রহ্মবাদী ঋষি, শ্বাস প্রশ্বাসে বহিছে প্রীতি,
'উত্তিষ্ঠত' আহ্বানে করি প্রবুদ্ধ করিল সারাটা দেশ,
উদ্বোধিল আত্ম-শক্তি ধরিয়া মহান ত্যাগীর বেশ।
গাহিছে বিশ্ব, যাঁহার মহিমা, তৃপ্ত শুনিয়া শ্রবণরন্ধ্র,
ভারতীর প্রিয়, বঙ্গনভোমণি, বিবেকানন্দ পূর্ণচন্দ্র॥
ঊষার ললাম ললাট ভেদিয়া, উদিল যে জ্যোতিঃ উজলি বঙ্গ,
যাঁহার বিমল কিরণ নিরখি মাগিল অমর লভিতে সঙ্গ॥

বিবেকানন্দ স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে রেঙ্গুনে পঠিত।

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

১। আজ বিবেকানন্দ স্বামীর জন্মতিথি আমাদের অন্তরে জাগ্রত করিয়া দিতেছে—এক মহামানবের জন্ম ও সার্থক জীবনের পুণ্যস্মৃতি। স্বামীজীর স্থূল জড়মূর্ত্তি আমাদের চাক্ষুষ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বহুদিন অপসৃত হইলেও, তাঁহার ভাবমূর্ত্তি আমাদের মানস দৃষ্টির সম্মুখে সততই বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহারই নিকট আজ আমরা নূতন করিয়া ভক্তিবিমিশ্র শ্রদ্ধার সহিত মস্তক অবনত করিতেছি।

২। উনিশ বৎসর স্বামীজি দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কোটী কোটী নরনারীর অন্তরে আজ তাঁহার অমর আত্মার রশ্মিপাত দেখিতেছি। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমরা নূতন করিয়া তাঁহাকে বুঝিতেছি জানিতেছি, গ্রহণ করিতেছি। নূতন করিয়া তাঁকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতেছি। অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া না যাইয়া, তিনি আমাদের ভবিষ্যৎকে আলোকিত করিয়া আমাদের সম্মুখে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া পথপ্রদর্শনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। কে এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী? কে এই অলোকসামান্য অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ-সিংহ? কে এই মহামানব যাঁহার নামের ডাকে আজ আমরা একত্রিত হইতে বাধ্য হইতেছি? তাঁহার জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্বন্ধ কি? তাঁহার প্রতি আকর্ষণের কারণ কি? কেনই বা আমরা আজ তাঁহার স্মৃতির পূজা করিতেছি? কেনই বা তাঁহার স্মৃতি ধারণ করিয়া আছি?

৩। স্বামীজির জীবন কথা বহু প্রবন্ধে নিবন্ধে বহু গুরুগম্ভীর গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বজনবিদিত সাধারণে সুপরিচিত সেই অফুরন্ত কথার আজ পুনরাবৃত্তির আবশ্যক নাই। বৈচিত্র্যবহুল ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে কেমন করিয়া এই বিরাট জীবনের অভিব্যক্তি

হইয়াছে, তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরও আজ কোন আবশ্যকতা দেখি না। আমাদের স্মৃতিকে জীবন্ত করিয়া ধরিয়া, বুদ্ধি ও কল্পনার সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, আজ শুধু ইহাই বলিতে চাই যে বিবেকানন্দ স্বামী ভারতবর্ষের আর ভারতবর্ষ বিবেকানন্দ স্বামীর। সম্প্রদায় প্লাবিত ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের মূক হৃদয়ের ভাষা, মৌন জ্ঞানের বাণী, অতীত সাধনার যথার্থ প্রতিনিধি, ভবিষ্যতের সিদ্ধির অগ্রদূত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহির্জগতের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে, দৈন্য ও দারিদ্র্যের প্রপীড়নে, বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবল আক্রমণে, ভারতের অন্তরআত্মা শৃঙ্খলিত হইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছিল। বিবেকানন্দ তাহারই পুনরুত্থান ব্রতের পুরোহিত—অবাধ মুক্তির বীর সেনানী।

৪। স্বামীজি ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া দেখেন নাই। কোন সঙ্কীর্ণ মত বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, ভারতবর্ষকে কাটিয়া ছাটিয়া পঙ্গু করিয়া লন নাই। বৈদিক ভারত, পৌরাণিক ভারত, বৌদ্ধ ভারত, তান্ত্রিক ভারত—ভারতের অবতার বাদ, গুরুপূজা দেবদেবী পূজা শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতি, সকলই তিনি পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়া ছিলেন সকলেরই যথার্থ সার্থকতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং", সে দেশ স্বাধীন চিন্তার দেশ। সে দেশে একটা বিশিষ্ট মতবাদ বা কোন সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য সকলের উপর চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। সে দেশে প্রত্যেক মতবাদের, প্রত্যেক সাধন পদ্ধতির তুল্যরূপ সার্থকতা রহিয়াছে। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন মানব হৃদয়ের অনন্ত রকমের অভাব আছে। অনন্ত ঘটে অনন্ত কেন্দ্র অনন্ত রকমের দৃষ্টি রহিয়াছে। আর তাহা পূর্ণ করিবার তাহা তৃপ্ত করিবারও অনন্ত রকমের পথ অনন্ত রকম সাধন পদ্ধতি থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষে এইরূপ বহু পথ বহু রকমের সাধন পদ্ধতি আবিষ্কৃত, স্বীকৃত ও সমভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। আর এই সকল বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ, জাতীয় জীবনের ঐশ্বর্য্যেরই পরিচায়ক। জাতীয়

ধনভাণ্ডারে সঞ্চিত মণিমাণিক্যের মত শোভা সৌন্দর্য্যও আবশ্যক হইলে ব্যবহারের বস্তু।

৫। সংস্কৃত ভারতের এই উদার শিক্ষার আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়া স্বামীজি ভারতীয় জীবন প্রণালীর মধ্যে এক অসীম সমন্বয়ের আদর্শ পাইয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা মতের গণ্ডি ও প্রাদেশিকতা ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মানস দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল এক অখণ্ড ভারত—সম্প্রদায়পূর্ণ ভারতের এক অসাম্প্রদায়িক রূপ—বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের এক মহান ঐক্যের ছবি, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে পরিব্যপ্ত ভারবর্ষের একটা অনবচ্ছিন্ন জীবন ধারা। তিনি আসিযাছিলেন এই জীবনধারার অর্থ ও উদ্দেশ্য দেখাইয়া দিতে বর্ত্তমান জগতে তাহার আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে বলিয়া, তিনি নিজকে প্রচার করিতে কিংবা নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা বুদ্ধি-কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সঙ্কীর্ণ মতবাদ প্রচার করিতে আসেন নাই। বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে আমরা বিবেকানন্দকে দেখিতে পাই না। সেখানে স্পষ্ট দেখিতে পাই ভারতবর্ষের একখানি সুবৃহৎ ভাষ্য ভারতের সাধনা ও সিদ্ধির একখানি বিশাল বিশ্বকোষ।

৬। এই বিশ্বকোষের মধ্যে দেখিতে পাই আমাদেরই জীবনের অর্থ আমাদেরই অন্তরাত্মার বাণী। আমাদেরই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অস্ফুট ধ্বনির পরিস্ফুট প্রতিধ্বনি। আমাদেরই হৃদয়কন্দরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত তাহারই রাগ-রাগিণীর ঝঙ্কার। আজ দেখি স্বামীজির জীবন আমাদেরই অব্যক্ত জীবনের ব্যক্ত রূপ। আমাদেরই প্রচ্ছন্ন ভাবরাশি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাদেরই সম্মুখে উপস্থিত। তাই স্বামিজীর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্বামীজি আমাদের এত আপনার জন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। তাই পরস্পরের মধ্যে এরূপ প্রবল আকর্ষণ। স্বামীজির স্মৃতি পূজা করিয়া আজ আমাদেরই অন্তরাত্মার পূজা করিতেছি।

৭। যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহাপুরুষদিগের জীবনের ভিতর দিয়া যে আদর্শের

বিকাশ করিয়া দিতেছেন, স্বামীজি সেই ভারতের দেব আদর্শেরই পুরোহিত। তিনটী বিরাট জীবনের ভাব সংমিশ্রণে তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন ভগবান বুদ্ধ তাঁহার বিশাল হৃদয় ও কর্ম্মপ্রেবণা লইয়া। অপরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন বেদমূর্ত্তি ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তের ভৈরবগর্জ্জন লইয়া। এই উভয় প্রান্ত বিধৃত হইয়াছে, বর্ত্তমানযুগেব আচার্য্য দেব-মানব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেবজীবনের মধ্যে। স্বামীজি আমাদের সম্মুখে যে জীবনাদর্শ উপস্থিত কবিয়াছেন, তাহাব সম্যক পরিচয় লইবাব দিন এখনও বহুদূরে অবস্থিত। মনে হয় বর্ত্তমান জগতেব দুঃস্বপ্নময় জীবন যখন অতীতেব অন্ধকাবে বিলীন হইয়া যাইবে, বর্ত্তমানেব ভীষণ জীবনসংগ্রাম যখন ইতিহাসেব ক্রোড়ে চিরতরে নিদ্রিত হইয়া পড়িবে, ভবিষ্যতের মানব তখন কল্পনার দৃষ্টি প্রসাবিত করিয়া দেখিতে পাইবে সেই গভীব অন্ধকাব আলোকিত কবিয়া দুইটী উজ্জল জ্যোতিষ্ক পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শূন্য আকাশে ভাসিতেছে।

৮। বিবেকানন্দ কত বড়, তাঁব সাধনা কত গভীর, তাঁব দৃষ্টি কত উদার, তাঁব বিশ্বতোমুখী প্রতিভা কত উজ্জল, আজ তাহার পবিমাণ লইব না। আমাদের ক্ষুদ্র ঘট দ্বাবা ভাবত মহাসাগরে কত জল আছে তাহা পবিমাণ কবিবাব বৃথা প্রয়াস কবিব না। তাঁহার জীবনেব সার্ব্বভৌমিকদিকের স্তুতিও আজ বিশেষ করিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব না। শিক্ষা ও রুচি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নরনাবী ভিন্ন ভিন্ন মত গঠন করিয়া লইবেন। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমাদেব যতটুকু আবশ্যক, জাতীয় জীবনে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত প্রযোজন, শুধু সেইটুকুই আজ বিশেষ কবিয়া দেখিব ও সামর্থানুসাবে গ্রহণ কবিতে চেষ্টা করিব। কারণ, বিচার বিতর্কেব দিন, শুধু আলোচনা ও সমালোচনার দিন, বহুকাল গত হইয়া গিয়াছে। এখন আর বিকল্প ও অনুকল্পের অবসর নাই। আজিকার কথা—স্বামীজির আদর্শ ও উপদেশ স্বীকার কবা, গ্রহণ করা, কর্ম্মজগতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হওয়া।

৯। বুদ্ধদেব একদিন বহুজন সুখায়, বহুজন-হিতায়, ধর্ম্মচক্র

প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবর্ষে যুগান্তর আনিয়া ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য একদিন বেদান্তের ভৈরব গর্জ্জনে ভারতবর্ষের জ্ঞানবিকাশে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমানযুগে স্বামীজি নূতন কর্ম্মযোগের প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতে নবজীবনের উদ্বোধন করিয়াছেন'। আমাদের উৎসাহ ও কর্ম্মচঞ্চল নবজীবনের পুরোহিত এই বীর সন্ন্যাসী সংসারকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নাই। মুক্তির ঝুলি লইয়া দূরে পলায়ন করেন নাই। তিনি সন্ন্যাসীকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন সংসারের মধ্যে। জ্ঞানকে লইয়া আসিয়াছেন কর্ম্মের মধ্যে, প্রেমকে লইয়া আসিয়াছেন সংসারের শোক তাপ ও দুঃখের মধ্যে। বোধিসত্ত্বের মত মুক্তি কামনাকে তুচ্ছ করিয়া সংসারের রোগশোক, দুঃখদৈন্যের বিপদ আপদের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, করুণ কাতরকণ্ঠে এই প্রেমিক সন্ন্যাসীই বলিয়াছিলেন—যতদিন সকলের মুক্তি না হয় ততদিন আমি মুক্তি চাই না। লোক সেবার জন্য আমায় সহস্রবারও জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহা আমি করিব। এইখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে বর্ত্তমান ভারতের সেবাধর্ম্ম—ভবিষ্যৎ ভারতের সিদ্ধির প্রথম সোপান। এইখানেই আমরা পরিচয় পাই কি করিয়া এই যুগধর্ম্মের পুরোহিত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কান্নাঘরের রসায়ণপর্য্যন্ত মানবীয় সকল কর্ম্মের সঙ্গে সহানুভূতি স্থাপন করিয়া নিজকে অখণ্ড ভাবে ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। এই সেবাধর্ম্মেই তিনি জাতীয় জীবনের মুক্তিপথ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

৫। স্বামীজি স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলেন একটা তামসিক ভাবের কুজ্ঝটীকা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তিকে অসার করিয়া রাখিয়াছে। রজোগুণের প্রবলতার ভিন্ন কর্ম্মের কঠোর ব্রত ভিন্ন, আমাদের মুক্তির পথ নাই। তিনি অভ্রান্ত ভাষায় বলিয়াছেন—"দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, লাখো লাখো লোক ওকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' কচ্ছে, এবং পাচ্ছে ঘোঁড়ার ডিম্। তার মানে বুঝ্‌তে হবে যে কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? সুখ দুঃখের পারে ক্রিয়াহীন

শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায়, শক্তির অভাবে ক্রীয়াহীন, মহা তামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে মচ্ছি—একথার জবাব দাও, নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। সত্ত্ব প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়—শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়। সে শান্তি মহাবীর্য্যের পিতা। সে মহাপুরুষের ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ সর্ব্বলোক পূজ্য"।

১১। "আর ঐযে মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে ঢোক গিলে গিলে কথা কয় সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্চে তমোগুণ ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি, দেশশুদ্ধ পড়ে কতই হরি বল্‌ছি, ভগবান্‌কে ডাক্‌ছি। ভগবান্ শুন্‌ছেনই না আজ হাজার বৎসর। শুন্‌বেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না। তা ভগবান্।" তবে উপায় কি? জাতীয় জীবনে সার্থকতা লাভের পথ কি? ঐ তমোগুণের ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার পথ কোথায়? স্বামীজি উত্তর দিতেছেন—"এখন উপায় হচ্চে ঐ ভগবদ্‌বাক্য শোনা—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" "তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব"—মহা উৎসাহে অর্থ উপার্জ্জন কর, স্ত্রীপরিবার দশ জনকে প্রতিপালন কর, দশটা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও আবার মোক্ষ।"

১২। জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল অবস্থায়, জীবন সংগ্রামে সচেষ্ট সাধনার প্রারম্ভে স্বামীজির উপদেশের সার্থকতা দেখিতে পাইতেছি। চতুর্দ্দিকেই জাতি চৈতন্যের জাগরণের প্রাথমিক কোলাহল শোনা যাইতেছে। এই সময় স্বামীজির উপদেশগুলি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়া ছিলেন ভারতশক্তির বিকাশ হইবে সমাজের নিম্নস্তরের ভিতর দিয়া। ভারতের স্বজাতি নিন্দিত বিজাতি বিজিত ছোট জাতের মধ্যে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কার্য্যকারীতা সকলের আজ শুভ নিঃস্বার্থতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া তিনি যথার্থই শ্রদ্ধাবিনম্র হৃদয়ে বলিয়াছেন—"হে ভারতের চিরপদদলিত

শ্রমজীবী। তোমাদের প্রণাম করি।" উচ্চস্তরের মধ্যে প্রাণহীন অসারতা দেখিয়া বলিয়াছেন "স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, ভবিষ্যতে তোমরা শূন্য। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনিওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারে। আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত মুখটী চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম।। অতীতের কঙ্কালচয়। এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার পূর্ব্বপুরুষের রত্নপেটীকা তোমার মাণিকের আংটী, ফেলে দাও এদের মধ্যে। আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কানখাড়া রেখো। তোমার যেই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটী জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধনধ্বনি "ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।"

১৩। আজ মনে হচ্ছে স্বামীজির যত আশা ভরসা উৎসাহ, যত কর্ম্মযোগ, সেবাধর্ম্ম, দরিদ্রনারায়ণ পূজা তাহা ভারতের এই দীনদরিদ্র মূক লোক সমূহের জন্য। তাহাদেরই জন্য তাঁর কর্ম্ম গ্রহণ—দেশবিদেশে পরিভ্রমণ, মঠ গঠন, সংঘ স্থাপন ইত্যাদি। ইহাই তাঁহার প্রাণের কথা তাঁহার সকল কথার উপর, সকল বিদ্যা, সকল সিদ্ধির উপর। তাঁহার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ভাষার শ্রেষ্ঠ বাণী ইহাদেরই জন্য ঢালিয়া দিয়াছেন। আজ তাঁহার বিশ্বব্যাপী গৌরবচ্ছটা দেখিয়া ভাবের উচ্ছ্বাসে যেন আমরা এই আসল কথাটী ভুলিয়া না যাই। আজ এই স্মৃতির উৎসব যদি আমাদের প্রাণে ভারতের দুঃখদৈন্য পীড়িত সাধারণ প্রজার প্রাণের ব্যথা না জাগাইয়া তোলে, অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা ও সভ্যতার বৃথা অভিমানের

আস্ফালনকে দলিত করিয়া সাধারণ প্রজার সঙ্গে আমাদের ঐক্যবোধ না জন্মাইয়া দেয়, তবে বৃথাই এই উৎসবের আয়োজন ব্যর্থ এই স্মৃতির আবাহন। যদি স্বামীজির নামে কিছু করিতে হয় তবে আজ ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে হইবে যে ভারতবর্ষের সাধারণ জনসংঘের সেবাই করণীয়।

১৪। স্বামীজির বীর হৃদয়ে কোনরূপ দুর্ব্বলতার স্থান ছিল না। তাঁহার সম্মুখে বাধাবিঘ্ন পর্ব্বত প্রমাণ হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৃপ্ত পুরুষকার ও সবল বাহু হেলায় তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়াছিল। কোনরূপ সুখস্বপ্নের কল্পনায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন সংসারে দুঃখ রহিয়াছে। সেই দুঃখের সঙ্গে সংগ্রামই তাঁর সাধনা, জয়ে তাঁর সিদ্ধি। "রোগ শোক দারিদ্র্যযাতনা, সবভাবে তাঁরিই উপাসনা" "দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে, পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা"—ইহা তাঁহারই জীবন সংগ্রামের বীরবাণী। এই দুঃখকে বরণ করিয়াই আমাদিগকেও আজ তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই দুঃখকে বরণ করার উপরই আজ জাতীয় জীবনের গর্ব্ব নির্ভর করিতেছে। এই পবিত্র বিবেকের পুণ্যস্মৃতি সেই দুঃখকে ধারণ করিবার উপযুক্ত পুরুষকার ও পৌরুষ গর্ব্ব, আমাদের অন্তরে জাগ্রত করিয়া দিতেছে।

১৫। আজ দুর্ব্বল ভক্তির বিফল অশ্রুপাত দ্বারা এই বীর-জীবনের স্মৃতির তর্পন চলিবে না। ধর্ম্মভাবের নামে আমাদের আত্মার দীনতা ও হীনতাকে প্রশ্রয় দিয়া আত্মপ্রতারণা করিলে চলিবে না। আজ আমরা চাই শরীরে দৈত্যের মত শক্তি, মনে অদম্য তেজ, হৃদয়ে অসীম প্রেম আর কর্ম্মে অশ্রান্ত নৈপুণ্য। তবে আমরা এই বীর পূজার যোগ্য অধিকারী হইবে। এই মহামানব জীবনপাত করিয়া যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের, ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে কর্ম্মজীবনের দুঃখদৈন্যের সঙ্গে বীরত্বের বন্ধন দিয়াছেন—সেই সেতুবন্ধের উপর দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, শ্রীরামচন্দ্রের কপি

সৈন্যের মত, আমাদের আদর্শ ও জননী দত্ত জন্ম সত্যকে উদ্ধার করিতে। আজ দুর্ব্বল দেহ মন লইয়া পশ্চাতে পড়িয়া বৃথা ক্রন্দনে দিনপাত করিলে চলিবে না।

১৬। আজ তবে এই দেব আদর্শেরই পরিকল্পনায় স্বামীজির মহিমামণ্ডিত জীবনের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া আমাদের সকল পরানুবাদ পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, আমাদের দাসসুলভদুর্ব্বলতা ঘৃনিতজঘন্য নিষ্ঠুরতা বিস্মৃতির অতল জলে চিরতরে ডুবাইয়া দেই। আর এই মুহূর্ত্তেই মুক্ত হইয়া স্বামীজির বীর কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া জ্ঞানের ভাষায় বলি, "জীবমাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম" কর্ম্মের ভাষায় বলি, "আমার বিশ্বাস, আত্মার আদর্শ কর্ম্মে পরিণত করতে আমি জীবন ক্ষয় করব", সেবার ভাষায় বলি "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" আর সর্ব্বোপরি দেশপ্রেমিকের ভাষায় বলি—"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলি—ভারতবাসী আমার ভাই—ভারতবাসী আমার প্রাণ। ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা—আমার যৌবনের উপবন—আমার বার্দ্ধক্যের বারানসী। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

অশ্রুর আক্ষেপ।

(বিমলানন্দ)

বিশ্বের সকল দৃশ্য আয়ত্ব করিতে তুমি চাও।
বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখে পলকেতে পুলক লুকাও॥
তোমার আয়ত্ব থেকে সারা বিশ্ব লুকাতে না পারে।
কিন্তু আঁখি। পাশে আমি কখন কি দেখেছ আমারে?

মনুষ্যত্বের সাধনা।

কর্ম্মপথের পাথেয়।

(শ্রীমতী সবলাবালা দাসী)

(৩)

অর্জ্জুনের ন্যায় মানবমাত্রেরই জীবনে রোগে, শোকে, বিপদে, বহুবার বিষাদ যোগের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়। হয়তো বহুবার তাহা বিফলে চলিয়া যায়। কিন্তু সেই প্রতিবারের আঘাতেই বন্ধন-প্রাচীর কিছু না কিছু ভগ্ন করিয়া যায়। সহসা কোন এক সময়ে সামান্য কারণে অথবা অকারণেই চকিতের মত মনে হয় "কেন এ জীবন ? কি লইয়া আছি ?" সুখ স্বপ্নের মধ্যে মুহূর্ত্তের জাগরণ প্রশ্ন আনে, "এ সকল কি কেবল প্রকৃতির ছলনা ?" সেই মুহূর্ত্তের জাগরণেই বিদ্রোহী 'হৃদয়' পুষ্পমাল্যের অন্তরালে কঠিন লৌহ শৃঙ্খলের বন্ধন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। বুঝিতে পারে, সে প্রভু নয়, প্রবৃত্তিই তাহার প্রভু হইয়া তাহাকে শাসন করিতেছে, সে প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে পারিতেছে না। বুঝিতে পারে,—জগৎ কপটতাময়, জীবন দুঃসহ দুঃখপূর্ণ ভোগসুখের লালসা কেবল মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। জীবনধারণের দারুণ যন্ত্রণা, আপনার ও অপরের দুঃখ কষ্ট, বারবার তাহাকে আঘাত করিতে থাকে। তখন সে কতকটা বুঝিতে পারে যে ভাবে সে জীবনযাপন করিয়া আসিতেছে, তাহাই তাহার পক্ষে উন্নত জীবন নহে, দেশ প্রচলিত প্রথাই আদর্শ প্রথা নহে। বেদনার আঘাত সাবধান হইবারই সঙ্কেত জানাইতেছে, "এ ঠিক নয়, এ ঠিক নয়, ভুল পথে চলিয়াছ।"

গীতায় বিষাদ যোগের পর সাংখ্য যোগে পথ নির্দ্দেশ আছে।

"যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

কর্ম্মের পথে চলিবার পাথেয়ের কিছু প্রয়োজন। সে দুঃখের সম্বলই হোক্ বা আনন্দের সম্বলই হোক্। কোন এক গম্ভীরভাবের সহিত

অন্তরতম গভীর যোগের প্রয়োজন। সেই ভাবটীই যেন জীবনের কেন্দ্র হয়। অনন্ত যাত্রার পথে সেই ভাবটীই যেন পাথেয় হয়। "যোগঃ কর্ম্ম-সুকৌশলম্॥" এই যোগই কর্ম্মের সুকৌশল। কিন্তু কর্ম্মের পথে এই যোগরূপ সুকৌশল গ্রহণ করিতে হইলে কিছু ত্যাগও করিয়া আসিতে হইবে গীতা সেই ত্যাজ্য বিষয়টীকে "সঙ্গ" বলিয়াছেন, "সঙ্গ" শব্দের ভাবার্থে, আমরা স্বার্থ ফলকামনা বা আসক্তি যেকোন অর্থই গ্রহণ করিতে পারি, এবং সকল অর্থগুলির ভাব একই দাঁড়ায়।

"যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

—যোগস্থ হইতে হইলে "সঙ্গ" ত্যাগ করিতে হইবে, অথবা—যোগস্থ হইলে সঙ্গ আপনা হইতেই ত্যক্ত হইবে।—যে অর্থই হোক না কেন ভাবার্থে দুইই এক।

যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম।

জগতে যত কিছু দুসাধ্য সাধিত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার কতক পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক পরিচয় হয়তো আমরা জানি না দুর্লঙ্ঘ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাধা লঙ্ঘন করিয়া ভীরু এক দিনেই বীর হইয়া গেল, মত্তপাপালম্পট এক দিনেই সাধু হইয়া গেল, ঘোর বিষয়াসক্ত একদিনেই সর্ব্বত্যাগী হইল এ দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নহে। বিলাসী কাউন্ট টলষ্টয়,—যাঁহার জুতা পরাইয়া দিবার জন্য দশজন ভৃত্য থাকিত এক দিনেই তিনি মাঠে গিয়া নিজ হাতে লাঙ্গল ধরিলেন, বহুপুরুষ হইতে শোণিত ধারায় প্রবাহিত আভিজাত্যের অভিমান রূপ "সঙ্গ" এক মুহূর্ত্তেই চূর্ণ হইয়া গেল। রাজা লালাবাবু একদিনেই কৌপীনধারী সন্ন্যাসী হইয়া রাজার সম্পদ, চরম বিলাসিতা হইতে চরম দারিদ্র্য দুঃখকে বরণ করিয়া লইলেন। জন্মগত অভ্যাসের বন্ধন ত্যাগ করিবার জন্য দুটিদিনও তাঁহার সময়ের প্রয়োজন হইল না। ভবাণীপুরে নফরচন্দ্র, আফিস ফেরত বাড়ী আসিতেছেন, পথে লোকের ভিড় দেখিয়া থামিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, কুলী ড্রেণে নামিয়া বিষাক্ত বাষ্পে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে উঠাইবার উপায় হইতেছে না, শুনিবামাত্র আফিসের পোষাক খুলিয়া "জয় গুরু" বলিয়া ড্রেণে নামিলেন, আর

উঠিলেন না। নফরচন্দ্রের এইরূপ ভাবে প্রাণদান লইয়া অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে। বুদ্ধিমান বলিবেন "এটা নির্ব্বোধের কায হইয়াছে। না ভাবিয়া চিন্তিয়া সহসা এরূপ অসম সাহসিকতা কেবল হঠকারিতা মাত্র। কুলী দূষিত বাষ্পে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে—ড্রেণে নামিবামাত্র সেই দশা হইতে পাবে সে কথা ভাবিয়া দেখা কি উচিত ছিল না? ববং কিরূপে অন্য উপায়ে তাহাকে তোলা যায় তাহার একটা উপায় স্থিব করিতেও তো পারিতে। আব তুমি নিজে দরিদ্র, তোমাব স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে, সে সম্বন্ধে কি তোমার কোন দায়িত্ব নাই? তুমি যে না ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রাণটা দিয়া ফেলিলে তাহাতে কি তোমাব কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিল না?" বুদ্ধির এই সমস্ত যুক্তি শুনিতে খুব সুন্দর, কিন্তু ইহাব উৎপত্তি চিত্ত দুর্ব্বলতা হইতে। ভয় নিমেষের মধ্যে দীর্ঘ যুক্তিজাল এমন ভাবে রচনা করিয়া তুলে, উপর হইতে যাহার কোন ছিদ্র দেখিতেই পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ এই অসাধ্য সাধন তাঁহাতেই সম্ভব যিনি কর্ম্মের সেই কৌশলটী অন্তরের গভীরতর সম্পদরূপে লাভ করিয়াছেন। লঘুভারের ন্যায়, দুর্ব্বহ দুঃখ দারিদ্র্য ও বিপদের ভার বহন করা তাঁহারই সম্ভব, যিনি কর্ম্মের পথে যাত্রার প্রারম্ভে "সঙ্গের" বোঝাটী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সেই জন্য অন্যের পক্ষে যাহা কঠিন তাঁহার পক্ষে তাহা সহজ অন্যের পক্ষে অসম্ভবও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়।

এই যোগের কথাই—গীতায় বারবার আছে। "যোগ" ব্যাপারটী কি—নানা স্থানে নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে ফলকামী কৃপণ যোগী হইতে পারে না, মুক্ত হইতে হইলে "সঙ্গ" ত্যাগ করিতেই হবে। (ক্রমশঃ)

বদরীপথে শঙ্কর।

(শ্রীমতি—)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, চন্দ্রমা সহসা যেন শৈলশিখর বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং শঙ্করের প্রসন্ন বদনমণ্ডল দর্শনে কৈলাসনাথ প্রেমে আনন্দে অধীর হইলেন। ক্রমে তিনি সান্ধ্যসমীরণ সংক্ষুভিত গঙ্গাতরঙ্গ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কোটী রূপ ধারণ করিলেন এবং অনিমেষ নেত্রে শঙ্করের অঙ্গকান্তি দর্শনে রত হইলেন। হরিদ্বারবাসী সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণ সশিষ্য শঙ্করের চারিদিকে আসিয়া বসিল। সকলেই শঙ্করের শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া শান্তিলাভ করিল। জিজ্ঞাসু প্রশ্ন ভুলিয়া গেল প্রাণিগণ সিদ্ধমনোরথ হইল।

এই ভাবে কতক্ষণ অতীত হইলে একজন তীর্থবাসী ত্যাগী ব্যক্তি শঙ্করকে বিনীতভাবে বলিলেন "মহাত্মন্! আমি বড় দুঃখী দারিদ্র্যবশতঃ সংসারধর্ম্ম কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারি নাই। পরিশেষে রোগশোক দুঃখকষ্টে অভিভূত হইয়া ভগবান দক্ষেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু হে ভগবন হৃদয়ে শান্তি পাইতেছি না।" শঙ্কর এই ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া তাহার অবস্থা অবগত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন 'ব্রাহ্মণ! আপনার জন্য আমি একটী স্তব রচনা করিয়া দিতেছি, আপনি উহা পূজান্তে নিত্য পাঠ করিবেন। ভগবৎ কৃপায় হৃদয়ে শান্তি পাইবেন এবং দারিদ্র্য দূর হইবে।" এই বলিয়া শঙ্কর ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিম্নলিখিত স্তবটী লিখাইয়া দিলেন।

"হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে, স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতি ভয় সূদন মামনাথং, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ১
হে পার্ব্বতী হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশ জাপ্য।
হে বামদেব ভবরুদ্র পিনাকপাণে, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ২

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র, লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৩
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব, গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপোহর লোকনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৪
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ, বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৫
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো, হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ॥
ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকপালমাল, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৬
কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণ প্রিয় মদাপহশক্তিনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৭
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৮
গৌরী বিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়, পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায়।
শর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।

ব্রাহ্মণ স্তবটী পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। এবং শঙ্করকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইভাবে সাধু প্রসঙ্গে ভগবান শঙ্কর হরিদ্বারে কয়েকদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিত্যই দলে দলে লোক শঙ্করের উপদেশ শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল। সকলেই শঙ্করের অমিয় ব্যবহারে ও অমূল্য উপদেশে পরম পরিতুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিল। শঙ্কর গৃহস্থগণকে পঞ্চমহা-যজ্ঞানুষ্ঠান, ও পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতে বলিতেন। ত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিলে তাঁহাকে 'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা' ভাব ব্রহ্ম ভিন্ন কেহ নহে এইরূপ উপদেশ দিতেন। শঙ্কর হৃদয়ে জয়ের বা বিবাদের বাসনা এখনও জন্মে নাই, সুতরাং যাহারা শাস্ত্রীয় বিবাদ করিবার জন্য আসিতেন, তাঁহারা শঙ্করের সরল ও নিরভিমান ভাব দেখিয়া সে বাসনা পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপে শঙ্করের আগমনে হরিদ্বারে বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে যেন একটা জাবন্ত ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কর্ম্মবাদী কুমারিলভট্ট ও প্রভাকর, নৈয়ায়িক উদ্যোতকর প্রভৃতি বৈদিক আচার্য্যগণ ইতিপূর্ব্বে

বৌদ্ধাদি বেদ বিরোধী ধর্ম্মমতের দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন। এক্ষণে শঙ্কর আগমনে তাঁহারা আরও যেন ম্লান হইয়া পড়িলেন। কুমারিল প্রভৃতি তর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন, শঙ্কর কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মমতের মাধুর্য্য প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিলেন।

একদিন একটী তীর্থবাসী বৃদ্ধব্রাহ্মণ শঙ্কর সমীপে আসিয়া বলিলেন "মহাত্মন্! আপনি ত দেখিতেছি অনেক লোককেই স্তব, স্তুতি, পূজা, যাগযজ্ঞ, করিবার উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু আপনারা ত কই কোনরূপ পূজাদি করেন না? আপনার উপদেশ আমি আজ কয়দিনই শুনিতেছি, এবং আপনার ক্রিয়াকলাপ দেখিতেছি, কিন্তু আপনার আচরণের সহিত আপনার উপদেশের এই অনৈক্য কেন? আপনি প্রসন্ন মনে আমার এই সংশয় দূর করুন। আমি জিজ্ঞাসু।

শঙ্কর বৃদ্ধের সরলতাপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া মনে মনে বড় আনন্দিত হইলেন এবং নানা তত্ত্ব কথার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কবিতাবলী তখনই মনে মনে রচনা করিয়া সহাস্যে তাঁহাকে বলিলেন, "হে বিপ্রবর! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সংক্ষেপে তাহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি।

আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈক রূপিনী
স্থিতে দ্বিতীয়া ভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে ॥১
পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনম্।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ ॥২
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং রম্যস্যাভরণং কুতঃ ॥৩
নির্লেপস্য কুতো গন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্য কুতো ধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা ॥৪
নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং নিষ্কামস্য ফলং কুতঃ।
তাম্বুলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা ॥৫
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনা বিধিঃ।
প্রদক্ষিণমনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ ॥৬

অন্তর্ব্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথং মুদ্রাসনং ভবেৎ।
ইদমেব পরাপূজা বিষ্ণোঃ সত্ত্বস্বরূপিনী ॥৭
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবোদেব সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ ॥৮
তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে ॥৯
যোগাদেহাভিমানী স্যাদ ভোগ কর্ম্মণি তৎপরঃ।
জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষী চ তত্ত্বে নাভিমানিতা ॥১০
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥১১

ব্রাহ্মণ আচার্য্যের কবিতাগুলি শুনিয়া যুগপৎ শ্রদ্ধাভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সনন্দন প্রভৃতি শিষ্যগণ তখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণ তখন বুঝিলেন জ্ঞানীর শেষ অবস্থা কিরূপ আনন্দময় হয়। তিনি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া শঙ্কর চরণে প্রণাম-করিয়া গৃহে ফিরিলেন। কয়েকদিন বিশেষ চিন্তার পর ব্রাহ্মণ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিলেন।

হরিদ্বার সাধুগণের তপস্যাস্থান, এবং কেদারবদরী প্রভৃতি পার্ব্বত্য-তীর্থরাজের দ্বার স্বরূপ বলিয়া এস্থানে যেমন সাধু ও তীর্থ যাত্রীর সমাগম হয়, তদ্রূপ সাধুসেবা জন্য পুণ্যার্জ্জনাভিলাষী ধনবানগণের সমাগম হয়। গৃহস্থ ধনবান্ হইতে রাজন্য বর্গ পর্য্যন্ত সকলেই এস্থলে সর্ব্বরকমে সাধুসেবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। কেদার বদরী যাত্রীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অনেকেই শীতবস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার বিতরণে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এই সন্ন্যাসীর দল বদরিকাশ্রমে যাইবেন যেমন প্রচার হইল অমনি কোথা হইতে ভূরি ভূরি শীতবস্ত্র, রজ্জু নির্ম্মিত পাদুকা, পার্ব্বত্য যষ্টি, প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং শঙ্করের শিষ্যদিগের জন্যও আর চিন্তার বিষয় কিছুই রহিল না। এদিকে যে সকল কেদার বদরী যাত্রী অনুকূল সঙ্গলাভের আশায় এখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা এই সন্ন্যাসীর দলকে পাইয়া ইঁহাদের

সঙ্গী হইবার বাসনা প্রকাশ করিল। যে সকল পাণ্ডা যাত্রীদিগকে লইয়া যায় তাহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। সুতরাং বদরীর পথে এই সন্ন্যাসীর দলকে লোকবলের বা পথপ্রদর্শকের অভাব কিছুই অনুভব করিতে হইল না। যাহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারেন তাঁহাদের সবই এইরূপ অনুকূল হয়। অতঃপর শুভদিনে আচার্য্য একটী বিপুল তীর্থ যাত্রিবাহিনীর অগ্রণী হইয়া বদরীকাশ্রমের উদ্দেশে প্রাতে হরিদ্বার ত্যাগ করিলেন।

সেবা।

(বিশোক)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেশের এই অবস্থায় যাঁরা অপরের রোগশয্যায় দুটো মিষ্টি কথাও বলেন তাঁদেরকে ভাল লোক ব'লতে হবে, আর যাঁরা পীড়িতকে আরাম কর্ব্বার জন্য অর্থ ও সামর্থ দেন তাঁরা ত' মহৎ লোকই। তাই ব'লছিলাম যে, দয়া প্রাথমিক হ'লেও ওর দরকার আছে।

এখন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উপাসনার ভাব নিয়ে রোগীদের সেবা করা। উপাসনা বল'তে আমরা বুঝি, পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান, ভজন, সংকীর্ত্তন ইত্যাদি। 'রোগীদের সেবা কর্ত্তে হবে উপাসনার ভাব নিয়ে, এ যে বড় মুস্কিলের কথা হ'ল। আর একেত' রোগী নিয়ে থাকাই অসম্ভব, তাদের ঘৃণা না করে দয়া করে দুচার পয়সা দিলাম বড় জোর দু একবার দেখাশুনা কল্লাম, ব্যাস্। এর উপরে আবার উপাসনা ফুপাসনা—যা আমাদের বাপ দাদারা কেউ শোনেনি পর্য্যন্ত তাই আমরা কর্ব্ব? এ যে নেহাত অসম্ভব ও পাগলামীর কথা।' এই হল সাধারণ লোকের মত। অসম্ভব কিছু নয়, তোমার বুদ্ধিকেই পর্য্যাপ্ত মনে করে তার বাহবা তুমি

নিজে দিতে পার কিন্তু আসল কথা হচ্ছে লোকে তা স্বীকার কর্ত্তে রাজী নয়, এবং বুদ্ধির যে সীমা বা ইতি করা যায় না একথা মনীষীরা বলেন ।

এই যে আর্ত্ত পীড়িত লোক তোমার চারিদিকে রয়েছে, এদের নারায়ণ বুদ্ধিতে সেবা কর্ত্তে হবে একথা জগৎকে প্রথম শুনালেন জগৎ-পূজ্য স্বামী বিবেকানন্দ। সেই মহান্ আচার্য্যের কথা লোকে প্রথমতঃ বিশেষ বুঝতে পাল্লে না, কিন্তু তাঁর প্রাণময়ী ভাব দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে প'ড়ল। ক্রমশঃ সেই ভাব ঘন হ'য়ে মূর্ত্ত হল, কয়েকজন নিষ্কামকর্ম্মী তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কার্য্য সুরু কল্লে, আজ তাদের কার্য্য দেখ্‌লে চমৎকৃত হতে হয় ।

এখন কথা হচ্ছে উপাসনা কল্লে কি হয়? উত্তর সকলেই জানেন ইষ্ট বা ভগবান লাভ, এবং অনেকে বলবেন যে উপাসনা ভক্তেরই কাজ। কিন্তু উপাসনা কর্ম্মীরও আছে, এবং কর্ম্মীও সেই উপাসনা দিয়েই তার ইষ্ট লাভ কর্ত্তে পারে ও করে। উপাসনার অর্থ হচ্ছে—ভগবানের নাম স্মরণ করা—তাঁর গুণকীর্ত্তন করা,—তাঁর ভজনা করা—তাঁর পূজা—তাঁর ধ্যান—তাঁর জপ—তাঁর সন্তোষ এক কথায় তাঁকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকা। ভক্ত এই সব যদি কর্ত্তে পারেন, তাহলে কর্ম্মীও এই সকল কর্ব্বেন তাঁর কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর ইষ্টাকে নিয়ে দিনরাত থাকতে পার্ব্বেন। কিন্তু লোকে বলে এ অসম্ভব। অসম্ভব কিছু নয়, ভক্তও কিছু একদিনে ঐ সব কর্ত্তে পারেননি, তাঁকেও আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে উঠতে হয়েছে। কর্ম্মীও তাই কর্ব্বেন। তবে এ ভাবটা যখন একেবারে অভিনব তখন অভ্যাস কর্ত্তে দেরী হতে পারে, আরও একটা কথা, পিতা পিতামহ তাঁরা এ কথাটা কেউই জানতেন না, তাঁরা চিরকালই শুনে এসেছেন জ্ঞান ও ভক্তির রাস্তা দিয়েই ভগবান লাভ হয়—কর্ম্মের ভাবে বিশেষ সেবার ভাবেও সেই চরম সত্যস্বরূপ ভগবান লাভ হয় একথা তাঁদের কাছে একরকম অজ্ঞাত ছিল সেইজন্যে আমাদের জন্মগত একটা সংস্কারের দরুণ সেবার ভাবে ইষ্ট লাভ হয় একথা প্রথমতঃ ভেবেই উঠতে পারি না, তাই বলে 'অসম্ভব ও প্রলাপ' ইত্যাদি বলা ওসব বাজে কথা মাত্র ।

কর্ম্মী তাঁর সকল কায কর্ব্বেন ঈশ্বরের দাস হ'য়ে—এই ভাবনা তিনি নিরন্তর কর্ব্বেন তবে একদিন প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবেন তিনি সত্যসত্যই যা কিছু কর্চ্ছেন তা ভগবানেরই কাজ।

এই যে পীড়িত নারায়ণ, এদের দয়া তুমি করতে পারনা তোমার একমাত্র কাম্য হচ্চে সেবা করা, উপাসনা করা এঁদের তুমি ভাবের সহিত তাই ক'রে যাও, এক দিন আসবে সেদিন তোমার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার দূর হয়ে যাবে, তুমি শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বরূপ হবে—যা তুমি ছিলে—যা তুমি জান্‌তে না—অজ্ঞান দিয়ে যা তুমি ঢেকে রেখেছিলে, সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম স্বরূপে তুমি উদ্ভাসিত হবে। আর মহান আচার্য্য ব'লছেন, যে ঠিক ঠিক ভাব নিয়ে সেবা করবে তার সেদিন খুব নিকটে।

তবে গোড়াতেই কিছু সকলের সমস্ত পীড়িতকে নারায়ণ ভাবে সেবা করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। চেষ্টা করতে হয় তাহ'লেই নারায়ণ ভাব আসে। প্রথম প্রথম অবশ্য মলমূত্রাদি পরিপূর্ণ, কুৎসিত রোগগ্রস্ত রোগীদের দেখ্‌লে তার দিকে অগ্রসর হওয়াই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায় এবং ফিরেই আসতে ইচ্ছা হয়। তাই বলে কি ফিরে আসবে', না। সর্ব্বদা মনে রেখো সেই মহান আচার্য্যের বাণী—ভগবান তোমার দুয়ারে নানা মূর্ত্তিতে উপস্থিত—তোমাকে তাঁর সবকটা মূর্ত্তিই বরণ করে নিতে হবে।' যেটা ভাল মূর্ত্তি সেইটাই পূজা কর্ব্ব অন্য গুলি দেখবোনা এ কথা যারা ভাবে বা বলে, তারা অতি নিম্নস্তরের সাধক—ঢের দেরী আছে তাদের ইষ্টলাভ হতে। তুমি তাঁর রুদ্র—মধুর, পীড়িত সুস্থ, দুঃখী সুখী সব মূর্ত্তিই বরণ করে নেবে তবেই ত' তাঁকে পুরোপুরি পাবে। ভগবান আমাদের কে? তিনি আমাদের ইষ্ট, তিনি আমাদের প্রেমাস্পদ প্রিয়তম অন্তরের অন্তরতম, আমাদের সবটুকু ত' তিনি—তিনি ছাড়া আর কি আছে। তবে আমরা বলি যে আমরা তোমাকে অনুভব কর্চ্ছি বটে কিন্তু দেখ্‌তে ত' পাচ্ছি না—তাই সেই অমূর্ত্ত চরাচরব্যাপী ভগবান মূর্ত্ত হয়ে তোমার সামনে হাজির। যোগীগণ যাঁর কোটি কোটি জন্ম তপস্যা করেও অন্ত পায় না তিনি আজ সান্ত হয়ে এসেছেন তোমার দ্বারে রোগীর বেসে, আর্ত্তের বেসে—এসে ব'লছেন আমি এসেছি তুমি না

ডাকতেই আমি এসেছি—তুমি কি তাঁকে ফেরাতে পার? কখন না। তিনি নিজে এসেছেন এসে ব'লছেন আমার সেবা কর—কর সেবা তাঁর, ধন্য হয়ে যাও, শুভ মুহূর্ত্ত পরিত্যাগ ক'রো না। যে নিষ্ঠুর তাঁর পীড়িত মূর্ত্তি ঘৃণা করে সে যে তাঁর আনন্দ মূর্ত্তি ঠিক ঠিক ভাবে নিতে পারে এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেই কর্ম্মী—সেই ভক্ত—সেই উপাসক যে তাঁর কাজ—এই কথা জেনে সব কাজ করে।

পীড়িত নারায়ণের সেবায় এমন সব অনেক কাজ করতে হয় যা সাধারণ উপাসনার দিক্ দিয়ে বড় কঠিন বোধ হয়। যেমন একজন রোগীর নিউমোনিয়া হয়েছে সে খেতে চাইছে আম। এক্ষেত্রে যিনি সেবক, তিনি কি কর্‌বেন? ভগবান আম খেতে চাচ্চেন তা' যেখান থেকে পারি আম এনে খাওয়াই—তিনি ত' ভগবান, তাঁর কিছু লোকসান হবে না—এরূপ ধারনা সেবকরা কর্‌বেন না নিশ্চয়। তাতে তাঁর উপাসনার ত্রুটি হবে। সত্য কথা ভগবানের আবার অসুখ বাড়বে একথা কিছুই নয়। কিন্তু রোগ ত' ভগবানের নয় তিনি মূর্ত্ত হয়ে যে পঞ্চভূতাত্মক দেহের মধ্যে আছেন তার—সেই পবিত্র ভগবানের মন্দির জীর্ণ হয়েছে তাকে মেরামত কর্ত্তে হবে। রোগী যদি কিছু অন্যায় করে—যদি অন্যায় রকম কিছু আবদার ক'রে বসে তা হ'লে সে আবদার মেটাতে হবে, সে ভগবানের মহৎ খেলায় ব'লে চরিতার্থ কর্ত্তে' হবে এমন ব্যবস্থা নয়। ব্যবস্থা হচ্ছে সেই অন্যায়ের প্রতীকার করা মা যশোদার মত। যাঁরা রোগীকে সাধারণ ভাবে দেখেন, আর যাঁরা রোগীকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করেন এই দুইয়ের মধ্যে প্রতীকারের তারতম্য হবে। শেষোক্ত ব্যক্তি অতি মৃদুভাবে মিষ্টিকথায় সেই অন্যায়ের প্রতীকার কর্‌বেন। কারণ তিনি জানেন যে রূঢ় বা হট-কারী তিনি হতে পারেন না—কারণ রোগী তাঁর উপাস্য, তাঁর প্রিয়তম তাঁর অসম্মান, তাঁর কষ্ট তিনি হতে দিতে পারেন না।—

এখন আমরা যা ব'ললাম, তা একটু কঠিন হলেও, কার্য্যকরী এবং ঐ ভাবে সেবা নির্দ্দোষ হয়। যাঁরা সেবা কর্‌বেন তাঁদের দুচার কথা ব'লে উপাসনারভাবে সেবার বিষয় মোটামুটি এবার শেষ কর্ব্ব। কোন ভাব নিয়ে কাজ কর্ত্তে নেমে যদি সেই ভাবটা বরাবর বজায় না থাকে তা হ'লে

কাজ বড়ই নীরস ও অপ্রীতিকর হয় এবং বেশীর ভাগ কাজ মোটেই ভাল হয় না। তার উপর রোগীর সেবা উপাসনার ভাব নিয়ে একটু সন্তর্পনে, সাবধানে কর্ত্তে হয়। যাঁরা খুব উচ্চ অধিকারী তাঁরা গোড়া থেকেই সেবাকে উপাসনার ভাবে নিয়ে কাজে লেগে যান। কিন্তু যাঁরা নূতন ব্রতধারী তাঁদের সেবা ও উপাসনা দুটো পৃথক জিনিষ প্রথমতঃ মনে হ'লেও দুই কর্ত্তে হবে। রোগীর সেবা কর্ব্বার সময় খুব ভাব্‌বে ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং কর্ম্মে অবসর হ'লেই চিন্তা কর্ব্বে যে কতদূর তুমি এগিয়েছ। তোমার সেবায় ও উপাসনায় কোনটা পার্থক্য ঘটাচ্ছে, এই সব বিষয় ভাব্‌বে। এই হ'ল কর্ম্মীর ধ্যান। নূতন যাঁরা তাঁরা প্রত্যহ তাঁদের নিজ নিজ ইষ্ট চিন্তা কর্ব্বেন এবং কিয়ৎক্ষণ জপ ও ধ্যানাদিতে নিযুক্ত থাক্‌বেন, তাতে তাঁদের মন পবিত্র ও প্রফুল্ল থাক্‌বে এবং পবিত্র মনেই ভাবের ছাপ শীঘ্র ফুটে ওঠে। এমনি কর্ত্তে কর্ত্তে এমন একদিন আস্‌বে যেদিন আর তাঁর পৃথক ধ্যান ও জপ কর্ত্তে হবে না, যেদিন তিনি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবেন, প্রত্যেক রোগীর দেহ ভগবানের পবিত্র মন্দির এবং সেই মন্দিরে রয়েছেন যিনি—তিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি সেবকের নিজের ভেতরেও রয়েছেন।

তৃতীয় কথা—আত্মভাব থেকে সেবা করা। এটা খুব উচ্চ ভাবের কথা। জগতে যা কিছু দেখ্‌ছি, সবই আমি বা আমার, এই বুদ্ধি খুব উচ্চ হ'লেও এক পক্ষে খুব সহজ। এতে উপাসনা নেই। যেমন আমার মা, বাবা, ভাই, বোন, তেমনি যেখানে যত আতুর পীড়িত আছে তারা সবাই আমার নিজের। আমার নিজের লোক পীড়িত হ'লে আমি যেমন উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত তাঁদের সেবা করি সেই রকম ভাবে অভেদ বুদ্ধিতে জগতের পীড়িতদের সেবা কর্ত্তে হবে। উপাসনার ভাব থেকে এটা আরও উচ্চ আরও নিকটতর ভাব। এবং সত্য কথা ব'লতে এইটাই নিকটতম ভাব। উপাসনায় আমি এবং আমার ইষ্ট দুজন পৃথক ব্যক্তি আর এ ভাবে এ ভেদ নাই, এ ভাবে আমি আমার সেবা কর্চ্ছি। রোগীর ডান হাতে ঘা হয়েছে কি ভাবে হবে? যেমন আমার হাতে ঘা হ'লে আমি নিজে তাকে

পরিচর্য্যা কর্ত্তাম, বা অপরে আমার করুক যে ভাবে আমি আশা কর্ত্তাম, সেই ভাবেই আমি নিজে রোগীর সেবা কর্ম্ম।—এই ভাব হ'ল আত্মভাব এই সেই সমভাব যে ভাবে কর্ম্ম ক'রতে ভগবান গীতামুখে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন।—এই ভাবে সেবা কর্লে তার মুক্তি অচিরেই হয় এবং সে সর্ব্বদা আনন্দময় শাশ্বতে অবস্থান করে।

ভগবান বুদ্ধ দেখলেন যে দেশশুদ্ধ লোক জরা ব্যাধি ও মরণগ্রস্থ। তাঁর বিরাট হৃদয় কেঁদে উঠল তাদের দুঃখে, তিনি দেখলেন যে তিনিই সব, তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পীড়িত। সেই মহান্ পুরুষ ব্যাধির ঔষধ অন্বেষণ কর্ত্তে স্ত্রী পুত্র রাজ্যধন সব পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ কর্লেন, কঠোর তপস্যা করে. তিনি সর্ব্বব্যাধি হর অমৃতের সংবাদ নিয়ে ফিরে এলেন। 'যে যেখানে আছ, শোন, আর্ত্ত পীড়িতের সেবা কর তোমার নির্ব্বাণ হবে' এই তাঁর উপদেশ। তিনি স্বার্থপরের মত নিজের মত নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হন নাই। তিনি সংবাদ নিলেন প্রথমে, কি করে জগতের শোক তাপ ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের মুক্তি হয়, সেই কথা তিনি দিগদিগন্তে প্রচার করে দিলেন।

আজ দেশবাসীর কাছে আমার প্রার্থনা, তোমরা যে যেখানে আছ, গৃহে কি অরণ্যে, পর্ব্বতে কি সমুদ্রতটে, গৃহী কি সন্ন্যাসী যে কেউ তোমরা আছ, তোমার নিজ আর্ত্ত, পীড়িত স্বরূপ আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সেবা প্রার্থী, তুমি তার সেবা কর—দয়া নয় সেবা—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে—মান যশঃ—খবরের কাগজে নাম বেরুবে রাজা-খেতাব মিলবে—বা পরলোকে ১০০ কোটি বৎসর নানা ভোগ সুখে পরিবৃত থাকবে.এ সব ফলের প্রত্যাশা ছেড়ে দিয়ে অনন্য চিত্তে সেবা করে যাও—তোমার হৃদয় প্রশস্ত হবে, চিত্ত নির্ম্মল হবে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ হবে।—হে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা দেশের বর্ত্তমান মহা সঙ্কটের দিনে একমাত্র উপায় হচ্ছে সেবা। তুমি দেশের প্রত্যেক মূর্ত্ত ভগবান, ক্রমশঃ দেশব্যাপী বিরাট ব্রহ্মের সেবা কর—দেশের প্রকৃত কল্যান হবে, আর যুগাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ তুমি লাভ করবে—তুমি ইষ্টলাভ করবে ও মুক্ত হয়ে যাবে।

সমালোচনা।

সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য—প্রথম খণ্ড—মূল্য দুই টাকা—শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ বা মধুকৈটভ বধ—শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত—৯৮।১নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা কলিকাতা। শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া যথার্থ সত্য নির্দ্দেশ করা ভাল, কিন্তু মহাপুরুষেরা যখন শাস্ত্রোক্ত দেবদেবী দর্শন করিয়া থাকেন তখন এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না যে কোন সত্য প্রকাশ করিবার জন্য রূপকচ্ছলে শাস্ত্রকারেরা পৌরাণিক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। শাস্ত্রে যে ঈশ্বরীয় লীলা যথাযথরূপে বর্ণিত আছে তাহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা ও বাস্তবতার সমন্বয় কোথায়—এইটী দেখানর নাম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—গ্রন্থকার ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত—তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। এই সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের শেষ আচার্য্য এবং ভক্তের জীবনী পাঠে মানবের স্বাধীন বৃত্তির বিকাশ ঘটিবে। কিন্তু প্রত্যেক জাতির একটী মর্ম্মস্থান আছে যেখানে ঘা দিতে গেলে অতি বড়, অতি মহৎকেও সে তুচ্ছ করে। পণ্ডিত শিবনাথ একস্থলে বলিয়াছেন "কিছুদিন হইতে একটী চিন্তা গুরুতররূপে হৃদয়কে অধিকার করিতেছে। আমি এতদিন individual ও Society সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা লিখিয়া বা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই individual এর জন্যই Society, individual আপনার পূর্ণ বিকাশ লাভ করুক, তার পর Society থাক্ আর না থাকুক। Individual গড়িতে গিয়া যদি Society ভাঙ্গিয়া যায়, কি করা যাইবে? * * * এই ভাবেই এতদিন উপদেশ দিয়া, ও কার্য্য করিয়া আসিয়াছি; আধ্যাত্মিক জীবনরাজ্যেও এই individualismকে লইয়া গিয়াছি। আমার

ধর্ম্মবুদ্ধিই আমার চালক, শাস্ত্র গুরু কিছুই নয়।"—তাঁহার এই সাম্যবাদ সাধারণে প্রচার করায় সমাজ ভীত হইয়া গ্রহণ করিল না। তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার যেরূপ অবস্থা প্রতি ব্যক্তিরই সেইরূপ মানসিক স্বাধীন বৃত্তি সম্ভব। কিন্তু সে ভ্রম শীঘ্রই তাঁহার নিকট ধরা পড়ে। তিনি তাহার পর লিখিয়াছেন "কিন্তু এখন মনে হইতেছে, অতিরিক্ত individualism আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষেও ভাল নয়। কতকটা self discipline ও self repression সে পক্ষে ভাল। এ জন্য সাধনাবস্থাতে গুরুর অধীন থাকিবার নিয়ম ভালই বোধ হয়।"—কিন্তু তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। কারণ একেবারে গুরু ও শাস্ত্র অস্বীকার করায় তখন নবীন সমাজে ফাট ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত—বেঙ্গল বুক কোম্পানী ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—মূল্য দুই টাকা মাত্র। আচার্য্য সম্বন্ধে বাঙ্গালায় প্রথিতনামা লেখকদের প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। "তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক তিনি সাহিত্যিক। কর্ম্মী রামেন্দ্রসুন্দর নীরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্ম জীবনে অনন্য সাধারণ বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনে যে বিশেষত্ব ছিল, সেই বিশেষত্বের প্রভাবেই তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। সে বিশেষত্ব—তাঁহার দেশাত্মবোধ। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিগত ভাবের সুবর্ণে কোনও খাদ ছিল না।" এই রামেন্দ্র-কথা সাধারণের নিশ্চয়ই মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে।

গীতাঞ্জলি—কবিতার ছোট বই—শ্রীসাহাজী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। মূল্য দুই আনা। আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিজয়-বাণী—(১ম সংখ্যা) শ্রীঅক্ষয়কুমার দাশ গুপ্ত। প্রকাশক শ্রীশান্তিভূষণ দাস গুপ্ত বি, এ ১৬৭নং রামকৃষ্ণপুর লেন,

শিবপুর হাওড়া মূল্য ছয় আনা। ইহাতে পরমভক্ত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেব-শর্ম্মার উপদেশ আছে।

কর্ম্মের পথে—স্বামী স্বরূপানন্দ—প্রকাশক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কল্পতরু-পাব্লিশিং—হাউস্। চাঁদপুর, ত্রিপুরা। মূল্য ছয় পয়সা। বর্ত্তমান জাতীয় তপস্যায় এই পুস্তিকা নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিৎ। "বিশ্বের নেতৃত্ব যিনি গ্রহণ করিবেন তিনি তোমাদের আমাদের মতই মানুষ, শুধু আত্মোৎসর্গের প্রচণ্ড চেষ্টার মধ্য দিয়া তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবেন। * * * পতিতোদ্ধার যাহার জীবন ব্রত নয়, জন সেবার যূপকাষ্ঠে সকল স্বার্থকে যে বলি দেয় নাই, লাঞ্ছিতের বিষণ্ণ বয়ানে, নিরন্নের বিদগ্ধ জঠরে,—আহতের শোণিত স্রাবে নিজের অস্তিত্বকে যে জন সর্ব্বময় দেখে নাই, তাহাকে নেতা বলিয়া মানিব না।"—সন্ন্যাসীর ইহাই নেতৃত্বের আদর্শ।

বস্ত্র-যজ্ঞ—"চরকা আমার স্বামী সুত, চরকা আমার নাতি। চরকার দৌলতে আমার, দরজায় বাঁধা হাতী॥"—এ ছড়া আজ বাঙ্গালী ভুলিয়াছে বলিয়া এত দুর্দ্দশা। "There was a time, I believe, when the Charka was a familiar object in every household and I do not see why it should not be brought in the use again."—H. E. Lord Ronaldshay। এদেশে চরকার উপকারিতা লর্ড রোনাল্ডসে যথার্থ উপলব্ধি করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন। "বস্ত্র-সঙ্কট দিন দিনই ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। সুতাকাটা এবং চরকা ও তাঁতের প্রবর্ত্তন দ্বারা অবশ্য ইহার প্রতিকার হইবে। কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে এই ভীষণ অভাব দূর করিবার জন্য" কি উপায় অবলম্বন করা উচিৎ তাহা এই পুস্তিকায় আছে। প্রণেতা শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মূল্য এক আনা। এজেন্ট—কলিকাতা—এম্, ধর ৪৯।২ এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বাঁচিবার পথ—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মূল্য /১০। বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অবস্থোপযোগী কর্ম্মীশিক্ষক কর্ম্মীরজীবিকা এবং দেশ হইতে অজ্ঞানের জড়তা দূর করিবার জন্য আদর্শ পাঠশালা, গ্রাম, উপদেষ্টামণ্ডলী নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, এবং লাইব্রেরী সম্বন্ধে আলোচনা করা

হইয়াছে। "সহজে, অতি অল্প ব্যয়ে, সাধারণ শিক্ষার সুব্যবস্থা এই পুস্তিকাতে, সংক্ষেপে লেখা হইল। নীরব কর্ম্মিগণ এই প্রণালীতে কাজ করিলে, অল্প সময়ে, সামান্য খরচে ও সহজ চেষ্টায় লোকের অশেষ কল্যান হইবে। কর্ম্মিগণ কাজে অগ্রসর হউন, ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা' —লেখক।

কৃষি বিস্তার—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মূল্য ✓৹ আনা। "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার অর্দ্ধ চাষ-বাস। তার অর্দ্ধ চাকরী-পাশ, ভিক্ষায় নাই কোন আশ।" বাঙ্গালী তোমার কথা তুমিই বুঝ। এই পুস্তিকায় চাষবাস সম্বন্ধে বহু কথা আছে।

অন্তরালের কথা।

(বিমলানন্দ)

আমারে দেখেছ তুমি সর্ব্ব দোষে দূষিত দানব
আমারে দেখেছ তুমি সর্ব্ব গুণে ভূষিত মানব।
কিন্তু হায় অন্তরাল চিরকাল বলিছে তোমারে
আমারে দেখনি তুমি, ওহে অন্ধ! দেখেছ তোমারে।

সংবাদ।

রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য ঔষধালয় বেলুড়। আমরা উক্ত দাতব্য ঔষধালয়ের ১৯২০ র বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৯১৩ সালে মাত্র ১০০০ রোগীর পরিচর্য্যা করা হয় কিন্তু ১৯২০ সালে ১২৫১৪ রোগীর পরিচর্য্যা করা হয়। তাহার মধ্যে ৩৮৭২ জন নূতন রোগী। বালী মিউনিসিপালিটী ১৯১৭ পর্য্যন্ত ১২০৲ টাকা করিয়া বাৎসরিক দান করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আশাকরি পররর্ত্তী বৎসরের জন্য ঐ টাকা দান করিয়া তাঁহাদের বদান্যতার পরিচয় দিবেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস এবং অপরাপর বহু কেমিষ্ট এবং কবিরাজদের এই সৎকার্য্যে সাহায্যের জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। মেসার্স বি, কে, পাল ইহার জন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ কারণ এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ ঔষধ তাঁহারা দান করিয়া থাকেন। ডাক্তার বিপিন বিহারী ঘোষ, জে, এন্ কাঞ্জিলাল, দুর্গাপদ ঘোষ, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিকিৎসালয়ের বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন।

গতবর্ষের (১৯১৯) টাকা মজুত ৩৩২৶১০ বর্ত্তমান বর্ষে (১৯২০) প্রাপ্ত ১৬৮।৴০ মোট জমা ৫০০।৶১০ মোট খরচ (১৯২০) ১৬৭॥৴০। যাঁহারা এই মহৎকার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা (১) প্রেসিডেণ্ট বেলুড় মঠ, হাওড়া (২) অথবা সেক্রেটারী উদ্বোধন অফিস বাগবাজারস্থ ভবনে অর্থাদি প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এবং শ্রীশ্রীস্বামীজির তিথি পূজোপলক্ষে ৩২ জন ব্রহ্মচর্য্য এবং ২৪ জন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। কন্যাকুমারী হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বহু নগরীতে ঐ উৎসব কার্য্য সমাধা হইয়াছে।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

পুষ্প বিকশিত হইয়া মানবের আনন্দবৰ্দ্ধন করে—প্রবল অনিল কম্পনে ছিন্ন হইয়া উহা ঝরিয়া পড়ে। স্বার্থক হয় সে বিকাশ ও সৌন্দর্য্য ভাগবতী মূর্ত্তির অঙ্গ ভূষণে। চঞ্চলা দেবী-লীলোদ্যানে সদ্যঃ জীবন্ত প্রস্ফুটিত কুসুম কুমারী। সে সৌন্দর্য্যে বিশ্ব পুলকিত হয়—মানবের কলুষ নিশ্বাসের বেগে ছিন্ন হইয়া ঝরিয়া পড়ে। স্বার্থক হয় সে পবিত্র সৌন্দর্য্য শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণে।

* * *

স্বর্ণ-ভূষণ মানবাঙ্গে মলিন হয়—অগ্নিস্পর্শে পুনরায় তাহার ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠে—স্বর্ণ খাটি হয়। বিলাস বাসবে নারীর অঙ্গে কি যেন একটা কালিমা, একটা আবরণ তাহার স্বভাব সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া দেয়—তপস্যার অগ্নিস্পর্শ সে সৌন্দর্য্যকে পুনরায় প্রকাশ দিয়া তাহাকে অধিকতর সুন্দর করিয়া তুলে। অনলের কুসুম শিবেতে সর্ব্বস্ব অর্পণকারিণী গৌরী মূর্ত্তি কি অপূর্ব্ব। কি পবিত্র। কি মধুর।

* * *

চন্দন তরু মানবকে শীতল ছায়া দান করে—নিষ্ঠুর নিজ ভোগের জন্য তাহার ছেদন করে কিন্তু তখনও সে নিঃস্বার্থভাবে সুগন্ধ বিতরণে কাতর হয় না। নারীর শীতল ক্রোড়ে এ বিশ্ব লালিত। ক্ষণিক ভোগের নিমিত্ত মানুষ তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়—তাহার দেহ মন, আত্মার স্বাধীনতা কাটিয়া—কিন্তু তখন তাহার নিঃস্বার্থ ত্যাগের সুবাস বাহির হয় তাহার মাতৃত্বের মধ্য দিয়া।

অমরার উর্ব্বশী মেনকার সৌন্দর্য্য মেলনী দর্শনে জাগিয়া উঠে অন্তরে পশুটা—সে হিংস্রক ভাঙ্গিয়া দেয় সেই আকাঙ্ক্ষা লালসায় গড়া ভোগ বিলাসের নন্দন কানন। আর তপঃক্ষেত্র কৈলাসে গণেশ-জননীর মাতৃ মূর্ত্তি পশুর হৃদয় শান্ত করে—পশুরাজ তাই মেষ শিশুর মত মায়ের পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়।

* * *

পদ্ম কুট্মলকে বিকাশের পূর্ব্বে পঙ্কে বাস করিতে হয়—কীট তাহাকে কাটিয়া ছিন্ন করিতে চায়—সলিল তাহাকে নিজের কক্ষে অবরুদ্ধ করিয়া তাহার স্বাধীন বিকাশের অন্তরায় হয়। সেই কারা-মুক্তির সংঘর্ষে কত স্ফুটনোন্মুখ কলিকা তাহাদের বশীভূত হইয়া শ্রীহীন হয়। কিন্তু সেই সংঘর্ষই আবার ক্ষুদ্র কলিকার শক্তি বাড়ায় যে শক্তিতে সে জয়শ্রীর রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া পান্নাপত্র সখি সমভিব্যাহারে স্বাধীন ভাবে মুক্ত বাতাসে ক্রীড়া করে। ভক্ত তখন যত্ন সহকারে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া শ্রীভগবানের পায়ের আসন রচিয়া দেয়। সংসার মালিন্যের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় পবিত্র কুমারী। মানুষ তাহাকে নিজস্ব করিবার জন্য তাহার সকল স্বাধীনতা কাটিয়া নিজের গণ্ডীতে অবরোধ করিয়া রাখিয়া দিতে চায়। কিন্তু সেই কারামুক্তির সংঘর্ষে যে নারী সীতার ন্যায় অপূর্ব্ব ধৈর্য্যশালিনী, সাবিত্রীর মত মৃত্যুকে উপেক্ষা করে,—তখন উজ্জ্বল হয় সকল তুচ্ছতার মধ্যে বিশ্বের নিখিল মাধুর্য্য, পবিত্রতা, গৌরবের ব্রহ্মচারিণী সতী। ভক্ত তখন নিবেদন করে সেই পবিত্র কুমারী সর্ব্বভূতে মূর্ত্ত নারায়ণের সেবায়।

* * *

পাহাড় পর্ব্বতে, নদ নদীতে ধরিত্রীর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে—কৃষ্ণ মেঘের চপলার চাঞ্চল্যে নীলিমার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। কিন্তু স্বার্থক হয় সে সৌন্দর্য্য যখন উথলিয়া পড়ে ধরিত্রীর অন্নদানের মধ্য দিয়া, নীলিমায় মেঘের বারি বর্ষণের ধারায়। পরমসুন্দরের জীবন্ত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে নারীর অঙ্গ-ছবিতে—কিন্তু সার্থক হয় সে

সৌন্দর্য্য-মাতৃত্বের গৌরবে—সন্তানের শুষ্ক জিহ্বায় হৃদয়ের করুণা ধারায় —জীবের পালনে—অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে।

(২)

যতদিন গাছ ছোট থাকে ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয় যেন গরু বা অপর কিছুতে তার অনিষ্ট না করে। কিন্তু যদি চিরকাল ধরিয়া কঠিন বেড়ার নিগড়ে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে সে বৃক্ষের স্বাধীন বৃদ্ধিশীলতার নাশ হেতু তাহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। সেইরূপ মানবের শৈশব কালের জন্যই সমাজ এবং ধর্ম্মের আইন-কানুন দরকার কিন্তু যখন সে নিজের পায়ে হাঁটিতে, নিজের চক্ষে দেখিতে, নিজের মন দিয়া শিক্ষা করিতে চায় তখন আমার পক্ষে যাহা সহায় হইয়াছিল সেইটাকে সকল মানবের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের একমাত্র উপায় এবং নিয়ম স্থির করিয়া বলপূর্ব্বক সকলের উপর চালাইতে যাওয়া অর্থে মানবের স্বাধীন বিকাশের অন্তরায় হওয়া।

* * *

প্রশ্ন হইতেছে—সকলেই যদি নিজের মতে চলে তাহা হইলে সমাজ চলিবে কি করিয়া? কিন্তু সমাজের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ব্যষ্টি মানবের সমষ্টি হইতেছে সমাজ। অতএব ব্যষ্টির মধ্যে প্রাণের ঘন স্পন্দন যত অধিক ও দ্রুত হইবে, সমষ্টি সমাজও ততই জাগ্রত এবং উন্নত হইবে। ব্যষ্টি যদি মুখ প্রক্ষালন হইতে বেদ পাঠ পর্য্যন্ত যন্ত্রের মত সম্পাদন করে সমাজও অচিরেই প্রাণ হীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হওয়ায় সম্মুখস্থিত নব ভাবোত্থানের সংঘর্ষে চূর্ণ হইয়া যায়।

* * *

দেবত্ব ও পূর্ণত্ব প্রতি মানবে বর্ত্তমান। তমের গাঢ় আবরণ উন্মোচন করিয়া মানবের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা অনন্ত শক্তিমান হওয়াই জীবন সংগ্রামের উদ্দেশ্য—তা নেতি নেতি বিচারের দ্বারাই হউক, পরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াই হউক, কোনও অমানব পুরুষে ভাল-বাসার দ্বারাই হউক, চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারাই হউক, কলা বা

জড় বিজ্ঞান সাহায্যেই হউক—যে কোন বিষয়ে তদ্গত চিত্ততা বা তন্ময়ত্ব যে কোনও ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন সেখানেই সর্ব্বভূতান্তর্যামী সত্য স্বরূপ ভগবান প্রকটিত হইয়াছেন দেখা যায়।

* * *

ভারতবর্ষে যদ্রূপে ধর্ম্মের স্বাধীনতা, ইউরোপে তেমনি সমাজের স্বাধীনতা। কিন্তু ইউরোপ বহু প্রচেষ্টার ফলে যে সমাজের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—যাহার বলে আজ সে এতবড় প্রতাপশালী, এত বড় উন্নত—সেই গূঢ়তত্ত্ব সে অদ্যাবধি কোন জাতির নিকট প্রকাশ করিতে চাহে না। সে জগৎকে দান করিতে চায় তাহার মাতুব্বার (dogmatic) ধর্ম—যাহার দ্বারা সে জগতের সকল স্বাধীন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ নিরোধ করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় দৃঢ় সঙ্কল্প। আর ভারতীয় উচ্চবর্ণেরা তাহাদের অপূর্ব্ব বিশ্বালোড়নকারী উদার, প্রেমস্বরূপ ধর্ম্ম কাহাকেও শিখা... না, কেবল অপর জাতির সহিত নিজেদের একটা সংকীর্ণ বি... সমাজ কাবার নির্দ্দেশ করিয়া বড়াই করিয়া আসিতেছে। সেই ধর্ম্ম ...নের অভাবে জগতে আজ কোটি কোটি প্রাণী পশুর ন্যায় ... বিচারণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই ইউরোপীয় স্বাধীন সমাজ ... ভারতীয় উদার ধর্ম্মের সমবায়ে বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ ... সাধন হইবে।

* * *

... প্রাণ-সম্পন্ন কর্ম্মী-সমাজ জড়জগতে নব নব তথ্যের ... বা দুরাতিক্রমনীয় সিন্ধু, আকাশকে আজ রাজপথে পরিণত ... বিজলীকে দাসীর কর্ম্মে নিযুক্তা রাখিয়াছে—কিন্তু ধর্ম্মহীন ...ড় শক্তি আজ তাহাকে দেবতা না করিয়া—করিয়াছে ...দান্তরে ভারতে উদার ধর্ম্ম বহুবার ঘোষণা সত্ত্বেও, বহু ... আবির্ভাব সত্ত্বেও বিস্তার হীন সমাজ তাহার প্রচারে অন্তরায় ... ধর্ম্মকে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছে যাহা আজ অতীতের বল্মীক স্তূপ বলিয়া প্রতীয়মান।

কিন্ত আজ পাশ্চাত্য তাহার সকল জড় সম্পদ লইয়া এই মহান বিরাট অত্যাদার ভারতীয় ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই দুই জলস্তম্ভের সংঘর্ষে যে এক বিশাল নগ তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে, চাহিয়া দেখ মানব, তাহার শুভ্র শীর্ষে হাস্যানন মহাযোগী যুগাবতার রামকৃষ্ণ।

ভূমার সন্ধানে

(পথিক

একদা দেবর্ষি নারদ, আদি-ঋষি ব্রহ্মিষ্ঠ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয় ও শ্রদ্ধা সহকারে কহিলেন "ভগবন্, আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।" সনৎকুমার কহিলেন, "তুমি এযাবৎ যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা আমাকে বল, আমি তাহার পরবর্ত্তী বিষয় তোমাকে উপদেশ করিব,' নারদ বিনীত ভাবে কহিলেন, "আমি, চতুর্ব্বেদ ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, শিক্ষাকল্পাদি শাস্ত্র, নিতিশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রাজনীতি বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, ও নৃত্যগীতাদিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ভগবন্, আমি শুধু বাহ্য বিকারকেই অবগত হইয়াছি, উহাদের অন্তর্নিহিত অধিকারী আত্মাকে জানিতে পারি নাই। আপনার ন্যায় মহত্মাদিগের মুখে শুনিয়াছি যে 'আত্মবিৎ' হইলেই শোকাতীত হওয়া যায়, সেই জন্যই বোধ হয়, এত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াও আমি দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই, আপনি কৃপাপূর্ব্বক দাসকে দুঃখের পারে যাইবার উপায় বলিয়া দিন।"

দেবর্ষি এই কথা বলিয়া নীরব হইলে পর, ভগবান্ সনৎকুমার, শিশুকে যেরূপভাবে ধীরে ধীরে এক সোপান হইতে সোপানান্তর অতিক্রম করাইয়া ছাদে লইয়া যাইতে হয়, সেইরূপ ভাবে প্রথমে স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বুদ্ধি-গ্রাহ্য বিষয়ের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া, সর্ব্বশেষে মনবুদ্ধির অতীত, নির্ব্বিশেষ,

আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্ম তত্ত্ব উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে, কহিতে লাগিলেন।

"বৎস, তুমি এতাবৎকাল যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা শুধু সেই মূল বস্তুর "নাম" বা বাহ্যবিকার মাত্র—শুধু 'নাম' জানিলে বস্তুকে জানা যায় না, কিন্তু সেই নামকেই অবলম্বন করিয়া বস্তুর সন্ধান করিলে বস্তুও আত্মপ্রকাশ করে। যাহারা এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিয়া শুধু নামেতেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি না থাকিয়া, নামকে অবলম্বন করিয়া, অধিকারী ব্রহ্মেরই 'উপাসনা' করে অর্থাৎ সকল প্রাণীর হৃদয়ে সৎ স্বরূপে অবস্থিত চিদাত্মক, অহং প্রত্যয়ের বিষয় সেই ব্রহ্মকেই, এই সমস্ত বিদ্যার প্রকাশক রূপে চিন্তা করে, তাহারা ক্রমে, আত্মজ্ঞানের সোপান হইতে সোপানান্তর অতিক্রম করিয়া পরিশেষে নির্ব্বিশেষ আত্মাকে অবগত হইয়া 'আত্মবিৎ' হয়। এইরূপে নিজেকে, 'নাম' বা নিখিল বিদ্যার আশ্রয়, বলিয়া চিন্তা করিবার ফলে নামের যাহা কিছু শক্তি বা কার্য্য তাহাও সাধকের অধিগত হয়।"

নারদ কহিলেন, "ভগবন্, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর চিন্তাপ্রণালী আমাকে উপদেশ করুন।"

"বৎস, অতঃপর 'বাক্‌কে' আত্মা বলিয়া চিন্তা কর, বাকই নামের আশ্রয়, বাককে অবলম্বন করিয়াই নিখিলবিদ্যা ও যাবতীয় কলা প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাকের অভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না, সত্যমিথ্যা প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারিত না। বাককে আত্মারূপে অনুভব করিলে, বাকের ভিতর যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই সাধক লাভ করিয়া থাকে।"

এইরূপে নারদ তাঁহার মূল প্রষ্টব্য বিষয় পরমাত্মজ্ঞান, যাহা লাভ করিলে সকল দুঃখের অতীত হওয়া যায়—অবগত হইবার নিমিত্ত একটীর পর একটী করিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণার বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিৎ বরিষ্ঠ সনৎকুমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্বের আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পর পর সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিতে উপদেশ করিয়া, প্রত্যেকটির ধারণার ফল পৃথক ভাবে বর্ণনা

করিলেন, যথা, উপাস্য তত্ত্বের সহিত একাত্মতা প্রাপ্তি, অর্থাৎ যাহা কিছু সেই সেই তত্ত্বের বিভূতি, অবাধে সাধকের ভিতরে তাহার প্রকাশ।

নাম ও বাক্‌কে আত্মভাবে উপাসনার উপদেশ করিয়া সনৎকুমার যথাক্রমে মন, সংকল্প (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি), চিত্ত (বোধশক্তি), ধ্যান (একাগ্রতা), বিজ্ঞান (শাস্ত্রার্থ বিষয়ক শুদ্ধজ্ঞান), বল (মানসী প্রতিভা ও দৈহিক সামর্থ্য), অন্ন—কেননা অন্নই বলের প্রতিষ্ঠা, অন্নাভাবে সকল শক্তি নষ্ট হইয়া যায়—জল, তেজ, আকাশ স্মৃতিশক্তি—কেননা স্মরণ কর্ত্তার স্মৃতিশক্তি বিদ্যমান থাকিলেই আকাশাদি অর্থবান হয়,—আশা—কেননা অভিলাষানুযায়ীই স্মরণ হয়—ও প্রাণ বা মূল শক্তিকে (universal energy) "ইহাই আমি' এই ভাবে অবগত হইতে উপদেশ করিলেন।

অতঃপর এই প্রাণ বিজ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আদি ঋষি কহিতে লাগিলেন, "যেমন রথচক্রের শলাকা সমূহ চক্রনাভিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত থাকে, সেইরূপ সকলের মূলীভূত এই প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসমূহ অবস্থিত রহিয়াছে। নিখিল বিশ্ব, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। অধিক কি, প্রাণের দ্বারাই পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, গুরুর গুরুত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাঁহাদিগকে জীবিতাবস্থায় বাক্যদ্বারা অবমাননা করিলেও নিন্দাভাজন হইতে হয় সেই পিতা মাতা প্রভৃতিকে প্রাণান্তে দগ্ধ করিলেও নিন্দার কাজ হয় না। অতএব প্রাণই সকলের অন্তর্নিহিত সার বস্তু, উহাকে আত্মভাবে অবগত হইতে পারিলে নিখিল জ্ঞানের অতীত অতিসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ হয়—সাধক "অতিবাদী" * হন।"

কিন্তু প্রাণাত্মবিদের এই অতিসূক্ষ্ম জ্ঞানও যে সর্ব্ববিশেষাতীত পরমাত্মজ্ঞান নহে, নারদকে তাহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সনৎকুমার কহিলেন, 'যিনি এই প্রাণশক্তির ও মূলীভূত পরমার্থ সত্যকে অবগত

* নামাদ্যাশান্তমতীত্য বদন-শীলো ভবতি—শাঙ্কর ভাষ্য—
নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয় সমূহের অতীত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করাই তাহার স্বভাব হইয়া থাকে।

হইতে পারেন তিনিই সর্ব্ববিশেষাতীত জ্ঞানস্বরূপকে লাভ করিয়া "যথার্থ অতিবাদী হন (সত্যেন অতিবদতি), সুতরাং সেই পরমার্থ সত্যই [illegible] জ্ঞেয়।

তৎশ্রবণে নারদ কহিলেন, "আমি সেই সর্ব্ববিশেষাতীত একমাত্র জ্ঞেয়স্বরূপ পরমার্থ তত্ত্বকে জানিয়া 'যথার্থ অতিবাদী' হইতে অভিলাষী, ভগবন্ আমাকে তাহাই উপদেশ করুন।

সঃ কুঃ। যদি "যথার্থ অতিবাদী" হওয়াই তোমার অভিলাষ তবে সেই পরমার্থ তত্ত্বকে স্বরূপতঃ অবগত হও, কেননা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিয়া কোন বিষয়েই 'যথার্থ সত্যভাষণ' সম্ভবপর নহে।

নারদ। প্রভো, আমাকে সেই পরমার্থতত্ত্ব স্বরূপতঃ উপদেশ করুন।

সঃ কুঃ। জ্ঞেয় বিষয়ের অনুকূল বিচার বা 'মনন' না করিলে, কোন বিষয়ই যথার্থ অবগত হওয়া যায় না, সুতরাং তুমি "মননের" তত্ত্ব অবগত হও।

নারদ। আমাকে তদ্বিষয়েই উপদেশ প্রদান করুন।

সঃ কুঃ। যে বিষয়ে 'মনন' করিতে হইবে তাহাতে 'শ্রদ্ধা' বা আদর আনয়ন করিতে হয়, তদভাবে 'মনন' অসম্ভব, সুতরাং তুমি 'শ্রদ্ধার' সাধনা কর।

নারদ। ভগবন্, আমাকে 'শ্রদ্ধার' উপদেশ করুন।

সঃ কু। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত গুরুশুশ্রূষাদিতে 'নিষ্ঠা'যুক্ত না হইলে শ্রদ্ধার উদয় হয় না, সুতরাং শ্রদ্ধাশীল হইতে হইলে নিষ্ঠার বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন।

নারদ। প্রভো, নিষ্ঠার তত্ত্ব আমার নিকট বিবৃত করুন।

সঃ কু। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত নিষ্ঠাবান হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করা প্রয়োজন।

নারদ। আমাকে তাহাই উপদেশ করুন।

সঃ কু। ইন্দ্রিয় সুখের অতীত, অপার আনন্দ একটা কিছু আছে ইহা নিশ্চয় ধারণা না হইলে ইন্দ্রিয়-সংযম হইতেই পারে না, সুতরাং সেই বিষয়াতীত আনন্দকে নিশ্চয়রূপে ধারণা করিতে হইবে।

নারদ। আমি সেই অপার আনন্দকেই অবগত হইতে ইচ্ছুক।

সঃ কু। যাহা 'ভূমা' বা অসীম, তাহাই আনন্দ, যাহা সসীম তাহাতে সুখ নাই; তুমি 'ভূমাকে' অবগত হও।

নারদ। প্রভো, আমাকে তাহাই উপদেশ করুন।

সঃ কু। যেখানে দেখিবার, শুনিবার বা জানিবার আর কিছুই নাই —যে অবস্থায় সর্ব্বভেদাতীত জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মা নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন, তাহাই 'ভূমা'। পক্ষান্তরে যে অবস্থায়, দেখিবার, শুনিবার বা জানিবার অপর কিছু থাকে তাহা 'অল্প'—যাহা 'ভূমা' তাহাই অক্ষয় আর যাহা 'অল্প' তাহা বিনাশশীল।

নারদ। সেই 'ভূমা' কিসে প্রতিষ্ঠিত?

সঃ কুঃ। নিজের মহিমায়, অথবা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, মহিমাতেও নহে। তাহা অপর কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত নহে—তাহা স্বপ্রতিষ্ঠিত। আশে পাশে, সম্মুখে পশ্চাতে, ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি, তিনিই 'আমি' সুতরাং আমিই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আত্মাকে এইরূপে অবগত হইতে পারিলেই আত্মারাম ও সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া যায়—অন্যথা অধীনতা ও জন্মমৃত্যুর দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। যিনি আত্মাকে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া অবগত হন তিনি আত্মাতেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মৃত্যু, শোক, দুঃখ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, পাইবার যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই আত্মা আবার এক হইয়াও বহুরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

অতঃপর সনৎকুমার সেই আত্মজ্ঞান প্রকাশের অন্তরঙ্গ সাধনের নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "রাগদ্বেষমুক্ত হইয়া বিষয় আহরণ করিলেই অন্তঃকরণ পবিত্র হয়, রাগদ্বেষবিমুক্ত পবিত্র অন্তঃকরণেই পরমতত্ত্ব উদ্ভাসিত থাকে, তৎপর সমস্ত বন্ধনের অবসান হয়,—'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ'।

এইরূপে ভগবান সনৎকুমার, রাগদ্বেষাদি দোষ মুক্ত নারদকে পরমার্থ-তত্ত্ব প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

আখ্যায়িকাছলে, সাধারণ বুদ্ধির অগোচর সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম তত্ত্বসমূহ

সরল ভাবে বিবৃত করিবার চেষ্টা, একটি সনাতন প্রথা। সকল দেশের, সকল সময়ের, তত্ত্বদর্শী শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। আখ্যায়িকা বা রূপকগুলি সকল সময়েই দেশের ও সমাজের তদানীন্তন, আচার ব্যবহার অথবা সুপরিচিত বস্তু বা ঘটনা বিশেষকে অবলম্বন করিয়াই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমাদের সনাতন বেদশাস্ত্রেও আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই,—অপরিবর্ত্তনশীল চিরন্তন সত্যসমূহ, সমাজের তদানীন্তন আচার ব্যবহার, বস্তু বা ঘটনানুযায়ী আখ্যায়িকা বা রূপকের সাহায্যে সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে সমাজের বাহ্য আচার ব্যবহারগুলি যখন পরিবর্ত্তিত হইয়া বিস্মৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করিতে আরম্ভ করে, তখন পরবর্ত্তীয়দিগের পক্ষে, সেই সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় রূপক ও আখ্যায়িকার অন্তরাল হইতে চিরন্তন অবিনাশী সত্যগুলিকে আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে। তথাপি শ্রদ্ধার সহিত, একাগ্রচিত্তে পাঠ চিন্তাদি করিলে অনেক সময়ে উহাদিগের অন্তরালে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্বসমূহের সন্ধান পাইয়া পরমানন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

উপনিষৎ সমূহের মধ্যে 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ' একখানি অতিপ্রাচীন ও বহু আশ্চর্য্য তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। উহার সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আখ্যায়িকাটি, আচার্য্য শঙ্করের ভাব যথাসাধ্য গ্রহণ করিয়া, সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদের অন্তর্গত 'ভূমাধিকরণে' উহার তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে। যাহা হউক উল্লিখিত আখ্যায়িকার পশ্চাতে যে সকল চিরন্তন সুগভীর তত্ত্বসমূহ নিহিত রহিয়াছে আমরা অতিসংক্ষেপে তাহার দুই একটির সামান্য আলোচনা করিয়া তৎপ্রতি চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ, সাধারণ সাংসারিক জীবন ও অধ্যাত্ম জীবনের পার্থক্য কোথায় এবং সাধারণ ব্যবহারিক জীবনকে পরমার্থিকে পরিণত করিয়া কিরূপে ক্রমশঃ সকলের সাধারণ অভীষ্ট, হ্রাস বৃদ্ধিহীন, চিরন্তন আনন্দ বা 'ভূমাকে' লাভ করা যাইতে পারে, এই গুরুতর সমস্যার স্পষ্ট সমাধান উহাতে রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সকল প্রকার সফলতা, বল, বীর্য্য ও শক্তির মূল যে কোথায় তাহাও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, জীবনের চরম উদ্দেশ্য যে কি,—যাহা লাভ করিলে মানুষের আর কিছুই পাইবার থাকে না—এবং তাহা লাভ করিবার অন্তরঙ্গ সাধনই বা কি কি, তাহাও নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রথম, ব্যবহারিক ও পরমার্থিক জীবনের কথা। মানুষের ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখী, বাহিরের রূপরসাদি বিষয় হইতে জ্ঞান ও সুখ আহরণ করিয়া উহারা মানুষের অস্তিত্ব অটুট রাখিতে সততই চেষ্টিত। কিন্তু বাহ্য বিষয়কেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করিয়া, মানুষ যতদিন তাহাদিগকে লইয়াই নিজের স্বাভাবিক অভাবসমূহ—জ্ঞান সুখ ও অমৃতত্বের অভাব—পূর্ণ করিতে সচেষ্ট থাকে ততদিন সে কিছুতেই যথার্থ পূর্ণতার সন্ধান পাইতে পারে না। বাহ্য বিষয়ের সাহায্যে জ্ঞান সুখ ও অস্তিত্বের সামান্য বিকাশ সাধারণ বিচারে প্রতীত হইলেও উহারাই যে মানুষের আসল স্বরূপ, তাহার স্বতঃসিদ্ধ চিরন্তন অধিকার, এ কথা শাস্ত্র বা গুরুমুখে অবগত হইয়া মানুষ যখন হইতে, বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও, আপনার ভিতরে সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিত, সেই চিদানন্দ স্বরূপের সন্ধান লইতে সচেষ্ট হয়, তখন হইতেই তাহার অধ্যাত্ম জীবনের সূত্রপাত হয়। মানুষের জীবনের প্রধান অবলম্বন, সুখান্বেষণ। যতদিন সুখ বস্তুটাকে সে বাহির হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে, ততদিন তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদা বিষয়েতেই নিবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। ততদিন আত্মা বা ঈশ্বরের তত্ত্ব তাহার মনে উদ্ভাসিত হওয়া অসম্ভব। বড় জোর ঈশ্বর-বিষয়ে তাহার এরূপ একটা ধারণা হওয়া সম্ভব যে,—তিনি একজন খুব ধন-জন-শক্তি সামর্থ্যবান পুরুষ, ঐ নীলাকাশের পশ্চাতে বা এমনই কোনও একটা স্থানে তাঁহার ঘর, খুসী হইলে তিনি সকলকে ধনজন ইত্যাদি দিতে পারেন। ঐরূপ ঈশ্বর ধারণা কাহারও কাহারও পক্ষে উপযোগী হইলেও, উহা যে বাস্তবিক অধ্যাত্ম জীবনের পরিচায়ক নহে তাহা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে মানুষ যখন বুঝিতে আরম্ভ করে, যে সুখ তাহার ভিতরে রহিয়াছে, বাহ্যবস্তুতে সে তাহা আরোপ করিয়া উপভোগ করিতেছে মাত্র, তখন সেই সুখটাকে ষোলআনা আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার দৃষ্টি প্রত্যাবৃত্ত

হয় ভিতরের দিকে। সহস্র বিষয়ের মধ্য হইতেও সে সুখের সন্ধান করে, তাহার নিজের ভিতরে। এই দৃষ্টির প্রভেদই সাধারণ সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ব্যবধান। একটীর দৃষ্টি সতত বিষয় মুখী, অপরটীর দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী। একটি সংসার দুঃখের কারণ অপরটী নিত্যানন্দ লাভের হেতু।

কিন্তু সকলের পক্ষে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সেই আসল স্বরূপটীকে ধরিতে বুঝিতে পারা প্রথমেই সম্ভবপর হয় না। চিত্তবৃত্তিগুলি, তাহাদের চিরন্তন অভ্যাসের ফলে বাহ্য বস্তুকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে উৎসুক হয়। এইজন্য, মানুষের স্বভাবতঃ যে দিকে অনুরাগ, এমন একটা অনিন্দ্য বাহ্য বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই সে সহজে সেই অতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণা অভ্যাস করিতে সমর্থ হয়। যেমন, শিল্প বা কলা বিদ্যায় যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অনুরাগী, সে যদি, শিল্প বা কলাবিদ্যার চর্চ্চায়, বর্ত্তমানে সে যে জ্ঞান ও সুখ পাইতেছে তাহাকে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা না করিয়া, পূর্ণভাবে জ্ঞান ও সুখ আয়ত্ত করিতে অভিলাষী হয়, তবে সেই সেই বিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই তাহাকে আত্মবিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে। শিল্প বা কলা বিদ্যার চর্চ্চায় তাহার ভিতর হইতে যে শক্তির বিকাশ হইতেছে তাহাকে, বাহিরের একটা কিছু না ভাবিয়া, আত্মারই একটি বিকাশরূপে চিন্তা করিতে অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ আত্মার আরও শক্তি অনুভব করিবার স্বাভাবিক প্রেরণায় তাহার চিত্ত সহজেই অন্তর্ম্মুখী হইতে আরম্ভ করিবে। তারপর যখন বুদ্ধি আর তাহাকে অধিক দূর লইয়া যাইতে পারিবে না, তখন বুদ্ধির উপর অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধক অন্বেষ্টব্য চিদানন্দ স্বরূপেতেই অবস্থিত হইবেন—উহাই ভূমা।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, সাধারণ ইন্দ্রিয় সুখের অতীত একটা অনাবিল আনন্দ আছে, এ কথাটি বিচার সহায়ে বুঝিয়া তাহাকেই লাভ করিবার নিমিত্ত যাহার অভিলাষ জন্মিয়াছে, অথচ সহসা ইন্দ্রিয় মনের অতীত রাজ্যে উপনীত হওয়া যিনি কষ্টকর বলিয়া বোধ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকারীর পক্ষেই অনিষিদ্ধ বিষয় অবলম্বন করিয়া আত্মানুশীলন সম্ভব পর হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ ভোগেচ্ছুই

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাকেই লাভ করিবার জন্য যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে বিষয়কেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তাহারা ব্রহ্মচিন্তার সম্পূর্ণ অনধিকারী, তাহারা যদি বিষয়ের মধ্য দিয়া আত্মচিন্তার কথা বলে, তবে বুঝিতে হইবে তাহা উপাসনা নহে প্রতারণা।

(ক্রমশঃ)

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(৩)

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

আজ দেড়শত বৎসর ধরে হিন্দু শুনে আসছে, তা যেমন বিদেশীদের কাছ থেকে, তেমনি স্বদেশীদের কাছ থেকে—যে আমরা অতি হতভাগা কুসংস্কারী, যুগ যুগান্তর ধরে ত্যাগের কিম্ভূতকিমাকার বল্মীক স্তূপ নির্ম্মাণ করেছি—সেটাকে যেমন করে হ'ক ভেঙ্গে দিতে হবে। কিন্তু দূরবীক্ষণে focus না করলে যেমন আকাশের পর্য্যবেক্ষণ ঠিক হয় না সেই রকম প্রাচীন শাস্ত্র দূরবীক্ষণে চলবে না—ত্যাগের focus আগে ঠিক হয়েছে কিনা দেখে নিতে হবে। যাকে অবলম্বন করে "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার দস্যুতা, জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, জগতের ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই"—সেই বর্ত্তমান সভ্যতার চশমা এঁটে ভারত গগন পর্য্যবেক্ষণ করতে গেলে কতকগুলো ভুয়া কুসংস্কারের কুয়াসা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। তার কারণ এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির সাধারণ সংস্কারের যে কিরূপ মেরু ব্যবধান তা আচার্য্য একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। "অন্যান্য দেশের ভাল ভাল ও বড় লোকেরা কোন দস্যু ব্যারণ হইতে তাঁহাদের বংশাবলীর উৎপত্তি

---

* উদ্ধৃত অংশগুলি পুস্থান, রামেশ্বর এবং রামনাদ বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

হইয়াছে এইরূপ বাহির করিতে পারিলে বড়ই প্রীতি অনুভব করেন। এই সকল ব্যারণ পার্ব্বত্য দুর্গে বাস করিত, সময়ে সময়ে বাহির হইয়া পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুটপাট করিত, এইরূপ দস্যু ব্যারণের সন্তান বলিয়া পরিচিত হওয়া পাশ্চাত্য দেশের বড় লোকদিগের বড় গৌরবের বিষয়। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আমাদিগকে পর্ব্বত গুহানিবাসী, ফলমূলাহারী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ঋষিমুনির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি।"

এই ত্যাগই হচ্চে এই জাতির মেরুদণ্ড। এটা ভেঙ্গে দিলে এ জাত মরে যাবে। এই ত্যাগ বিহীন হ'লে আমাদের শাস্ত্র পড়লে কিছুই বোঝা যাবে না। ভগবৎ কৃপায় যাদের ত্যাগ এসেছে তাদেরই আমাদের শাস্ত্রে অনুরাগ এসেছে। অনুরাগী ব্যক্তি শাস্ত্রের সকল উপাসনার সার দেখতে পান। 'সকল উপাসনার সার এই—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন। যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন, আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করেন, সে প্রবর্ত্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিব বোধে সেবা করেন, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।" এখন বসে থাকবার দিন গেছে, মূর্ত্ত ভগবান যে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান—এই 'বর্ত্তমানে'র উপাসনায় জীবন পাত করতে হবে। 'প্রভুর কিবা রূপ—কিবা গুণ' বলে বসে থাকা মানে জড়ত্ব। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পাপ স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা—কারণ এতে ছোট আমিটা বেড়ে যায়। যে মনে করে আমি আগে খাব, সকলের চাইতে বড়লোক হব, পৃথিবীর সম্রাট হব, যে মনে করে আমি সকলের আগে স্বর্গে যাব, তাকেই পড়ে থাকতে হয়। কারণ তিল তিল করে প্রতি নিঃশ্বেসের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করতে হয় তবে অহঙ্কার নাশ পায়—অহঙ্কারের একটু ফেঁসো থাকতে মুক্তির রাজ্যে, ভূমার রাজ্যে কাহারও প্রবেশঅধিকার নাই। ত্যাগের আদর্শ শ্রীবুদ্ধ দেখিয়ে

গেছেন যে নির্ব্বানের জন্যও যেমন দেহ পাত করতে হবে আবার যদি দরকার হয় তখনি সামান্য ছাগ শিশুর জন্যও হাঁড়িকাঠে মাথা বাড়িয়ে দিতে হবে। যেটাকে সত্য বলে ধারণা হয়েছে তার কাছে সকল লোক মত, সমাজ, সঙ্ঘ আন্তরিকতার সহিত বলি দিতে হবে—অভিসম্পাৎ করতে করতে নয়—আশীর্ব্বাদ করতে করতে। স্বার্থ শূন্য ব্যক্তি বলেন আমার স্বর্গ আমার মুক্তি এখন তোলা থাক, আগে আমি সর্ব্বভূতে বিরাজমান প্রভুর সেবা করেনি—সে তখন সন্ন্যাসী হয়ে শত লাঞ্ছনার গেরুয়া পরিধান করে শত দারিদ্র্যের ছিন্ন কন্থার ভার বহন করে বেড়ায়। ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক বুঝতে হলে দেখতে হবে সেই মহাপুরুষ কতদূর নিঃস্বার্থ, কতদূর প্রেমিক, কতটা ত্যাগ তিনি করেছেন, কতটা বুকের রক্ত তিনি চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে ফেলেছেন। এ না দেখলে বুঝতে হবে সেই মহাপুরুষ পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মীয় আত্মারামের নিকট হতে অনেকদূর সরে দাঁড়িয়েছেন। "যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্ম্মিক, সেই শিবের সামীপ্য লাভ করে। সে পণ্ডিতই হউক মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিক নিকটবর্ত্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি জগতে যত দেব মন্দির আছে, দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া থাকে, সে যদি চিতাবাঘের মত সাজিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।"

কাল ধর্ম্মে এই ত্যাগের দেশে 'যদ্‌ভূমা তৎ সুখমে'র অর্থ হয়েছে অতি স্থূল ভোগ, সাধুতা মানে জড়ত্ব, মুক্তি মানে স্বার্থপরতা, ধর্ম্ম মানে—'রে চণ্ডাল দূরমপসর'। আর কৌতুক দেখ, এই দেশেই ভগবান আমাদের শেখাবার জন্য মানুষ হয়ে আসচেন, জীবের জন্য কেঁদে ধূলায় লুটাচ্ছেন, আচণ্ডালকে কোল দিচ্ছেন।—কেন? কারণ ঐ খানেই ভারতের, জগতের জীবনী শক্তি সুপ্ত। আমরা শুনব না—আমরা বধির, আমরা দেখব না—আমরা অন্ধ। কিন্তু যে কাল ধর্ম্মে আমরা নিজের কর্ম্মফলে জড়ত্ব লাভ করেছি সেই "সুদীর্ঘ রজন

প্রভাত প্রায় বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসান প্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগরিত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত সে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মরূপ হিমালয়ের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর ততই যেন উহা গম্ভীরতর হইতেছে। হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ু স্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থি মাংসে পর্য্যন্ত যেন প্রাণ সঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত মস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি তাঁহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগরিত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এখনে আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।" ভারত প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে "অজ্ঞানান্ধতা বশে অপর স্থানের মলিন প্রয়ঃপ্রণালীর জল পান না করিয়া তাহাদের স্বগৃহ সমীপবর্ত্তী অনন্ত প্রবাহিণী নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জল পান" না করিলে সে মরিবে—সে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে "রাজনীতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য্য হইলেও ধর্ম্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম্ম গেলেই যে ভারতের প্রাণও যাইবে"। দর্শন বল বিজ্ঞান বল, ধর্ম্ম বা নীতি-বিজ্ঞান বল, চরিত্রের তিতিক্ষা, কোমলতা, প্রেম—যা কিছু বল সকলেরই আদর্শ দেখিয়েছে প্রথমে ভারত তার আজীবন ত্যাগের মধ্য দিয়ে—মরণকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে।

প্রত্যেক জাতির একটা জীবনের সার্থকতা আছে। সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে সে সেইটেকে বজায় রাখতে চায়। এই বিশ্বব্যাপী এক ঐক্যতান বাদ্য চলেছে। প্রতি জাতির চিন্তার কম্পন ধারা থেকে এক বিশেষ বিশেষ সুর উঠে সে বাদ্যে মাধুর্য্য বৃদ্ধি করছে। সেই বিশেষ

বিশেষ সুর দিয়ে সেই সেই জাতির জীবনী শক্তি ফুটে বেরুচ্ছে। তাই "অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যবলে অগাধ ধনরাশি উপার্জ্জনের গৌরব, বাণিজ্য নীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতা লাভের অপূর্ব্ব সুখের কথা বলুক—হিন্দু এ সকল বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না।" এখনও সকল তুচ্ছতা উপেক্ষার মধ্যে, সকল দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক নিগড়ের অসহ্য ব্যাভিচার অত্যাচারের মধ্যেও "আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও যে ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিখ্যারূপ নির্ঝরিণী বহিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়া রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও প্রতিদিন নূতন ভাবে সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্দ্ধমৃত হীনদশাপন্ন পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে"। ভারত গগন নানা মতামতের সুরের কম্পন ধারায় উচ্ছ্বসিত ও কোনটা বেতালা কোনটা ঠিক ঠিক তাল মান লয়ে ঝঙ্কার দিয়ে জাতীয় জীবনে প্রাণস্পন্দনের পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু সকল রাগরাগিণীকে উপেক্ষা করে গর্জ্জে উঠছে ত্যাগমূর্ত্তি ভৈরব—'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ', গম্ভীর মন্দ্রে আহ্বান করছে, বিশ্ববাসীকে পশ্চাতে, দূরে, অতিদূরে সেই অনন্ত অপার ভাগবতী লীলার রাজ্যে—যে রাজ্য মহাপ্রাণ, মহাবীর মহা-মনীষিগণের অন্তর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—যাহার তুলনায় এ জগৎটা অতিস্থূল মৃত্তিকাস্তূপ মাত্র। ক্রমে দূরে আরও দূরে দূরতম রাজ্যে, অনন্ত কালও যেখানে প্রকৃতির রহস্যাবগুণ্ঠন মোচন করে উঁকি মারতে সাহস করে না সেই অবাঙ্মনসোগোচরম্ লোকে। "তোমরা আমাদের জাতিকে উৎসাহ উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও—তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিবে। তোমরা তাহাদের নিকট রাজনীতি, সমাজ সংস্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায়, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি যাহাই বল না, তাহারা এক কাণ দিয়া শুনিবে, অপর কাণ দিয়া তাহা বাহির হইয়া যাইবে।" এখন এই মহান্ ধর্ম্ম আমাদের শিখতে হবে, শেখাতে হবে, আভিজাত্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অস্থি মজ্জা চর্ব্বণকারী দরিদ্র হীন নিম্ন সমাজকে—ছড়াতে হবে ভারতেতর প্রদেশে সে ধর্ম্ম আগুনের মত, যে পবিত্রানলে ভস্ম হবে সকল পুরাতন, জীর্ণ, মোহগ্রস্ত হিংসাভিমান।

কিন্তু বহির্জ্জগতের কাছ থেকে আমাদেরও কিছু শেখবার আছে। বহুকালের জড়তা হেতু আমাদের ভাব মন্দিরে বহু কুসংস্কারের আগাছা জন্মেছে সেগুলোকে নির্ম্মূল করবার জন্য পাশ্চাত্য অপরা বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা আমাদের প্রত্যেক কুটীরে কুটীরে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর ইদানীং যে নবযুগের মহাপুরুষ নিজ কঠোর তপস্যার বলে জগতের সমগ্র আধ্যাত্মিকতা একত্রিত করে এক বিরাট, উদার ধর্ম্মের বিদ্যাধার রচনা করেছেন, যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে অপর জড়প্রাণ ভাব সকলকে বিপর্য্যস্ত করে ফেলতে হবে, তার জন্য যে সঙ্ঘ গঠন তাও আমাদের শিখতে হবে পাশ্চাত্যদের কাছ থেকে। "কিরূপে দল গঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে কাযে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও আমাদের দেশের সকল লোক যতদিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যদিগের নিকট ঐ সকল বিষয় কিছু কিছু শিখিতে হইবে।" কিন্তু সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ঐ যে পাশ্চাত্য অপরা বিজ্ঞান ও সঙ্ঘ গঠন প্রণালী যা আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়ে কতকটা উপকৃত হতে চাই—বড়ই ভোগমুখী। ও সাপ যেন আমাদের দংশন করে না বিষ ঢেলে দেয়। সেই জন্য তাকে গ্রহণ কর্ব্বার পূর্ব্বেই ত্যাগের মন্ত্র সাহায্যে তাকে বশ করে তার বিষ দাঁতটা আগে ভেঙ্গে দিতে হবে।

অনেকেই বলে থাকেন যে ঐ ত্যাগের মন্ত্র আউড়ে আউড়ে আমাদের দেশটা চির পদদলিত হয়ে রয়েছে ও থেকে যাবে। কিন্তু পাক্ষান্তরে বলা যেতে পারে এমন ঢের দেশ বা জাতি ছিল এবং আছে যারা ত্যাগের আদ্যাক্ষরটি পর্য্যন্ত শুনে নাই বা জানে না অথচ তারা এই জগৎ রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে পড়েছে বা আরম্ভ করেছে কেন? পৃথিবীর বহু আদিম জাতি ত্যাগ, ত্যাগ করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়নি ভোগ ভোগ করেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। গ্রীক্, রোম, কার্থেজ, ব্যাবিল, ইজিপ্ট, ত্যাগ ত্যাগ করতে করতে মরেনি ভোগের অনুসন্ধান করতে গিয়েই মরেছে। আমাদের বোধ হয় যতক্ষণ যে জাতির মধ্যে ত্যাগের লেশমাত্র বর্ত্তমান

ততক্ষন তাদের আয়ু থাকে তাবপব যখনই তারা ভোগ সর্ব্বস্ব হয় তখনই তাদেব বিদায় নেবার সময় হয়। আর যাদের পাশ্চাত্য বর্ত্তমান ভোগ-বিলাস দেখে চোখ ঝলসে গেছে তাদেব আমরা প্রার্থনা করি আর দু-দশ বৎসর অপেক্ষা করে দেখ ইহার ফলাফল কি? দু-চারশ বৎসরের ক্ষণিক ভোগসভ্যতার প্রাসাদ দেখে দশ হাজার বৎসরের অটুট ত্যাগ মন্দির ভেঙ্গে ফেলবাব সঙ্কল্পটা কি যুক্তি যুক্ত "মনে রাখা উচিৎ,—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেহ ভারতে ভোগ সুখই পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করে, যদি কেহ জড়জগৎই ভারতবাসীর ঈশ্বর বলিয়া প্রচার কবে—তবে সে মিথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমে তাহাব স্থান নাই—ভারতের লোক তাহাব কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতাব যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপাব সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন, আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ওসব মিথ্যা। ভ্রান্তি—ভ্রান্তি মাত্র—ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাক।"

কিন্তু কতকটা ভোগ না কবলে ত্যাগেব চবমাদর্শের প্রথম সোপানেও পা দেওয়া যায় না। শিশুকে ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া বাতুলতা। কারণ সে জন্মাবধি সুখের সোনার স্বপন দেখচে—ইন্দ্রিয়ই তাব সব। তাকে সংসারের অসারতা বোঝাতে হলে তাদেব কিছু ভোগের সুবিধা করে দিতে হবে। একদল লোক ভোগকেই চবমাদর্শ বলে প্রচাব করে, সমাজের ক্ষতি ছাড়া উপকার কিছুই কচ্চেন না তেমনি অপর দল জোর করে সন্ন্যাসের আদর্শ ছড়াচ্ছেন—এটাও একটা মস্ত ভুল। ফলে হচ্চে কি না গরিব ভারতের সাধারণ জনসমাজ জন্মাতে না জন্মাতেই সংসারটা অসার বুঝে জড় হয়ে বসে থাকতে আরম্ভ করেছে। তথাকথিত সমাজ নেতাবা এখনও যদি একটু তাঁহাদের প্রভুত্বের হাত গুটিয়ে নেন, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের কঠিন বাঁধন একটু শিথিল করে দেন তাহলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হবে। "সেই ভ্রম এই—অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা প্রদান। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু

সকলের এক পথ নহে। তুমি যে সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, আমারও সেই প্রণালী হইতে পারে না। তোমরা সকলেই জান, সন্ন্যাসাশ্রমই হিন্দু জীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। যে না করে, সে হিন্দু নহে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। সংসারের সুখ সমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষ ভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার, তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে—আমরা জানি ইহাই হিন্দুর আদর্শ।"

যেমন সঙ্গীতে একটা প্রধান সুর থাকে যার অনুগত হয়ে অপরাপর সুর গুলো খেলা করে তেম্নি পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি সকল ব্যাপারই রাজনীতির অধীন আর ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞান ভোগ ঐশ্বর্য্য নাম যশ ধন দৌলত সব ধর্ম্মের অধীন। কোনটী সত্য তা ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও অস্মদ্দেশীয় কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি পাশ্চাত্য সভ্যতার নকল জহরত কুড়াতে তাঁদের সকল প্রচেষ্টার প্রয়োগ এখনও করচেন আর সেই আলেয়ার অনুসন্ধানের জন্য এখনও দেশবাসীকে সাগ্রহে আহ্বান করচেন। যারা একেবারে গোড়া তাদের একটা মেরুদণ্ড আছে একটা দাড়াবার যায়গা আছে কিন্তু নকল-পন্থীদের—অন্তর বাহির সর্ব্বস্ব হীন একটা তাসের বাড়ী করে বাস করবার বাতুলতা মাত্র। যে স্রোতস্বিনী আজ দশ হাজার বৎসর ধরে বয়ে বয়ে কত অনুর্ব্বরা ভূমি সরস করেছে কত পিপাসিতকে তৃপ্ত করেছে তাকে ফিরিয়ে ফের হিমালয়ে নিয়ে যাওয়ার জল্পনা একটা প্রলাপ মাত্র। "সুতরাং এইটী বেশ স্মরণ রাখবে, তোমরা যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ সর্ব্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয়মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল, যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল—সুতরাং ফল দাঁড়াইল সম্পূর্ণ ধ্বংস।"

এক্ষণে আমাদের এই ধর্ম্মকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য কঠোর পরিশ্রম

করতে হবে। এই কঠোব তপস্যা হতে "প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে আর তোমাদেব পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদেব বংশধরগণের এই অভূত পূর্ব্ব অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি নিশ্চিত বলিতেছি তাঁহারা পরলোকে আপনাপন স্থান হইতে তাঁহাদের বংশধরগণকে একপ মহিমান্বিত, একপ মহত্বশালী দেখিয়া আপনাদিগকে মহা গৌববান্বিত জ্ঞান করিবেন।" আব যিনি শৈবেব শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, কর্ম্মীর কর্ম্ম, বৌদ্ধেব বুদ্ধ, জৈনেব জিন, ঈশাহি ও য়াহুদীর আজে, মুসলমানের আল্লা, বৈদান্তিকের ব্রহ্ম, যে বিশ্বনাথ সকল ধর্ম্ম, সকল ভাব, সকল সম্প্রদায়ের প্রভু তাঁহার প্রকৃত মহিমা ভাবতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই "ভাবতমাতা ধীরে ধীবে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। তাঁহাকে জাগাও, আর নূতন জাগরণে নব প্রাণে পূর্ব্বাপেক্ষা মহা গৌববমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে" তাঁহাকে জগন্নাথেব অনন্ত সিংহাসনেব পদতলে প্রতিষ্ঠা কব।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংবাজীব অনুবাদ)

প্রিয় ফকিব,

*   *   *

একটী কথা তোমাকে বলি—উহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—আমার সহিত তোমাদের আর দেখা না হইতে পাবে—নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্য্যন্ত রাখিও না। ধর্ম্মেব মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—

* এই পত্র ও পরের পত্রখানি এলাহাবাদ হইতে ৫ই জানুয়ারি তারিখে বলরাম বাবুকে লিখিত পত্রের সঙ্গে লিখিত হইয়াছিল।

মনে পর্য্যন্ত পাপ চিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকেই ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে। নিজে মানুষ হও আর রাম প্রভৃতি যাহারা সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকেও সাহসী নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই, ইহা ব্যতীত ধর্ম্মের আর কোন মতামত তোমাদের জন্য নহে। যেন কাপুরুষত, পাপ, অসদাচরণ বা দুর্ব্বলতা একদম না থাকে বাকি আপনা আপনি আসিবে। রামকে কখনও থিয়েটার বা কোনরূপ চিত্তদৌর্ব্বল্যকারক আমোদ-প্রমোদে লইয়া যাইও না বা যাইতে দিও না।

তোমার—

নরেন্দ্রনাথ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

প্রিয় রাম ইত্যাদি—

বৎসগণ, মনে রাখিও, কাপুরুষ ও দুর্ব্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ। নীতিপরায়ণ, সাহসী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার চেষ্টা কর। ইতি—

তোমাদের—

নরেন্দ্রনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

গাজিপুর

৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আমি এক্ষণে গাজিপুরে সতীশবাবুর নিকট রহিয়াছি। যে কয়েকটী স্থান দেখিয়া আসিয়াছি তন্মধ্যে এইটী স্বাস্থ্যকর। বৈদ্যনাথের জল বড় খারাপ, হজম হয় না। এলাহাবাদ অত্যন্ত ঘিঞ্জি—কাশীতে যে

কয়েকদিন ছিলাম দিনরাত জ্বর হইয়া থাকিত—এত ম্যালেরিয়া। গাজিপুরের, বিশেষতঃ আমি যে স্থানে থাকি, জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। পওহারি বাবার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজী বাঙ্গালার মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড বড ঘর chimney &c.—(চিমনি ইত্যাদি)। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতিমধ্যে বাবাজির সহিত দেখা হইল ত হইল—নহিলে এই পর্য্যন্ত। প্রমদাবাবুর বাগান সম্বন্ধে কাশী হইতে স্থির করিয়া লিখিব। কা— ভট্টাচার্য্য যদি একান্ত আসিতে চাহে ত আমি কাশীতে রবিবার যাইলে যেন আসে—না আসিলেই ভাল। কাশীতে দুই চারিদিন থাকিয়া শীঘ্রই হৃষীকেশ চলিতেছি—প্রমদা বাবুর সঙ্গে যাইলেও যাইতে পারি। আপনারা এবং তুলসীরাম সকলে আমার যথাযোগ্য নমস্কারাদি জানিবেন ও ফকির, রাম, কৃ— প্রভৃতিকে আমার আশীর্ব্বাদ।

দাস—নরেন্দ্র।

পুঃ—আমার মতে আপনি কিছুদিন গাজীপুরে আসিয়া থাকিলে বড ভাল—এখানে সতীশ বাবুর বাঙ্গালা ঠিক করিয়া দিতে পারিব ও গগনচন্দ্র রায় নামক একটী বাবু—আফিম আফিসের head (বড বাবু) তিনি যৎপরোনাস্তি ভদ্র, পরোপকারী ও social সামাজিক ও সৌজন্য পরায়ণ। ইহারা সব ঠিক করিয়া দিবেন। বাড়ী ভাড়া ১৫৲।২০৲ টাকা; চাউল মহার্ঘ্য, দুগ্ধ ১৬।২০ সের, আর সকল অত্যন্ত সস্তা আর ইহাদের তত্ত্বাবধানে কোনও ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কিছু expensive —(বেশী পড়িবে) ৪০।৫০ টাকার উপর পড়িবে। কাশী বড damned malarious (ভয়ানক ম্যালেরিয়া)।

প্রমদা বাবুর বাগানে কখনও থাকি নাই,—তিনি কাছ ছাড়া করিতে দেন না। বাগান অতি সুন্দর বটে, খুব furnished (সাজান গোজান) এবং বড ও ফাঁকা। এবার যাইয়া থাকিয়া দেখিয়া মহাশয়কে লিখিব।

ইতি—নরেন্দ্র।

পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজির সাক্ষাৎ।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

রামবাবু (রামচন্দ্র দত্ত) স্বামিজীকে সঙ্গে ক'রে ঠাকুরের কাছে ল'যে গেছ্‌লেন। স্বামিজী ঠাকুরের কাছে যাবামাত্র—ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন এবং ভাব হ'লো। রামবাবু বল্লেন—'তোমায় দেখে ভাব হ'য়েছে'। এরপর ঠাকুর স্বামিজীর বাড়ী দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। বল্‌তেন যে, ওকে আমার কাযের জন্য পৃথিবীতে টেনে এনেছি। ঐ একমাত্র ঠিক ঠিক জ্ঞানের অধিকারী। একদিন বুকে হাত দিবামাত্র স্বামিজী বেহুঁস হ'লেন। স্বামিজী চীৎকার ক'রে বল্লেন—'কর কি, কর কি, আমার বাপ্ মা আছে।' ঠাকুর বল্লেন, 'ও কথার ঐ পাওয়ার ঠিক ঠিক অধিকারী। এর নিজের সংস্কার নয়, বাপ্ মার সংস্কার।'

একসভা লোক ঘরে ব'সে থাক্‌তো, বড় বড় লোক,—কেশব সেন প্রভৃতি তাদের সাম্‌নে বলতেন, 'তোকে পেলে আমি কাউকে চাই না।'

ঠাকুর বল্‌তেন—'ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, কোনও খুঁত নাই। যেমন দেখ্‌তে, তেমনি গাইতে, বাজাইতে, বলতে-কইতে, বুঝ্‌তে বুঝাতে। মহা পবিত্র, ছোটকাল থেকে কখন মিছা কথা বলে নাই।'

ঠাকুর কারুর জন্য মা কালীর কাছে—ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাইতেন না। স্বামিজী বল্লেন, * 'আমি জানি তুমি টাকাকড়ির জন্য মা কালীর কাছে কিছু বল্‌বে না। কিন্তু ভীষ্মের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বাণ ধরতে হ'য়েছিল তেমনি আমার জন্য মা কালীর কাছে বল্‌তে হবে। তোমাকে বলতুম না, কিন্তু কি করি, ভাই বোনের কষ্ট দেখ্‌তে পারি না।' ঠাকুর খুসী হ'য়ে বল্লেন—তুই কালীর ঘরে যা—

---

* যখন তাঁহাদের সাংসারিক কষ্ট হইয়াছিল।

যা ইচ্ছা তাই চাগে যা।' স্বামিজী কালীঘরে গেলেন, কিন্তু কেমন মন হ'য়ে গেল—স্বামিজী কাঁদ্‌তে লাগলেন, আর বল্‌তে লাগলেন—বিবেক বৈরাগ্য দাও। কাঁদতে কাঁদ্‌তে ফিরে এলেন। ঠাকুর বল্লেন—কি চেয়ে এলি। স্বামিজী—বিবেক বৈরাগ্য চাইলাম। ঠাকুর খুসী হ'য়ে বল্লেন—আমি জানি তোর দ্বারা টাকাকড়ি চাওয়া হবে না।

তারপর সকলের সামনে আনন্দ ক'রে বলতেন দেখ, নরেনের ভাই বোন খেতে পায় না—তাও কালীর কাছে বিবেক বৈরাগ্য চেয়েছে। ওকালতী পড়ছিলেন—ঠাকুর একদিন বল্লেন—দেখ, এতে তোর টাকাকড়ি, গাড়ীঘোড়া হবে কিন্তু ভগবান তো পাবি না। এই কথায় স্বামিজী ওকালতী ছেড়ে দিলেন।

স্বামিজীর প্রাণটা দিনরাত ভগবানের জন্য কাঁদ্‌তো। কেউ বুঝ্‌তে পারত না—ঠাকুর বুঝ্‌তে পার্‌তেন। একদিন স্বামিজী খুব জোরে চিৎকার ক'রে কাঁদ্‌ছিলেন। ঠাকুর বুঝ্‌তে পাল্লেন—স্বামিজী কি জন্য কাঁদ্‌ছেন। স্বামিজীকে ডাকিয়ে বল্লেন—তুই এই জন্য কাঁদ্‌ছিস্‌। স্বামিজী—হ্যাঁ। তখন ঠাকুর বল্লেন—তোকেই দিব। তুই আগে আমার জন্য খাট। তোর জন্য আমি এতদিন দুঃখ কল্লেম—তুই আমার জন্য দুঃখ কর। আমি যা খেটেছি তার তুই এক আনা খাট—তোকে গদি ক'রে দিব।

স্বামিজী একবার বুদ্ধগয়ায় পালিয়ে গেলেন। গুরুভাইরা ঠাকুরের কাছে ব্যস্ত হ'য়ে বলায়—ঠাকুর বল্লেন—কোথাও কিছু নেই, সব এইখানে। স্বামিজী দু'এক দিন পরে ফিরে এলেন।

ঠাকুরের অভাবের পর সকলে স্বামিজীকে বলতেন—ঠাকুর আপনাকে এত বড় বলেছেন, আপনি কি বুঝলেন। স্বামিজী বল্লেন—তিনি বড় বলেছেন আমি সে কথা খুব মানি, কিন্তু আমি এখনত বুঝিনি। আমি আগে বুঝি, তারপর তোমাদের নিয়ে বুঝিয়ে দিব।

গুরুভাইরা সব বাড়ী ফিরে গিছ্‌লেন, স্বামিজী ধ'রে ধ'রে তাদের ফিরিয়ে এনে বল্লেন—তিনি তোদের ভালবাস্‌তেন কি সংসার করবার জন্য।

ব্রাহ্মসমাজে নাটক হ'য়েছিল, স্বামিজী শিব সেজেছিলেন। ঠাকুর ঐখানে ছিলেন। স্বামিজীকে ঐ বেশে নেবে আস্তে বল্লেন। স্বামিজী ইতস্ততঃ করছেন দেখে—কেশববাবু বল্লেন—উনি যখন বল্ছেন নেবে এসনা। ঠাকুর বল্লেন—দেখ কেশব, তোমার ১টা বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে, এর ১৮টি শক্তি আছে। কেশববাবু খুব আনন্দ ক'রে বল্লেন—এতো ভাল কথা, আমিও তাই চাই. নরেন আমার চেয়ে ছোট কেন হবে। স্বামিজীকে খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর কোন মানা করেন নাই। তাঁকে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াতেন, আর বল্তেন—ওকে খাটতে হবে। ঠাকুর স্বামিজীকে—তামাক সাজতে শৌচের জলাদি দিতে দিতেন না, বল্তেন—ওসব কায করবার অন্য লোক আছে। তিনি জান্তেন ওঁর দ্বারা বড় বড় কায হবে

স্বামিজী রাতভোর ধ্যান জপ করিতেন। গান, বাজনায় গুরু-ভাইদের স্ফূর্ত্তি দিতেন। শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলে স্বামিজীর কাছে গানবাজনা শিখেছিলেন।

অমরনাথ যাত্রা কালে—চড়াই উঠার সময় লাটু মহারাজ স্বামিজীকে বল্লেন, 'আর যাব না।' স্বামিজী মন বুঝ্বার জন্য বল্লেন যে 'একে টাকা দিয়ে দে'। লাটু মহারাজ বল্লেন—বেশ, দিয়ে দাও।' তখন স্বামিজী বল্লেন—আমি তোর কি অনিষ্ট ক'রেছি, তুই যখন যা বলছিস্ তাইত করছি।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলে বলতে লাগ্ল—ঠাকুর কি পাগলাপনা ক'রে গেলেন। স্বামিজীর কর্ম্মটা চিকাগোয় প্রকাশ পেলে, তখন লোকে বল্লে—ঠাকুরের কথাই ঠিক।

যখন স্বামিজী ভারতে ফিরে এলেন, তখন মিস সেভিয়র, গুড্উইন্ সাহেব, লাটু মহারাজ প্রভৃতি দেখা করতে গেলেন, মনে মনে ভাবছেন, স্বামিজীর গোটাকতক সাহেব শিষ্য হ'যে অহঙ্কার হ'য়েছে। স্বামিজী লাটু মহারাজের মনের ভাব বুঝ্তে পেরে, হাত ধ'রে বল্লেন—"তুই আমার সেই লাটুভাই, আমি সেই নরেন।' তখন বুঝতে পারলাম স্বামিজীর মানুষ চেন্বার শক্তি হ'য়েছে।

স্বামিজী বল্লেন, 'আয় আমরা ব'সে খাই, তুই একপাশে ব'সে যা'; বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথা কচ্ছি, দেখ এরা কেমন হুজুগে'। খাওয়া দাওয়ার পর বল্লেন—দেখ্‌লি ঐ দেশের যত বাজে খবর নিলে, এত কায হ'লো, কার দোহাই দিয়ে হ'ল—তার খবর নিল না। ভাই, আশ্চর্য্য হচ্ছি, আমার দ্বারা এত বড় কায হ'বে আমি জান্‌তাম না।

বিলেত হ'তে আসার ২।৪ দিন পরেই বিলেতের পোষাক ছেড়ে সেই ২৲ টাকা দামের চাদর, ২॥০ টাকা দামের জুতা ব্যবহার করতে লাগ্‌লেন। এত যে মান সব ছুড়ে ফেলে দিলেন।

স্বামিজীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

কেউ দুঃখ পেয়ে স্বামিজীর কাছে আস্‌লে আর কিছু না পারলে, দুটা গান শুনিয়ে স্ফূর্ত্তি দিতেন।

গুরু ভাইদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ঠাকুরের নীচেই। যা কিছু গুরু ভাইদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ওঁর দ্বারাই হ'য়েছে।

সকলেই বাড়ী ফিরে গিছলো স্বামিজী ধ'রে ধ'রে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

স্বামিজী আপনার ভাইদের চেয়ে গুরু ভাইদের ভালবাস্‌তেন ও বিশ্বাস করতেন।

অভেদানন্দকে যখন বল্লেন—তুই আমেরিকায় চল। অভেদানন্দ কাঁদতে লাগ্‌ল, আর বলে, 'একা কি ক'রে যাব'। স্বামিজী বল্লেন—আমি একা কি ক'রে গিছ্‌লাম। যাঁর মুখ দেখে আমি গিছলাম—তুইও তাঁর মুখ দেখে যা।

আলমোরা পাহাড়ে স্বামিজীকে এক মুসলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন দেখা। স্বামিজী দৌড়ে গিয়ে তার হাতে ২৲ টাকা দিলেন। লাটু মহারাজ বল্লেন, 'ঐ লোকক্কে কেন টাকা দিচ্ছ?'

স্বামিজী বল্লেন—ও আমায় অসময়ে ফল খাইয়েছিল; টাকা কি বল্‌ছিস্ ওরে লেটো, অসময়ে উপকারের মূল্য নেই। *

---

* স্বামিজী পরিব্রাজক অবস্থায় আলমোরা ভ্রমণ কালে আহার

কাঁকুড়গাছিতে স্বামিজী রামবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিছ্‌লেন। রামবাবু তখন পীড়িত। স্বামিজী অনেকের সাক্ষাতে জুতা এগিয়ে দিলেন। রামবাবু কেঁদে বল্লেন—বিলে, কর কি, কর কি? স্বামিজী উত্তরে বল্লেন—'রামদাদা! আমি তোমার সেই বিলে। তুমি যা উপকার করেছ, তা কি আমি ভুলে গেছি?' উভয়েই কাঁদতে লাগলেন।

মাতৃজাতির প্রতি।

(ব্রহ্মচারী নন্দদুলাল।)

সন্ন্যাসী ছাড়ে নি তোমা ভাবি অতি হেয়
হে রমণী, ওগো মূর্ত্তিময়ি সতি!
সন্ন্যাসী এসেছে দূরে হে মহিমময়ি,
বুঝিতে মহিমা পদে লভিতে ভকতি।
সন্ন্যাসী ভেবেছে তোমা ওগো মাতৃরূপা
জননী ব্যতীত তুমি নহ কিছু আর
ভুলিতে মা অন্যরূপ, দিতে ডুবাইয়া
তোমার করুণাহ্রদে যা কিছু তাহার।
মায়াময় এ সংসারে থাকিলে জননী
তোমার জননীরূপ ভুলে যে মা যাই
তোমার করুণামূর্ত্তি করে দিশেহারা
অন্ধ আমি—অন্য ভেবে তোমাপানে ধাই॥
ভুলে যাই শিশুকাল ভুলি মা কিশোর
প্রমত্ত যৌবন মোরে করে আত্মহারা

বিহীনে মৃতকল্প হইলে—ঐ ফকির কাঁকুড় খাওয়াইয়া স্বামিজীকে প্রাণদান করিয়াছিল।

পশু আমি পশুবৎ করি আচরণ
ভুলে যাই ও অনন্ত করুণার ধারা ॥
দশমাস দশদিন ধরেছ উদরে
বক্ষক্ষীরে পালিয়াছ অধম সন্তানে
চক্ষুষ্মান হৃদিবান সন্তান তোমার
সেই দয়া, সে কথাটী ভুলিবে কেমনে ॥
তাই যায় দূরে সবে ওগো মাতৃজাতি
যত তব আত্মভোলা সন্তানের দল
করিতে সংযত মন হৃদয়ে বাহিরে
তোমার অনন্তরূপ ভাবিতে কেবল ॥
তুমি তার ইষ্টমূর্ত্তি তোমা হীন ভাবা
সে যে তার চিরতরে পতন মরণ
দূর গিরি-গুহা মাঝে নিবিড় বিপিনে
সে যে হৃদে চির তোমা করে মা পূজন ॥
শিব বামে উমা তুমি রাম-বামে সীতা
নারায়ণ-পাশে তুমি কমলা সুন্দরী
তোমার জননীরূপ ধ্যান করে যোগী
ধন্য হয় চিত্ত পায়ে সমর্পণ করি।
তুমি মা বিমুখ হলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ছার
ভগবান নাহি পারে রাখিতে কাহার
অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীব কোথা ভেসে যাবে
জগতের কোন্ কোণে কোন অজানায় ॥
কাম-দগ্ধ কলুষিত নয়নে চাহিয়া
সন্ন্যাসী করেনি তব কভু অপমান
চিরদিন মাতৃ আখ্যা দিয়েছে তোমায়
চিরদিন মাতৃ ভাবে বাড়ায়েছে মান ॥
সন্ন্যাসী তোমারে কভু নারী নাহি ভাবে,
তুমি দেবী চিরদিন জননী তাহার

নিশিদিন তারা তব কোলের বালক
নিশিদিন আশ্রিত মা, সতত তোমার ॥
তুমি তারে অন্নদানে পুষ্টকর দেবী
আশীর্ব্বাদে দাও আলো তাহার পথেতে
অন্তরে বাহিরে তুমি একমাত্র তার,
সে কি তোমা কোনদিন পাবে মা ছাড়িতে ॥
তব আশীর্ব্বাদ বিনা বৃথা মা সন্ন্যাস
তোমার করুণা বিনা আর কিছু নাই
এই ভিক্ষা দেহ দেবি, যেন প্রতিরূপে
তুমি বিরাজিত আছ দেখি মা সদাই
যেন আমি গলে যাই যেন ডুবে যাই
তোমার করুণাহ্রদে চিরদিন তরে
সকল কামনা ত্যজি যেন মা সন্ন্যাসী,
তোমার চরণভিক্ষা নিশিদিন করে।
ওগো চির প্রীতিময়ি। ওগো নিরুপমা।
তোমার তুলনা মাগো ত্রিজগতে নাই
মহেশের চিন্তা তুমি দুরাকাঙ্ক্ষা মাগো
তব আশীর্ব্বাদ যেন চিরদিন পাই ॥

'মায়ার খেলা'

(শ্রীঅক্ক)

যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষগণ এক সময় বন-বিষ্ণুপুরের বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে একথা বন-বিষ্ণুপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই শুনা যায়। তাঁহার প্রাচীন অট্টালিকার অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ এখন একরূপ অ-ব্যবহার্য্য হইয়া যাইলেও বর্ত্তমানে যে কয়টীতে তিনি বসবাস করেন সেগুলি বেশ শ্রীসম্পন্ন ও নানা পুরাতন আসবাবে পরিপূর্ণ। লোক মুখে শুনা যায় তাঁহার ভগ্ন-জমাদারীর বাৎসরিক আয় এখনও দশ হাজারের ন্যূন নহে। সংসারে তাঁহার নিজের বলিতে একটী বিধবা কন্যা ও তাহার একটী পুত্র সন্তান। ১৩০১ সালে বিষ্ণুপুরে যে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়—তাহার প্রবল আক্রমনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতী-সাধ্বী স্ত্রী-রমাসুন্দরী এবং তাঁহার হরকিশোর ও নন্দকিশোর, উপযুক্ত দুই পুত্র, তাঁহাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। সংসারে দাসদাসী পাচ সাত জন থাকিলেও বৃদ্ধ বয়সে সুখ, অ-সুখের জন্য একজন আপনার জন কাছে থাকা সর্ব্বদাই প্রয়োজন, তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার একমাত্র বিধবা কন্যা তারাসুন্দরী ও দৌহিত্রটীকে শ্বশুরালয় হইতে আনাইয়া নিজের কাছেই রাখিয়া দিয়াছেন। এই দৌহিত্রই এখন তাঁহার ভবিষ্যতের একমাত্র আশা, নয়নের একমাত্র পুত্তলি, তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার নাম রাখিয়াছেন 'হারাধন'। তারাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল—একমাত্র পুত্রটীর নাম একটু দেখিয়া-শুনিয়া বাছিয়া-গুছিয়া রাখিবেন, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার নেহাত পীড়াপীড়িতে তাহা আর হইল না, ঐ সেকেলে 'হারাধন' নামেই অনিচ্ছাসত্ত্বে মত দিতে হইল। রূপ থাকিলে নামে কিছু আসিয়া যায় না। হারাধনের দুখানি টানা চক্ষু, ফুলের পাপড়ির

মত পাতলা দুটী ওষ্ঠ, গোলাপি আভায় রঞ্জিত গণ্ডদেশ, সুগোল বাহুদ্বয়, দুধে আলতায় গোলা অঙ্গরাগ, সর্ব্বোপরি—বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় সুকোমল স্বরলহরী তাহাকে সকলেরই প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। হারাধনের বয়স যখন ছয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া সাতে পড়িল তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন শুভক্ষণে তাহাকে স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন, তারাসুন্দরীর শোক দুঃখময় জীবনের মধ্যে সেই দিন যেন কোন্ সুখ রাজ্যের একটুখানি অমৃত-শীতল হাওয়া ক্ষণিক তাঁহার প্রাণের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জমীদারী সংক্রান্ত কোন কর্ম্মের জন্য একদিন স্থানান্তরে যাইতে হইল। যাইবার সময় তিনি কন্যাকে বলিয়া গেলেন— "মা হারাকে বেশ সাবধানে রাখ্‌বি—আমি পাঁচ সাত দিন পরেই ফির্‌ছি।" পিতার যাইবার দুই তিন দিন পরে তারাসুন্দরী একদিন মধ্যাহ্ন আহারের পর 'কৃত্তিবাসি' রামায়ণখানা লইয়া কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে কিয়দংশ অনুচ্চস্বরে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—"দিদিমণি—নায়েববাবু রামসিং দারোয়ানের হাতে চিঠি পাঠিয়েছে—কর্ত্তার ভারি ব্যামো।" তারাসুন্দরী সর্পাহতের ন্যায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"সেকি, ঝি, কৈ চিঠি।" তারাসুন্দরী চিঠি খুলিয়া দেখিলেন—নায়েব বাবু লিখিতেছেন—"দিদিমণি, কর্ত্তার গতকল্য ভোর রাত্রি হইতে আট দশ বার ভেদবমি হইয়াছে। নাড়ী খুব ক্ষীণ। তিনি আপনাদিগকে দেখিতে চাহেন।" তারাসুন্দরী পুত্রকে লইয়া তৎক্ষণাৎ শকটারোহণে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পিতার শেষ আশা রক্ষা করিতে পারিলেন না। গ্রাম প্রবেশের পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলেন—পিতার শেষ চিহ্নটুকু চিতাবক্ষে ধূমায়িত হইয়া নীরব ভাষায় জগতের নশ্বরতা প্রতিপাদন করিতেছে।

পিতার কাল হইবার কয়েক বৎসর পরে ক্ষয়কাশে ভুগিয়া ভুগিয়া তারাসুন্দরীর জীবন প্রদীপ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। ডাক্তার কবিরাজগণ তাঁহার জীবনের আশা একরূপ ত্যাগ করিলেন। এক-দিন রাত্রে নিজের শেষ অবস্থা সন্নিকট বুঝিয়া তারাসুন্দরী মাথায়

হাত রাখিয়া পুত্রের মুখ পানে একবার শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"বাবা, আমি চল্লাম, তুমি চিরজীবী হও, ধর্ম্মে মতি রেখ।"

কাল ধীরে ধীরে সকলই গ্রাস করে। মাতামহের মৃত্যু যাহা হারাধনের সুকোমল প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল তাহার যন্ত্রণা যেরূপ ধীরে ধীরে হারার অন্তর হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল, প্রাণাধিক প্রিয়তমা জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপা তাহার মাতার নিবিড় শোক ছায়াও তাহার হৃদয় হইতে সেইরূপ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। হারাধন কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। যৌবনের প্রবল জোয়ার আসিয়া তাহার ক্ষীণ শুষ্ক-প্রায় জীবন-প্রবাহ কানায় কানায় ভরাইয়া তুলিল। সে বুঝিল জগত শুদ্ধ দুঃখময় নহে,—বিচ্ছেদ, শোক, তাপ কেবলই এখানে রাজত্ব করে না—উহাদের কঠোর আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্য্য, আছে মিলন আর মন্দাকিনীর ধারায় আছে সুখের অনন্ত প্রবাহ। তাহার মাতামহ ও মাতার মৃত্যুর পর যে গৃহ এতদিন শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ থাকিত—আজ তাহা অসংখ্য প্রিয়তম বন্ধুর দিবারাত্র গমনাগমনে সদা প্রফুল্ল, সদা হাস্যময়। হারাধন এখন অভিভাবক শূন্য. এক কথায়—স্বাধীন। তাহার এই উদ্বেলিত যৌবন প্রবাহের বেগ নিয়মিত করিতে পারে এমন চেষ্টা কাহারও নাই। দুইবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া সে লেখাপড়া ত্যাগ করিল। বিদ্যাশিক্ষা এতদিন তাহার অভীপ্সিত বস্তুর পূর্ণরূপ চরিতার্থতার বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ ছিল, এখন সে বাধাও বিদূরিত হইল। বৃদ্ধ নায়েব রামহরি ওরফে 'হারলবাবু' হারাধনকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি সুযোগ পাইলেই হারাধনকে অনেক বুঝাইতেন—সংসার কার্য্যে মনযোগী হইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতেন, কিন্তু হারাধন বলিত—"হারলবাবু, জমীদারীর কাজ, অতি নীচ কাজ, উহা আপনিই দেখিবেন—কেবল মাসের প্রথমে আমায় খরচের টাকাটা দিলেই হইল।" রামহরি—অতি মনযোগের সহিত জমীদারীর সমস্ত কর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি অতি বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাকে বড় চটিতে দেখা যাইত না—কিন্তু

হারাধনের প্রধান অন্তরঙ্গ, চতুর পবিতোষ রামহরিকে চটাইবার একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। রামহরি—কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন এবং তদনুযায়ী স্থূল উদর তাঁহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিত। পবিতোষ তাঁহার উদরে হস্তার্পণ করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করিত—"কি হাবলবাবু কেমন আছেন ?" তখন রামহরির ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। তাহার একটী কারণও ছিল। বৃদ্ধ নায়েবের স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাহার উদরে হস্তার্পণ করার জন্য তাহার স্থূল শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। একদিন রামহরি বাহিরের দলানে বসিয়া নিবিষ্ট মনে জমীদারী সংক্রান্ত খাতাপত্র দেখিতেছেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীগণও স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত—এমন সময় পবিতোষ আসিয়া বৃদ্ধ নায়েববাবুর উদরে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হাবলবাবু, কেমন আছেন ?" তদৃষ্টে অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ হো, হো, করিয়া হাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ নায়েব ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যারে পবিতোষ, তোর বাপ খুড়ো আমার তাঁরের চাকর, আর তুই কিনা যখন তখন আমার সঙ্গে রসিকতা করিস ? আমি কি তোর এয়ার ? হারার জন্য আমার মানইজ্জত সব গেল। আজ হতে যদি আমি তার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসি তবে আমার নাম রামহরি ঘোষ নয়।" এই বলিয়া বৃদ্ধ নায়েববাবু সেই স্থান চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইলেন। বৃদ্ধ নায়েবের যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীও চঞ্চলা হইলেন। বৃদ্ধ নায়েবের ভয়ে নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ বড় কিছু করিতে পারিত না—এক্ষণে তাহারা নির্ভয়ে দিন দুপুরে ডাকাতি আরম্ভ করিল। হারাধনের জমীদারী বাকি খাজনার দায়ে একে একে নিলামে উঠিতে লাগিল। হারাধনের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধেও সত্যমিথ্যা অনেক কথা লোকমুখে শুনা যাইত। পাড়ার একটী দরিদ্রা ব্রাহ্মণ বিধবা হারাধনের সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম ও পাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, তাঁহার সুন্দরী যুবতী কন্যা গিরিবালা বিধবা হইয়া শ্বশুরালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাতৃ ভবনে আসিয়া বাস করিতেছিল। কেহ কেহ কাণা ঘুষা করিত তাহার উপর হারাধনের কু-দৃষ্টি পড়িয়াছে। একদিন সন্ধ্যার সময় গিরিবালা গ্রামের বহিঃস্থিত দিঘী হইতে জল লইয়া ফিরিতেছে। তখন

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গোধুলির শেষ আলোকরশ্মির সহিত মিশ্রিত হইয়া এক নবরূপ তরঙ্গের সৃজন করিতেছিল। সে রূপে চাঞ্চল্য বা চিত্ত বিক্ষেপকর মাদকতা ছিল না—ছিল একটা ভাবের প্রেরণা যাহা সেই অপূর্ব্ব বিশ্বশিল্পীর অনুসন্ধানে চিরদিন মানব মনকে প্রবুদ্ধ করিয়া থাকে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় শাল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বিজন পথ ধরিয়া গিরিবালা সংসারের সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে দেখিতে পাইল একটা অস্পষ্ট ছায়ার মত কি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে দেখিল উহা আর কেহ নহে—স্বয়ং হারাধন। হারাধনকে গিরিবালা ভাল করিয়া চিনিত। এই অসময়ে তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া গিরিবালার অন্তঃস্থল একটী অব্যক্ত ত্রাসে কাঁপিয়া উঠিল। হারাধন মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিয়া গিরিবালার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। গিরিবালা কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"হারাদাদা এ সময় কোথায় যাচ্ছেন?" হারাধন বলিল—সে কথা এখন থাক, গিরি, জান, আমি তোমার কে?

গিরিবালা বলিল, তা, আর জানিনা হারা দাদা, আপনার খেয়েই ত মা আমি বেচে আছি।'

হারা বিজড়িত কণ্ঠে—'না, গিরি, তুমি আমার—'

বলিতে বলিতে গিরিবালার বস্ত্রাঞ্চল ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। গিরিবালা ভয়ে পিছাইয়া গিয়া আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া বিপদের কাণ্ডারী শ্রী-মধুসূদনকে স্মরণ করিল।

অসহায়া—বিধবার করুণ প্রার্থনা শ্রীভগবানের কর্ণগোচর হইল। একটী জটাজুটধারী সন্ন্যাসী চকিতের মধ্যে আসিয়া হারাধনের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। হারাধন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'সন্ন্যাসী আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও,—ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের সম্মুখে দাঁড়াইলে প্রমাদ ঘটিবে।' সন্ন্যাসী শান্ত ভাবে উত্তর করিল, 'বাবা, তুমি শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখিতে হয়—তাহা কি তুমি জান না? বৎস, পাপের প্রেরণায় কি গর্হিত কার্য্য করিতে যাইতেছ, একবার ভাবিয়া দেখ।' হারাধন ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, 'তোমার নিকট

তত্ত্ব উপদেশ লইবার জন্য আমি আসি নাই। তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।' সন্ন্যাসী কোন উত্তর না করিয়া বিদ্যুতবেগে হস্ত-স্থিত শূল দ্বারা হারাধনের মস্তকে আঘাত পূর্ব্বক তাহাকে ভূপাতিত করিলেন। গিরিবালা তখন নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ দেখিয়া কৃতজ্ঞপূর্ণ-হৃদয়ে সন্ন্যাসীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা, তুমি আমার পিতা।' সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া উত্তর করিল, 'মা, আমি কে? শ্রীহরিই আজ এই নর-পিশাচের হস্ত হইতে তোমায় রক্ষা করিয়াছেন।' কিয়ৎক্ষণ পরে হারাধন চৈতন্য প্রাপ্ত হইল, সে উঠিয়া দেখিল—গিরিবালা নাই, সন্ন্যাসীও নাই, কেবল বায়ু-তাড়িত, শাল বৃক্ষগুলি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে প্রমথ দলের মত তাহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে।

* * *

বন-বিষ্ণুপুরের চতুর্দ্দিকে যে শাল বন দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে অসংখ্য সুগঠন দেব মন্দির দেব-দ্বিজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সাধু-সন্ন্যাসীগণের আশ্রয় স্বরূপে এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী উহাদের মধ্যে একটীতে বাস করিতেন। গিরিবালা সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া কখনও কখনও সুযোগ ও সুবিধা মত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। তাহার সংসার-তাপ-দগ্ধ হৃদয় অল্প সময়ের জন্যও সন্ন্যাসী মুখ নিঃসৃত ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন রূপ অমৃত-বারি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। স্বামী-সুখবঞ্চিতা দরিদ্রা বালবিধবা গিরিবালা বুঝিয়াছিল সংসার কি, উহার সুখ কত ক্ষণ-ভঙ্গুর তাই সংসার যবনিকার অন্তরালে যে অমৃত নির্ঝরের সে এতদিন সন্ধান করিতেছিল ভগবৎ-কৃপায় সন্ন্যাসীর নিকট সে তাহা পাইয়াছে। তাই গিরিবালা সন্ন্যাসীকে প্রাণাধিক ভালবাসিত। সে ভালবাসার মধ্যে আবিলতা ছিল না—ছিল একটী শুদ্ধ প্রেমের বন্ধন, যাহা ক্ষীণ হইলেও শ্রীভগবানকে ভক্তের নিকট চিরতরে বাঁধিয়া রাখে। একদিন সন্ধ্যার পর গিরিবালা সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে গিয়া উপনীতা হইল। সন্ন্যাসী রামায়ণ হইতে 'সীতাবর্জ্জন' উপাখ্যান পাঠ করিয়া তাহাকে

শুনাইতে লাগিলেন। এমন সময় কি একটা শব্দে তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল, তাঁহাদের মনে হইল যেন কুটীর দ্বার বাহির হইতে কে বন্ধ করিয়া দিল। গিরিবালা উঠিয়া গিয়া দেখিল যে বাস্তবিকই উহা বাহির হইতে বন্ধ। তখন সে আকুলিত হৃদয়ে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, এখন উপায়?' সন্ন্যাসী নিরুদ্বেগ অন্তরে প্রশান্ত বদনে উত্তর করিল,—"উপায় আর কি মা, 'চক্রের চক্রী' শ্রীহরিকে স্মরণ কর, তিনিই একমাত্র উপায়।' কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কাটিবার পর ক্ষুদ্র গবাক্ষ দ্বার দিয়া সন্ন্যাসী ও গিরিবালা উভয়ে দেখিতে পাইল—বহুলোক কোলাহল করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। শুনিতে পাইল কে একজন বিকটস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছে। 'মণ্ডল মহাশয়, শয়তান ও শয়তানীটাকে পুড়াইয়া ফেলুন।' কণ্ঠস্বরে গিরিবালা বুঝিতে পারিল উহা আর কেহ নহে—স্বয়ং হারাধন। ক্ষিপ্তপ্রায় জনস্রোত দ্রুত গতিতে মন্দির বেষ্টন করিয়া ফেলিল। মণ্ডল মহাশয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন—সন্ন্যাসী প্রশান্ত-ভাবে উপবিষ্ট তাহার সৌম্য মুখমণ্ডল ক্ষিপ্তপ্রায় পল্লিবাসিগণের সকল প্রচেষ্টায় যেন উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। আর গিরিবালা—হত-ভাগিনী গললগ্ন-কৃতবাসে, যুক্ত করে উর্দ্ধনেত্রে দণ্ডায়মানা—তাহার প্রাণ-পক্ষী দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া বহুক্ষণ যেন কোন অসীমের উদ্দেশ্যে উড়িয়া গিয়াছে। হারাধনও তাহার প্রধান অন্তরঙ্গ পরিতোষ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গিরিবালার দীর্ঘ কেশপাশ ধরিয়া এবং সন্ন্যাসীকে গললগ্নকৃতবাসে মন্দির হইতে বাহির করিল। তখন অসংখ্য উন্মত্ত পিশাচবৎ পল্লিবাসী তাহাদের উভয়কে আক্রমণ করিল। হারাধন, গিরিবালার আলুলায়িত কেশ পাশ আকর্ষণ করিয়া অতি নির্দ্দয়ের মত পাদুকাঘাত করিতে লাগিল এবং 'বক-ধার্ম্মিক' 'লম্পট' 'শয়তান' প্রভৃতি গালিবর্ষণের সহিত অবিরাম বারিধারার ন্যায় অজস্র মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাত সন্ন্যাসীর পবিত্র অঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। মণ্ডল মহাশয় কিঞ্চিৎ দয়ার্দ্র হৃদয় হইয়া সকলকে অতঃপর ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি

কয়েকজন প্রাচীন ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন! 'আগামী কল্য হইতে গিরিবালা আজীবন জাতঃপতিত থাকিবে, এবং সন্ন্যাসীকে আদেশ করা হইল অদ্য রজনীতেই তাহাকে বন-বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। নিশার প্রভাতে তাহাকে এস্থানে দেখিতে পাইলে তাহার পক্ষে বিষম প্রমাদ উপস্থিত হইবে।' সন্ন্যাসী সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

(ক্রমশঃ)

বিবেকানন্দ *

(প্রসাদ)

জ্ঞানের আদর্শ তুমি মহান হইতে মহীয়ান,
ভক্তির আদর্শ তুমি মহাশক্তি বিগলিত প্রাণ॥
নরের আদর্শ তুমি ধন্য এই বঙ্গভূমি,
তোমারে জঠরে দিয়ে স্থান॥
তুমি ছিলে তুমি রবে, তুমি আছ এই ভবে
বিশাল আকাশ শিরে নিত্য সূর্য্য তুমি ভাসমান।
জাগালে জাতির প্রাণ মোহ হ'ল অবসান,
বিবেক-আনন্দ স্বামী।—
অনন্তে ছুটুক তব গান॥

---

* গত ১লা মার্চ্চ স্বামীজির জন্মোপলক্ষে ষ্টার থিয়েটারে সাধারণ জন-সভায় গীত।

নববর্ষ।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

কত আশা ও উদ্বেগ উল্লাস ও নৈরাশ্যে দ্রুতস্পন্দিত হৃদয় লইয়া আজ বাঙ্গলা দেশ বৈশাখের প্রথম প্রভাতে জাগিয়া উঠিল। বিষাদ-খিন্ন শঙ্কা-কাতর বাঙ্গালী জীবনের ভূম্যবলুণ্ঠিত মহিমা আজ না জানি কাহার দিব্য স্পর্শে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে—এসো নববর্ষ! তোমার উগ্র-উজ্জ্বল রৌদ্রালোকের পুলকবন্যা বাঙ্গালীর জীবন হইতে সমস্ত জড়ত্ব ও অপবাদের কালিমা ধৌত করিয়া ফেলুক।

এসো নববর্ষ, আমরা জাগিয়াছি। বাঙ্গালার পল্লী-প্রাঙ্গণের ধূলি-তলে বসিয়া তোমার আহ্বান অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। বিনম্র শ্রদ্ধায় প্রদত্ত বাঙ্গালী হৃদয়ের এ অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর। আজ আর আমরা পুরাতনের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনাস্তূপ স্কন্ধে বহিয়া লজ্জাবনত শিরে তোমার দুয়ারে কুণ্ঠিত করাঘাত করিতেছি না। আজ আমরা অতীতের পরিতাপ স্মৃতির অসহায় দৌর্ব্বল্য বিস্মৃত হইয়া তোমার ভাণ্ডারে যা কিছু নূতন, যা কিছু মহান তাহাই অগৌরবে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এখন তুমি অকৃপণ করে তোমার ভাণ্ডার উন্মুক্ত কর, আমরা মনুষ্যত্বের সমান উত্তরাধীকারসূত্রে উহা লুটিয়া লইব।

* * * *

যতই দিন গিয়াছে বাঙ্গালীর জীবনসমস্যা ততই জটীল হইতে জটীলতর হইয়াছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন সমস্যার পর সমস্যায় বাঙ্গালী জীবনকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিয়াছে। এক কথায় একটা জাতির অদৃষ্টে যত রকম দুর্ভাগ্যের কল্পনা করা যাইতে পারে বাঙ্গালীর ভাগ্যে একে একে সবই ঘটিয়াছে। সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী আজ মরণের মুখে দাঁড়াইবা মাত্র যেন তাহার চমক ভাঙ্গিয়াছে সহসা এই পতিত জাতি (মরিব না) বলিয়া মরিয়া হইয়া ফিরিয়া

দাঁড়াইয়াছে। তন্দ্রাক্লান্ত অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে আর সে অসম্ভব সৌভাগ্যের সুখস্বপ্নের নেশায় অভিভূত থাকিতে লজ্জাবোধ করিতেছে—সে আজ পূর্ণ বিস্ফারিত নেত্রে নিজের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে চাহে।

বাঙ্গালী জানে সে অক্ষম, দুর্ব্বল, দীন—তাহার অন্ন নাই বস্ত্র নাই। প্রত্যহ শূন্য উদর উভয় হস্তে চাপিয়া সে জীর্ণ মলিন শয্যায় পড়িয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। তাহার সন্তান বুভুক্ষু, নারী বিবস্ত্রা—এই পৃথিবীতে আজ তাহার মত অক্ষম কে? এই অক্ষমতার অভিশাপগ্রস্ত জীবন আজ এত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে যে ইহার একটা আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটাই বাঙ্গলাদেশ হইতে লুপ্ত হইবে। বোধ হয় বাঙ্গালার ভাগ্য বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ—তাই বাঙ্গালী জীবনের একটানা ক্রমাবনতির স্রোতে আজ জোয়ার আসিয়াছে। পরিস্ফীত ভাবোচ্ছ্বাসের নবসঙ্গীতে দিক মুখরিত করিয়া বাঙ্গালী-জীবন আজ উজান পথে আনাগোনা করিবে। এতদিনে বুঝিবা নবযুগ প্রবর্ত্তকের বাণী বাঙ্গালী-জীবনে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিতে চলিল—অন্ধগণ একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ।

* * *

হে নববর্ষ, তোমার উজ্জ্বল প্রভাত আলোকে আজ জন্মালস বাঙ্গালার সম্মুখে একি অভিনব সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রকৃতির ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গনে যেখানে জগতের সমস্ত মনীষী মহাপুরুষ স্ব স্ব অক্লান্ত চেষ্টার ফল রাখিয়া গিয়াছেন, মনুষ্যত্বের সেই বিপুল কর্ম্মশালায় ভগবান যে বাঙ্গালীর জন্যও উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এতদিন বাঙ্গালী তাহা বুঝিতে পারে নাই কেন? প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে নবযুগ প্রবর্ত্তক আচার্য্য বিবেকানন্দ ভৈরবমন্ত্রে বাঙ্গালীকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেদিন সে আহ্বান শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহার কেমন মতিভ্রম হইয়াছিল, সে পথ খুঁজিয়া পায় নাই। নানাপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া এই সুদীর্ঘকাল সে কাতর ব্যথায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়াছে।

যাক অতীতের কথা—দুর্দ্দিনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মাথার উপর যে

কোন অজ্ঞাত বজ্র উদ্যত করিয়া রাখুক না কেন, এসো বাঙ্গালী আজ তুমি নিস্তব্ধ জড়ত্বের সুপ্তিশয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ-কোটর হইতে নির্গত হও, নির্ভীক মস্তক উন্নত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর, নববর্ষের নূতনত্বকে সার্থক ও সফল করিয়া তোলো। বিনা চেষ্টায় অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যস্তূপ কল্পনা করিয়া লুব্ধ হইও না, স্বার্থান্ধ প্রতিদান প্রত্যাশার ছলনায় ক্ষুব্ধ হইও না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবৈষম্যে বিরক্তি-বিকৃত চিত্তে বিমুখ হইও না, আজ নববর্ষের প্রথম প্রভাতে নবযুগের দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্যকে দ্বিধা সঙ্কোচ ও নৈরাশ্য দিয়া খর্ব্ব ও খণ্ডিত করিও না—ইহাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ ও স্বীকার কর।

* * . * *

পুরাতনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এই যে আর একটী নববর্ষ আজ প্রাতঃসূর্য্য করে আমাদের সম্মুখে ঝলমল করিয়া উঠিল ইহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যকে ইহার পরম প্রয়োজনকে যেন আমরা নিবিড় ভাবে অনুভব করি। ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুমহান প্রয়াস বাঙ্গলাদেশের বক্ষেই প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই অসমাপ্ত কার্য্য পুনরায় নবউদ্যমে আরম্ভ করিবার জন্য বাঙ্গালীকে আজ ভগবান পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন, অতএব যে শ্রদ্ধায় যে নিষ্ঠায় যে আত্মবিসর্জ্জনে সেই মহান ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে তাহা যেন আজ উদ্যত ও প্রস্তুত করিয়া রাখি। বিঘ্নবহুল পথের সুদুর্গম বন্ধুরতা যেন আমাদের গতিবেগ প্রতিহত না করিতে পারে—অনাগত ভবিষ্যৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। মানুষের জন্মগত, জাতি-গত ও ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বৈচিত্র্য, মতবৈচিত্র্যকে খর্ব্ব বা ক্ষুণ্ণ না করিয়া আধ্যাত্মিকতার এক সার্ব্বজনীন ভিত্তির উপর হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জৈনের সমন্বয় সাধন। প্রত্যেক মানুষই স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব বিবেকানুমোদিত পন্থায় উন্নততর জীবন যাপনের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইবে—এই আদর্শ বাঙ্গালাদেশ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পাইয়াছিল—ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব বাণী। আর বাঙ্গালীর দ্বারাই এই কার্য্য আরব্ধ ও সুসম্পন্ন হইবে বিবেকানন্দ ইহা বিশ্বাস করিতেন।

তাই মহাপুরুষ বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এই কথাটুকু একান্ত বিনীত ভাবে নববর্ষের প্রথমেই বাঙ্গালীর হৃদয়ের দ্বারে বুদ্ধির দ্বারে নিবেদন করিতে চাই। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন তাহা বাঙ্গালার আত্মবিস্মৃত হৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে শুধু তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। উত্তেজনাক্ষুব্ধ হৃদয়কে সংযত করিয়া যদি এই সাধনায় আমরা প্রবৃত্ত না হই তাহা হইলে নববর্ষের সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নয় সুরাসুরের মিলিত মন্থনে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে আবার গরলও উঠিতে পারে। অতএব বাঙ্গালী আজ আত্মস্থ হও ক্ষুদ্র স্বার্থে ক্ষুদ্র দম্ভে ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যায় মজিয়া একটা জাতির অদৃষ্ট লইয়া আর নির্লজ্জ কন্দুকক্রীড়া করিও না। স্বার্থান্ধ অন্ধবিশ্বাসী ত্যাগের মহিমাময় গৈরিক দীপ্তিতে আজ ভারতের কল্যাণ-পথ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—প্রবৃত্তির চাপাল্য-বিভ্রান্ত হইয়া আর অসার ভোগবাদের প্রলাপ বকিও না। আজ বর্ষারম্ভের প্রথম প্রভাতে শুচিস্নাত বাঙ্গালী সাধক পুরাতন বর্ষের অক্ষমতার লজ্জা অপবাদের গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিয়া যদি অনুদ্ধত শৌর্য্য অবিচলিত রাখিয়া কর্ম্মেপ্রবৃত্ত হইতে পার, এবং "চালাকী দ্বারা কোন মহৎকার্য্য হয় না" বিবেকানন্দের এই অমূল্য উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা না হারাও তাহা হইলে এবারকার আয়োজন কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না। আগামী বর্ষের প্রত্যেকটী দিনের তরুণ সূর্য্যালোক তোমাদের অবদানগুলিকে কল্যাণ স্পর্শে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

হৃদয়বান বাঙ্গালী যুবক যাহাদিগকে বিবেকানন্দ তাঁহার চিন্তাজগতের যৌবরাজ্য প্রদান করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন, তাহাদের উপর সহসা তো বিশ্বাস হারাইতে পারি না। তাই আজ আশামুগ্ধ হৃদয়ে বর্ষারম্ভকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া বলিতেছি হে নববর্ষের প্রভাত। তোমার আলোক অঙ্গুলির উজ্জ্বল ইঙ্গিত নব্য বাঙ্গালী সাধককে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করুক।

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(৫)

(শ্রীমতি সরলাবালা দাসী

বর্ত্তমানের মোহ।

এই যে সঙ্গ বা আসক্তি বা স্বার্থানুসন্ধিৎসা কৃপণতা, ভাবিয়া দেখিলে, ইহা কেবল বর্ত্তমানের মোহ। বর্ত্তমানের মোহ, মহান্ মানবত্বকে ক্ষুদ্রত্বের ভাবে বিভাবিত করে, মৃত্যু ভীতিরও ইহাই মূল-হেতু। মানুষ যদি বর্ত্তমানের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে তবে সে তাহার নিজের অন্তরের গভীরতা বুঝিতে পারে না, নিজের মহত্ত্ব নিজেই উপলব্ধি করিতে পারে না। বর্ত্তমান সময় সাময়িক লোকের সঙ্গ ও তৎসম্বন্ধীয় ব্যবহারিক জ্ঞানেই যে সন্তুষ্ট, সে দূরদর্শন ক্ষমতা হারায়, ভাবরাজ্যে সে পল্লবগ্রাহী হয় মাত্র। যদি বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত,—যে মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতেছে, তাহাই জীবনের ভিত্তি হইত, তাহা হইলে জীবন অসার ও মৃত্যুতেই ইহার পরিসমাপ্তি হইত। কিন্তু ইতিহাস আমাদের জানায়, "এই যে বর্ত্তমান' ইহা অতীতের ফল স্বরূপ, অতীতে ইহার মূল রহিয়াছে। অতীত মৃত হয় নাই, বর্ত্তমানের মধ্যেই জীবিত রহিয়াছে, হয় তাহা ভার-স্বরূপ হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কল্পিত কার্য্যে বাধা দেয়, নতুবা আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে উত্তেজিত করে। হয় এই অতীত আমাদের উপর প্রভুত্ব করে, অথবা আমাদের উন্নত কর্ম্ম-সাধনে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে "প্রেরণা" স্বরূপ হয়। আর্য্যদর্শন প্রারব্ধ মানেন, আবার পুরুষার্থও স্বীকার করিয়াছেন, ইহার ভাবার্থ এই যে, অতীত বর্ত্তমানের মধ্যেই আছে কিন্তু আমরা বর্ত্তমানের কর্ম্মের দ্বারা তাহাকে নিশ্চয় নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারি, এবং ভবিষ্যতের জন্য মহান কর্ম্মের বীজ বপন করিয়া যাইতে

পারি, পূর্ব্বাচরিত ভ্রম সংশোধন করিতে পারি, এবং অতীত মহত্বের বীজ বর্ত্তমানের বারিসিঞ্চনে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিতে পারি।

ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা অনন্তকালের ক্ষণিক ও সনাতন এই উভয় রূপের পার্থক্য কতকটা বুঝিতে পারি। ইতিহাসের অনেক ঘটনা সেই যুগের সাময়িক অবস্থা চিন্তাপ্রণালী প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, পরের যুগে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, নূতন যুগের আবির্ভাবে সমাজের অবস্থা, লোকসমূহের আচার ব্যবহার ও চিন্তা প্রণালী নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সেই যুগে যুগে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, যাহা সর্ব্বদেশের ইতিহাসে সর্ব্বকালে প্রাণ স্বরূপে বিরাজ করিতেছে। সনাতন সত্য এইরূপে দেশকালকে অতিক্রম করিয়া অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে একই সূত্রে বন্ধন করিতেছে।

বিপুলা পৃথিবীতে মানবজাতির মধ্যে বহু ধর্ম্মমত বর্ত্তমান আছে, নানা দেশে, নানা জাতিতে, নানা যুগে মহাপুরুষ বা অবতারগণ আবির্ভূত হইয়া মানব সমাজে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, সেই সকল ধর্ম্মের একমাত্র সারতথ্য, মৃত্যুকে অতিক্রম করা। যাজ্ঞবল্ককে, মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে ভগবন্ ধনরত্ন পূর্ণা সমস্ত পৃথিবী যদি আমার হয়, আমি কি তাহাতে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিব?" মৈত্রেয়ীর এই প্রশ্নে সমস্ত মানবজাতির অন্তরের ব্যাকুলতা ব্যক্ত হইয়াছে। অবসান ভীতি নিরন্তর মানবচিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সুখ যাইবে, সম্পদ যাইবে, মান যাইবে, প্রতিষ্ঠা যাইবে, প্রাণ যাইবে দিবা রজনী এই ভয়। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া মানুষ ভয়ে লোকেন্দ্র উপাসনা করে, রাজার উপাসনা করে। এমন কি ভগবানেরও উপাসনা করে। মানব-বুদ্ধি বর্ত্তমান জগতের সীমার পার কল্পনা না করিতে পারিয়া ভয়ার্ত্তের অবলম্বন স্বরূপ ভগবান কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু ভয়ের কল্পনা হইতে সৃষ্ট ভগবানও দণ্ডদাতা রূপে কল্পিত হন। মৃত্যুর সিংহাসন পৃথিবীর নিম্নস্তরে অন্ধতামস গর্ভে নহে, মানব বুদ্ধিতেই অবসান ভীতিরূপে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে।

(৬)

মৃত্যু-বরণে মৃত্যু বারণ।

মানুষ জন্মগত সংস্কারে মৃত্যুভীতির উত্তরাধিকারী বাইবেল বলেন আদম ও হবা জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়া পাপ ও মৃত্যুর অধীন হইয়াছিল। এক কথায় ভয়ই মৃত্যু এবং ভয়ই পাপ। আর সে ভয়ের উৎপত্তি কোথায়, না জ্ঞানবৃক্ষের ফলে। যুগে যুগে অবতারগণ মৃত্যুভীতিপরায়ণ মানবগণকে নানাভাবে অমরত্বের পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, নানা-ভাবে উদ্বোধিত করিয়া বলিয়াছেন "উঠ, জাগো, তোমার নিজ শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাত ও প্রাপ্ত হও।" কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্ব বোধ বুদ্ধিলভ্য নহে, কেননা বুদ্ধিতেই মৃত্যুরবীজ নিহিত রহিয়াছে। তবে কি যে সকল প্রাণীর বুদ্ধি বিকশিত হয় নাই তাহারাই অমরত্বের অধিকারী? তাহাও নহে। মৃত্যুভয়ের সহিত অপরিচয় অমরত্ব নহে, মৃত্যুভীতিকে অতিক্রম করাই অমরত্ব। চিন্তাশক্তি বুদ্ধি অথবা মনন করিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মানুষ প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মনুষ্য নামের সার্থকতা তাহাতেই নহে, মনও তাহাকে আপন সীমায় আবদ্ধ রাখিতে পারে না, মনের সাহায্যেই মানব সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে বলিয়াই মানব নামের সার্থকতা।

গীতা বলেন—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্য পরং মনঃ।
মনসস্ত পরাবুদ্ধি যোবুদ্ধে পরতস্ত স।"

'ইন্দ্রিয়গণকে দেহাদি জড়পদার্থে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই সেই আত্মা। পরিণামবাদের সহিত গীতার এই উক্তিটী মিলাইয়া লইলেই দেখা যায়,—প্রথমে ইন্দ্রিয় বোধহীন প্রাণী, ক্রমশঃ কর্ম্ম চেষ্টায় তাহাতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, ক্রমে মন পরে মন হইতে বুদ্ধি বিকশিত হইয়াছে, পরিণামবাদ এই পর্য্যন্তই বলিয়াছেন, "যোবুদ্ধে পরতস্ত সঃ" বলিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।

উদ্দালক মুনির পুত্র নচিকেতা মৃত্যুর নিকট অমরত্বের তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন*। যীশু আদমের সন্তানগণকে-এই বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন "যে কেহ আমার পশ্চাতে (অমরত্বের পথে) আসিবে, সে আপন ক্রুশ বহন করুক, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকেই অমৃতপদ বলিয়াছেন।

নচিকেতার উপাখ্যানে আমরা বিশেষ করিয়া তিনটী শিক্ষা পাই; প্রথম এই যে অন্তরে শ্রদ্ধার উদয় হইলে মানব আর মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকে না, যমপুরীতে গিয়া যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও তাহার ইতস্ততঃ ভাব হয় না। দ্বিতীয়, এই যে, সেই শ্রদ্ধাসম্পন্নবীর, যিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও সাহসী, তিনি মৃত্যুর দ্বারা নিগৃহীত না হইয়া বরং অর্চ্চিত হন, মৃত্যুই তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া অমরত্বের মুকুট পরাইয়া দেয়। তৃতীয় শিক্ষা, এই অমৃতের তথ্য মৃত্যু হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়, অথবা মৃত্যুতেই অমরত্ব, যেমন ক্ষুদ্রত্বের অবসান ও মহত্ত্বের বিকাশ একই কথা।

এই যে অবসান বা মৃত্যু—এ কেবল দেহের সম্বন্ধে নহে, জড় সম্পর্কীয়, সর্ব্ববিষয়েই একথা খাটে। কৃপণের ধনসম্পদ বুকে লইয়া রজনীতে নিদ্রা নাই, কেহ বা সেই ধনরাশি ধূলিরাশির মত বিলাইয়া দিয়া পরম সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু সেই অনিত্য ধনরাশি বুকে ধরিয়া থাকিব অথচ নিত্যধনের অধিকারী হইব ইহাও কি সম্ভব। মহাপুরুষগণ সকল সময়ই ত্যাগের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ত্যাগ, কেবল ত্যাগ নহে, সামান্য কিছু ত্যাগ করিয়া অসামান্য কিছু গ্রহণ। ত্যাগ, যেমন নিম্নতর সোপান না ছাড়িলে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করা যায় না। (ক্রমশঃ)

---

* যে গুলি গৃহীতার কোন প্রয়োজনেই আসিবে না পিতাকে সেই-রূপ কৃশা ও দুগ্ধহীনা গাভী দান করিতে দেখিয়া নচিকেতা দুঃখিত হইলেন, ও তাঁহার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি বিনীতভাবে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমাকে কাহাকে দান করিবেন? পিতা বারবার এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন "তোকে, যমকে দান করিলাম।" নচিকেতা পিতৃবাক্য পালনের জন্য নির্ভয়ে প্রসন্ন মনে যমা-লয়ে গমন করিলেন, ও সেখানে ত্রিরাত্রি অবস্থানের পর মৃত্যুর দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া তাঁহার নিকট অমরত্বের তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

(শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত, বি, এ,)

(ধর্ম্ম)

বাংলা দেশের আব্-হাওয়ায় এম্নি একটা কি আছে যে, তাতে কেবল করুণ সুরটাই বেশী করে বেজে উঠে। ধর্ম্ম, সঙ্গীত, রাজনীতি, চিত্রকলা, নাটক, উপন্যাস—যে দিকেই তাকাও না কেন, দেখ্‌বে, ঐ করুণ সুরটাই প্রধান সুর, আর যা' কিছু ওরই সঙ্গে মিশ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে মাত্র। কদাচিৎ এর রূপান্তর হয় না, বা নাই একথা বলা যায় না, কিন্তু সে এতই নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ যে, এ দেশে কখনো তার সার্ব্বজনীনত্ব লাভ করা ঘটিয়া উঠে নাই। একে ত এই, তার উপর আবার নূতন আমদানীর দুঃখ-দারিদ্র্যের জ্বালা ওটাকে সময়ে সময়ে ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে একেবারে হাহাকারে তুলে দেয়। নানা রকমারি সংস্কারের মধ্যে এই দুঃখ-দারিদ্র্যও যেন দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই আর একটা জন্মগত সংস্কার হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

গাঁয়ে গাঁয়ে কীর্ত্তনের ধূম লেগেই আছে। উচ্চরোলে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত লম্ফন, কুর্দ্দন, ক্রন্দন, বা অশ্রুবর্ষণ,—এরও অভাব নাই। দেখে শুনে ঠাকুরের কথা মনে হ'ত—"হরিনামে অশ্রু আর পুলক, জ্ঞানীর লক্ষণ।" মনে হ'ত, তবে ত এরা সবাই জ্ঞানী, হরিনামে অশ্রুবর্ষণ!! কিন্তু বেশ করে খুঁজে দেখ, মজা দেখ্‌বে এই ঐ অশ্রুবর্ষণ হরিনামের সঙ্গে হচ্ছে সন্দেহ নাই—কিন্তু ওর পেছনে রয়েছে, হয়ত কারো দারিদ্র্য-জ্বালা, কারো পুত্র-বিয়োগ-জনিত অন্তর্দ্দাহ, অথবা এম্নি একটা কিছুর তীব্র যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা অন্তরঙ্গ হয়েই রয়েছে, কেবল সময় বুঝে কীর্ত্তনের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ওটা উপ্‌চে উঠ্‌ছে মাত্র। এম্নি করেই করুণ সুরটা সমস্ত দেশকে একেবারে অষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে।

এর ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। খাঁটি ভাবের পথিকও আছে। তা'রা কিন্তু একেবারে অধিকারশূন্য হয়ে কখনো কোন কাজে হাত দেয় না।

কীর্ত্তন খুব ভাল জিনিস সন্দেহ নাই, আর ভাল বলেই ত ওর জন্যে ভয়ও তেম্নি বেশী। আনাড়ির হাতে পড়ে জিনিসের সত্য লোপ হয় না বটে, কিন্তু কর্ম্ম-কর্ত্তার অকল্যাণ হয়, উন্নতির বিঘ্ন ঘটে।

তা' তুমি যতই যা' বল, ঐ করুণ সুরটার মত মারাত্মক জিনিস কিন্তু আর একটা কোথাও দেখি নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-কর্ম্মে। ঐ সুরের আতিশয্যেই যত ভাব-প্রবণতা, যত উৎপেতে ভক্তির পথে ঝোঁক্। ভাব-ভক্তি কিছু খারাপ নয়; কিন্তু ঐ করুণ সুরের ভাঁওতায় পড়ে, ভাবুকতার ডানায় চড়ে, কত ভক্ত শেষকালে ডোবায় পড়ে গড়াগড়ি যান, তা' ভাব্‌তে গেলে আর কিছু না হোক্, লোকমাত্রেরই করুণার উদ্রেক হয়।

এই করুণ সুর আবার বহুরূপী। ধর্ম্মের খাঁটি দিক্‌টা দেখ্‌তে হ'লে, এই বহুরূপীর বিভিন্ন লীলাকে পাশা-পাশি রেখেই তাকে দেখ্‌তে হবে। যে জায়গায় যে জিনিসের যত বেশী আম্‌দানী হয়, সে জায়গায় আবার সে জিনিসের তত বেশী অপচয়ও ঘটে। আমাদের দেশ, ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্মেই এ দেশ "সকল দেশের সেরা।" কিন্তু দেশে এর যা অপচয়, তা বল্‌বার আগে একটা ভাব্‌বার কথা এই যে, ধর্ম্ম ত নিত্য পদার্থ, খাঁটি মাল, তাতে আবার অপচয়ের সম্ভাবনা হয় কেন? তবে কি নেওয়াটাই ভুল করে নেওয়া হয়?—তাই গোড়াতেই গলদ্ থেকে যায়?

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে নিয়ে বেশ একটু সর-গরম হয়েছে দেশ।—তা না হ'বে কেন? দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেশ গেল ভরে তাঁর নামে। কত মঠ হ'ল, মিশন হ'ল, পূজা, কত উৎসব। কেবল কি এই? স্বামীজী এলেন সব দেশ-বিদেশ জয় করে, সবাই নিলে ঠাকুরকে মাথা পেতে। বিদেশীরাও বল্লে, ভগবান্ রামকৃষ্ণের মতন আর একটী হ'তে নেই। কথাটা পৌঁছাল এসে দেশে। আর কি থাকা যায়? সাহেবরাও যে ভাল বল্‌ছে! তবে ঠাকুর অবশ্য ভালই হবেন। এস, আমরাও তবে সভা করে, ঠাকুরের জয় জয়কার দিয়ে সব ভক্ত হই। আর কষ্টও ত তেমন কিছু নেই। স্বামীজীর সব বই বেরিয়েছে, ঠাকুরের কথাও এখন ঘরে ঘরে। অবসর মত দু'চারটা আওড়ে মুখস্থ করে নিলেই মোটামুটি চলনসই হ'ল। তারপর মাঝে

মাঝে, চাই কি, হ'ল একটা উৎসব, কিছু বক্তৃতা, কীর্ত্তন ; আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদও কিছু পাওয়া গেল। আর এতে লাভও ত কম নয়। প্রশংসা, মান, একটু প্রতিষ্ঠা—এও পাওয়া যায়। কাঙ্গাল, গরীবের দেশে আর কত চাই বল ? তেজঃ, বীর্য্য, সাহস, আবার কি বলে, বিবেক, বৈরাগ্য—ও সব যদি শতকরা নিরানব্বুই জনেরই না থাক্‌লো, তবে কি শুধু আমাদেরই থাক্‌তে হবে ? ঐ একটু সেবা-ভক্তি ক'রে যা' পাচ্ছি, এই ত ঢের। আর লাগেও ভাল। তবে মাঝখানে স্বদেশীর আমলে রাজ-সরকার কেমন একটু ফ্যাসাদ্ বাধিয়েছিলেন। একটু আড়চোখে দেখ্‌তো। সেটাও ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। তবে আর কি ? বল যে যেখানে আছ,—জয় শ্রীগুরুজীকি জয়। একি ভক্তি, না স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা ? এ যে কেবল ঠাকুরকে নিয়েই হচ্ছে, এমন নয়। সর্ব্বত্রই এই পোষাকী ধর্ম্মের বাড়াবাড়ি চল্‌ছে। এতে অপচয় না হবে কেন ?

ঠাকুরের সমসাময়িক একটি ভক্ত কথা-প্রসঙ্গে একদিন তাঁর কথা বল্‌ছিলেন। কথাটা এই—কাশীপুরে ঠাকুরের দেহ যাবার কিছু পূর্ব্বে একদিন ভক্তেরা দেখ্‌লেন, ঠাকুর বিছানায় বসে কাঁদ্‌ছেন। কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্লেন, "দেখ, শ্রীকৃষ্ণ একদিন সত্য সত্যই কেঁদেছিলেন। কেঁদে বলেছিলেন, আমি গোপীদের ঋণ কি দিয়ে শোধ কর্‌ব ? যখন আমি দ্বারকায় থাকি, তখন আমাকে চিন্তা করা খুব সোজা। কারণ তখন যে আমি রাজা—ঐশ্বর্য্যময়। কিন্তু যখন আমি বৃন্দাবনে ছিলেম্, আমার কিছুই ছিল না, তখনও যে গোপীরা আমায় সর্ব্বস্ব দিয়ে ভাল-বেসেছে, তাদের ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ কর্‌ব ? তাই ভাব্‌ছি, যখন দক্ষিণেশ্বরে থাক্‌তুম্, সেজোবাবুর মত বড় লোক পেছনে সেবার জন্যে ব্যাকুল, কত লোক কত মত্‌লব নিয়ে আসত, যে'ত। কিন্তু দেহের এখন এই হীনাবস্থা। কত লোক চলে গেল, তবুও তোমরা আমায় ত্যাগ কর্‌লে না ? তোমাদের ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ কর্‌ব ?" ঠাকুর তবে কি চান ?

দেশে ধর্ম্ম আজকাল যে ভাবে চল্‌ছে, তাতে এর নামকরণ করা

একটু কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তবে সংক্ষেপে কখনো একে 'সখের ধর্ম্ম," কখনো বা "হুজুগে ধর্ম্ম" নাম দেওয়া যেতে পারে। 'সখের ধর্ম্ম' হল' প্রাচীনদের জন্যে, আর 'হুজুগে ধর্ম্ম' যুবকদের জন্যে। হুজুগের বয়সটা কেটে গেল, শেষে ঐ সখের একটু চাটনি নিয়ে থাকা আর কি। তখন যে তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকে, পরকালের কর্ম্মও ত চাই!! ঐ যে গায় "শমন এসে, ধরবে কেশে, ভাঙ্গবে রে তোর জারিজুরি"।—ও শুনে যে প্রাণ আঁৎকে উঠে। বাবা! আর কথাও ত মিথ্যা নয়; চুল-দাড়িও যে পেকে এল। কে জানে হঠাৎ কখন কি হয়। তারপর আবার যখন মনে পড়ে জীবনের সব অতীত কাহিনী, তখন ত শরীরের রক্ত একেবারে জমাট বেঁধে যায়। তা' অবস্থা যেমন সঙ্গীন, ব্যবস্থারও তেম্নি সুবন্দোবস্ত আছে—আর সস্তাও বেশ। ভগবানের সাক্ষাৎ সনদপ্রাপ্ত কুলগুরুগণ ঘুরে ফিরে দেশের সর্ব্বত্রই আছেন। তাঁদের দয়ার কথা কি আর বলব—পতিত, কাঙ্গাল দেখ্‌লে তাঁরা' একেবারেই রইতে নারেন। না ডাক্‌তেই এসে হাজির। যা' হোক, যথাবিধি দক্ষিণান্ত হওয়া গেল। গুরুদেবও শান্তি, স্বস্ত্যয়নাদি করে, ভব-সাগর পারের সব রকম ব্যবস্থা করে, আঁট-ঘাট বেঁধে দিয়ে গেলেন। ভেবে ভেবে প্রাণ বেরুচ্ছিল, এতদিনে যা' হোক ঠাঁই পাওয়া গেল। গুরু কর্ণধারই ত আছেন; আর ভয় কি? আর একি যে সে গুরু? শ্রী-পাট অমুক ধামের অমুক বংশাবতংস। কেন, তোমাদের মনে নাই? মন্ত্রদক্ষিণার দিন তোমাদের সকলকেই ত নিমন্ত্রণ দিয়েছিলুম!!!

খেই হারায়ে এম্নি করেই ধর্ম্মের সূতা এলোমেলো হয়ে পড়েছে। আবার মজা এই, ভুল যে হচ্ছে, তা' চ'খে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও হুঁশ্ নেই। ভুলকে ভুল বলে বোধ থাক্‌লে তবে সংশোধনের আশা থাকে। আর ভুলও হচ্ছে, অথচ বোধও নেই যে ভুল হচ্ছে, এ যে বড় কাহিল অবস্থা। তাই ত নূতন যুগ এ সব ভালবাসে না। নূতন যুগ বলে, "তোমাদেরও মামুলী ব্যবস্থা যতই ভাল হ'ক, তোমরা যখন সত্যকে ছেড়ে, মালের বদলে খোসা নিয়ে মারামারি করছ, তখন আমি

তোমাদের সঙ্গী হ'তে পারি না। না বুঝে যা তা একটা কিছু কর্ত্তে আমি একেবারেই নারাজ। তোমরা যে "বিশ্বাস কর" "বিশ্বাস কর" বলে চেঁচাও, ওর মানে আর কিছুই নয়, কেবল না বুঝে সুঝে কতকগুলি দেশাচারের বোঝা ঘাড়পেতে, মেনে নেওয়া। ওর নাম দুর্ব্বলতা, ফলে অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে অজ্ঞাতবাস। বেদ-বেদান্ত, পুরাণাদি সবই আমি মানি, কিন্তু তোমাদের দিক্ দিয়ে নয়। শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলে মানি-না, শাস্ত্রকে সত্যের বার্ত্তাবহ বলে গ্রহণ করে নি'। সত্যের সঙ্গে অসত্যময় জীবনের আপোষ কখনো হয় না। হ'তে পারে না। এক একটা দেশের এক একটা করে জীবন-তন্ত্রী আছে। নানা দেশ ঘুরে এসে স্বামীজি ধর্ম্মকেই এ দেশের জীবন-তন্ত্রী বা জাতীয় মেরুদণ্ড বলে নির্দ্দেশ করেছেন। এটা বুঝাও যায় বেশ। জাতীয়তা; সামাজিকতা প্রভৃতি সবটাই দেখ্‌ছি ওই ধর্ম্মের উপরেই এ দেশে দাঁড়াতে চাচ্ছে। সেই ধর্ম্মই যদি ঢং সেজে স্বরূপটাকে একেবারে ঢেকে কিছুতেই ধরা না দিলে, তবে তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত চুলোয় গেল, ইহকালের কল্যাণের পথগুলিও যে বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং হে অতীত! তুমি "গতস্য সূচনা নাস্তি" হয়ে তোমার আচারের পোট্‌লা-পুঁট্‌লী নিয়ে অতীতেই বিলীন হয়ে যাও, আমাকে শুধু সত্যটী নিয়ে নবীন কিরণে, নবীন আলোকে প্রকাশ হ'বার পথ ছেড়ে দাও। তোমার কুয়াসার ঝাপ্‌সা আমার, মোটেই ভাল লাগে না।" 'সখের ধর্ম্মের গুরু-ভক্তি কিছু কম নয়। লেগেই আছে মুখে—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়,
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

কিন্তু ভায়া, তাই বলে যদি বছরে দু'বার করে গুরুদেব এসে বাড়ীতে আড্ডা পাতেন, আর উপযুক্ত প্রণামী দিয়ে মন্ত্র-দক্ষিণার সুদ টান্‌তে হয়, তবে আর কত বরদাস্ত হয়? বিশেষ আবার এই দুর্দ্দিনে?"

(ক্রমশঃ)

পথের কথা।

(শ্রীমতি সত্যবালা দেবী)

বৈশাখের খরজ্বালায় পৃথিবী যেমন দহিয়া উঠিতেছে তেমনি এই যে দাহ এই যে তাপ, এই যে বাহিরে ও অন্তরে জ্বালা-যন্ত্রণা রুদ্ধ ত মানবের আজ, এই সোণার ভারতব্যাপিয়া,—এ কেন? গ্রন্থে ত পাঠকরি আমার দেশ স্বর্গ ছিল। এই পদতলশায়ী মৃত্তিকা নাকি দেব ঋষির চরণ স্পর্শপূত! এই আলো, এই আকাশ বাতাস ফুল-ফল হিল্লোলময়ী তটিনী বারি আমারি মত সমান আপনার করিয়া স্বয়ং ভগবানের নর কলেবর বিগ্রহ স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। সত্য, একি সত্য? বিরাট বিস্ময়ে বিপর্য্যস্ত প্রায় তাই স্তম্ভিত রোমাঞ্চিত নির্ব্বাক সপ্রশ্ন ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিতেছি—সত্য, একি সত্য? অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাক্ষী পুরান, সাক্ষী ইতিহাস, সাক্ষী আমার জাতির অন্তর্য্যামী। অস্বীকার করিব, সে কথা লুকাইয়া লজ্জা লুকাইব, সে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। অধোমুখে বলিতেই হইবে আজ এখানে যেমনই অবস্থা দেখ আমাদের, যেমনই হেয়, যেমনই অপবিত্র, যেমনই দলিত ভূমিলীন দেখ—আমরা সেই। সেই বিরাটের অঙ্গ, এই দেহ প্রাণমন চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার সেই অনন্ত বিদ্যুৎশক্তি আধারের আধেয়—সেই আত্মার আবরক আবর্জ্জনা।

সেই আর এই! ওহোঃ! এ যদি নিষ্ঠুর সত্য না হইয়া স্বপ্ন হইত! দু ফোঁটা চোখের জল অপাঙ্গ কোনে মুছিয়া লইলেই দেখিতাম স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, আর সে হৃদয় শোণিত শোষী কালান্তক ছায়ার পিশাচ কিলিবিলি দৃষ্টির সম্মুখে নৃত্য করিতেছে না—কি পরিতৃপ্তি! কি নিশ্চিন্তি!

সেই যাহা ছিল। এই যাহা হইয়াছে! নরক বর্ণনা কেহই কি নিখুঁত করিয়া রচিতে পারে? সাধই বা যায় কাহার?—এই আজিকার অবস্থার হুবহু চিত্র, এই বুকফাটা কথা, মুখফুটিয়া বলা এত' সমালোচনা

নহে বর্ণনা নহে সাহিত্যসৃষ্টি নহে। এযে অন্তর্গূঢ় সুপ্ত পাতাল শায়িতের উচ্ছ্বসিত শতধা প্রপাত। এযে অনিরুদ্ধ অন্তরাবেগের সর্ব্ববাধা উপচিয়া বহির্গমন। এযে তৃতীয়ের অদম্য প্রেরণা যদি কেহ থাকে যাহার অন্তর বিষবাষ্পে ধূমায়িত উত্তাপ সংগ্রহ করিতেছে অগ্নিকণায় ঠিকরিয়া পড়িবার জন্য তাহাকে আমন্ত্রিতে এই প্রাণের জলন্ত শিক্ষায় আপন প্রদীপ জ্বালিয়া লইবার জন্য। এখানে একটা দেউটী জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ওগো মঙ্গলকামী তোমার পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া লহ সাজাইয়া লহ। একটী কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিয়াছে সকল অস্পষ্টতাকে ছাপাইয়া ক্ষীণতম-স্বরে, সে কি বাণী ঘোষণা করে শুনিয়া লহ।

ওগো অৰ্দ্ধজাগা অৰ্দ্ধঘুমঘোরে তন্দ্রাকুল, তবে কি বুঝিতে কিছুই পার নাই তুমি? তবে কি শুনিতে পাও নাই তুমি,—আদেশ? এ ধৰ্ম্মভূমি এক মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত নহে—এ অমর জাতির সন্তান আপন মহিমা হারাইয়া চিরদিন নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে না। এই যে পতিত জীবনের নীথর অসাড়তার মধ্যেও সর্ব্বনিম্নস্তর ভেদ করিতে করিতে ধ্বনিয়া উঠিতেছে,—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

—শুনিতে কি পাও নাই তাহা? চারিদিকে ঝড়ের পূর্ব্বকার এই যে থমথমে স্তম্ভিত ভাব, দিকের আক্রান্ত ছাপিয়া এই যে পুঞ্জীভূত রুদ্ধ হাহাকার ইহারই বক্ষ চিরিয়া জলদ নির্ঘোষে ভাগবত আদেশ ঘোষিত হইতেছে—জাগ। উত্তম পথ অবলম্বন কর।

কি সে পথ? যে পথ বহিয়া যুগে যুগে ভগবান আসিয়াছেন—সেই পথ। যে পথে চলিয়া দেবতায় মানবে আমার পিতৃযুগে লীলা করিয়া গিয়াছে সেই পথ। মোহের ঘূর্ণিবায়ুর ধূলাস্তম্ভের নৃত্য সম্মুখে মগজ ঘুরিয়া গিয়া যে পথ দেখিতে পাইতেছ না, সেই পথ।

জলাশয় তীরে দাঁড়াইয়া মরিচীকাক্রান্ত যেমন শূন্য প্রেক্ষণে দূর দিগ্বলয় নিরীক্ষণ করে তেমনি করিয়াই যে পথে দাঁড়াইয়া পথের সন্ধানে পাগলাম করিতেছ সেই পথ।

যাঁহারা দুঃখটাকেই চেন, যাহারা বুদ্ধি দিয়া জগতের সকল তত্ত্ব

বিচারের দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাক, সেই তোমরা, বলত কোনজনে আজ আপনাকেই জানে? বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা সকল ধনে ধনী হইয়াও ঐ আপনার ক্রন্দিতা আঁখিকে তৃপ্ত করিতে পারে? মিলনাকাঙ্ক্ষায় দুরুদুরু বিকম্পিত বক্ষ মহাপ্রাণ আপন আমিকে প্রতিবেশীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে? বিকর্ষণ ধর্ম্মে বিশ্লিষ্ট খণ্ডিত হইয়া কেন পরস্পর আকর্ষণেরই অনিবার চেষ্টায় আপনাদের চারিদিকে উর্ণাতন্তুর মত বুদ্ধির জাল রচিয়া সকল সৌহার্দ্দের ফাঁকটুকু বন্ধ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যেন প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিতেছে! একতার বিশাল বল হৃদয়ঙ্গম করাইতে বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলিতে পারে কিন্তু একতা স্থাপনের সত্যকার এতটুকু চেষ্টা পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা চলে না। বলত তোমরা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে কান্ত কবির পদাবলী পর্য্যন্ত নিঃশেষে পান করিয়াও হৃদয়ের প্রেমানুভূতি আজ পর্য্যন্ত কেন কেহ কর্ম্মরূপে জগতে প্রকাশ করিতে পারিতেছ না? প্রীতি সহানুভূতি ভ্রাতৃত্বের সাহিত্যিক বিশ্লেষণে জাতির চিন্তাভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বাস্তব জীবনে কোথায় প্রীতি? কে জন্মিল কে দশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল যাহার হৃদয়ের সম্পদ অফুরন্ত? যে ভালবাসিতে গিয়া দেউলিয়া হয় না। যাহার মাধুর্য্যে চাপ লাগিলে মধুর মত বিলাইয়া উঠে না। সহানুভূতি? হা অনুভববৃত্তি বড় তীক্ষ্ণ তোমাদের স্বীকার করি কিন্তু সেকি হৃদয়ের—না বুদ্ধির? বুদ্ধিদিয়া আমরা জাতির ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অতীত সবই অনুভব করিতেছি, না যদি করিতাম তবে এত আন্দোলন আকিঞ্চনের ভাষা যোগাইত কোথা হইতে? হৃদয়দিয়া অনুভূতি যেখানে আছে সেখানে একজন সম্পন্ন থাকিতে অপরে ত অনাহারে মরে না। একজনের আত্মসম্মান থাকিলে আর একজন অপমানিত হয় না। সহানুভূতি সকলেই চায় সকলেই বুঝে অথচ জাতিটার একাংশ দারিদ্র্যের অতি ভীষণ প্রখরতায় অবসন্ন, অপরাংশ বিলাসের উৎকট আতিশয্যে জর্জ্জরিত পচিয়া উঠিতেছে, যেমন রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রজাতন্ত্র উদ্ভবের পূর্ব্বে ফরাসী দেশে হইয়াছিল। বলত এ কেন? ভ্রাতৃত্ব শব্দের ত্রিসীমা ছাড়াইয়া ত মিলন ও ঐক্যের

অর্থ-অপসারিত পুষ্প পল্লবহীন তীক্ষ্ণ কণ্টকের মত মূর্ত্তিপ্রকাশ করিয়াছে প্রতিযোগিতার স্পর্দ্ধায়।

যদিও জনার্দ্দন স্বয়ং ভাবগ্রাহী—তবুও, বোধ হয় বিশ্বের দুর্নিমিত্ত তালিকাকে সুরঞ্জিত করিতেই একটা অদ্ভুত ব্যাধি আছে, ভাবুকতাকে ঘৃণা। আবার একঘেয়ে ভাবুকতার গান গাহিয়া গেলেই আসর জমিবে না সে দিকটাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে দিকটা ব্যবহারের। কিন্তু প্রকৃত দরদীর কাছে এ দিকটা দাঁড়ায় কি? এটা সেই দিক যে দিকে কুস্তির কসরতের মত চালের কসরতে মানুষ আপনার এমন অবস্থা বজায় রাখিতে পারে যে অবস্থায় একটা কৃচ্ছ্রতা আর একটা কৃচ্ছ্রতা স্বর্গের উদ্যোগে ঢাকিয়া যায়। দেনা করিয়া দেনা মিটানর মত বড় তাড়ার সম্ভাবনা জাগাইয়া ছোট তাড়া মিটান হয়। দম্ভ অভিমানের বিষব্রণের দপদপানিতে জ্বালা যন্ত্রণার সে এতটুকু ফোস্কার পীড়া লুকাইয়া পড়ে। হা অদৃষ্ট! লোক কাঁদিছে না হয় উল্লেখ করিলাম, ইহারও জয়গান করিতে হইবে।

তোমরা বিচার করিতে জান আমি অনুভব করিতে জানি। তোমরা বাসায় বসিয়া বুদ্ধি খাটাইতে জান আমি বুদ্ধির মাথা খাইয়া অন্তরে মিশাইয়া ফেলিতে জানি। তোমাদের জানা আমার জানা তাই ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিতে হয়। বলিলে দোষ লইও না তোমাদের ব্যবহারের দিক—সেটা আমার জ্ঞানে মনকে চোখ ঠারার দিক। আমার পথে আমি আপন মনে অনুভবের গান গাহিয়া চলি। সম্মুখে মন মুক্তকেশী ঘোরা অমানিশি, মাথার উপরি রুদ্র বিষাণ ফুৎকারি গর্জ্জিত ঝটিকা। পার্শ্বে নিঃশব্দ বিজনতা—ইহাদের লইয়া আমি চলি। তোমাদের পথে তোমরা—কত লোক কত সমারোহ—কত সজ্জা। আমার মুখে অনুভবের গান, তোমাদের মুখে অস্ফুট কথা—'চেপে যাও চেপে যাও।' এই ত ব্যবহারের পথ। আমার ক্ষমতার অতীত, আমার অব্যবহার্য্য।

পথ আলাদা—মানুষ এক। তোমরাও তা—আমিও তা। তাই এখনও পরস্পর তাকাতাকি—বিপরীত মুখী গতিতে এখনও ডাকাডাকি!

হয়ত বলিতে গিয়া বৃথা বাকজাল সৃষ্টি করিতেছি আর—যতই বুঝাইতে চাই ততই তাহা দুর্ব্বোধ্য ততই শ্রুতিকটু হইয়া উঠিতেছে। তোমরা উন্মাদের অপভাষার প্রলাপটুকু ক্ষমা করিও। শুনিয়ো, তবু ওগো! শুনিয়ো। বলিবার সত্যই কিছু আছে। ঠিকমত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

কি এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে সেথাকার সোণার সূর্য্যালোকের রঙ মগজে চড়াইয়া ফেলিয়াছি তোমাদের এখানকার কিছু আর বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সব ঝাপ্সা দেখাইতেছে। পথ অপথ পাচীর পরিখা একাকার হইয়া গিয়াছে। আমায় বুঝিয়া লও তার পর তোমাদের সকল ... তোমাদের মত করিয়া আমায় বোঝাও। তোমাদের প্রকৃতিতে আমায় মিলাইয়া লও। তৃষ্ণার্ত্তের প্রাণের যেমন দাহ-জ্বালা, আমারও তেমনি—সে যেমন সন্ধান করে জলের, আমিও তোমাদের কাছে সন্ধান করিতেছি অমনি একবিন্দু কিসের—কি তা জানি না। তোমরা আমায় বুঝিয়া লইয়া কি তাহা বুঝাইয়া দাও। আমার এই আমিকে মজাইয়া জমিয়া থাকা নেশা ঘুচাইয়া দাও। এই যে এই ক্ষুদ্র জীবন এক রহস্যময় ভঙ্গীতে গর্ব্বিত দাঁড়াইয়া তোমাদের পথ হইতে দূরে দূরে সরিয়া গিয়া তোমাদের জীবন শৃঙ্খলার বাহিরে আর একটা অভিনব জীবন গঠনের নির্দ্দেশ দিতে চায়, কল্পনা দানবের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাও।

নতুবা হয়ত একদিন পথ-হারানর পথই তোমাদের পথ বোধ করিয়া দাঁড়াইবে। যাহাকে সে আপন ভগবানের আদেশ জ্ঞান করিতেছে তাহারই উচ্চধ্বনিতে তোমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত তোমাদের ভগবানের গাথা স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

সমালোচনা।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা—শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

(প্রবাসী—মাঘ, ১৩২৭)—

'দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা নিবিড় করে ধরিব হে।'
'কে ডাকেরে পিছন হতে, কে করে রে মানা ?
ভয়ের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা।'

"(রবীন্দ্রনাথের মত) এমনই করিয়া আনন্দের বার্ত্তা জগতে বড় বেশী লোক প্রচার করেন নাই। এমনই করিয়া দুঃখ ভয় মৃত্যু অবসাদ তুচ্ছ করতঃ আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে শিক্ষা দিতে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে অধঃপতিত ভারতবর্ষে আর কেহ আবির্ভূত হন নাই।" লেখকের কথার প্রমাণ স্বরূপে কবির কথার পার্শ্বে আমরা আচার্য্যের বাণী উপস্থাপিত করিতেছি—

'আগুয়ান, সিন্ধুরোল গান, অশ্রুজল পান, প্রাণপণ যাক কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এভব, ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা!
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'

"বিবেকানন্দের সহিত আধ্যাত্মিক জগতে রবীন্দ্রনাথের যে শুধু এই খানেই মিল তাহা নহে। মানবের হিতসাধন দ্বারা ভগবল্লাভের যে পথ, বিবেকানন্দ তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বারংবার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথও এই প্রেমের পথ দিয়াই, এই কর্ম্মযোগে বিশ্বমানবের সহিত এক হইয়াই আনন্দময়ের দর্শনলাভ সম্ভব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার তুলনায় জপ তপ ধ্যান ধারণা দ্বারা মুক্তিলাভ-চেষ্টাও বাঞ্ছনীয় নহে।

মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি ? মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে' বাঁধা সবার কাছে।

রাখ রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি, ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।
তিনি গেছেন যথায় মাটি ভেঙে করচে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটচে সেথায় পথ, খাটচে বারমাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার পরে।"

লেখকের কথা অবশ্য সার্থক হবে যদি ইহার পার্শ্বে আমরা স্বামিজীর মর্ম্মের কথা বসাইয়া দেই।

'চাহ বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল

* * *

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

তারপর বৈরাগ্য ত্যাগ ধর্ম্মাদির একটা প্রবল কবির বাণী লেখক সাক্ষী দেখাইতেছেন "এই জগতের মধ্যে" তিনি বলিতেছেন—'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' এখানে বৈরাগ্য অর্থে কবি নিশ্চয় ভারতের জড়তা এবং দুর্ব্বলের স্বার্থপরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বামীরা যে বৈরাগ্য চান কবিরও তাহাই আকাঙ্ক্ষা ছিল।

'ধানের ক্ষেতে আছি জড়ায়ে তায়।
তবু জ্ঞান মন তোমারে চায়।
'বিষয় বোঝা টানে আমায় নীচে।'
'কত মায়ার পাশের সুরে ডাকবে আমায় মিছে।

কবির আকাঙ্ক্ষা 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ' যদি পূরণ হইয়া থাকে, যদি তিনি সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় অবস্থায় নিত্য মুক্তিকে অনুভব করিয়া পুনরায় সেই নিত্যকেই লীলার মধ্যে—সকল বন্ধনের মাঝে—এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের সত্তারূপে—

'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার সকল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।'

যদি কেবলমাত্র মানসপটে না দেখিয়া—

'সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥'

—রূপ অপরোক্ষানুভূতি যথার্থরূপে করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি "রূপ রস গন্ধময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে বসিয়া" তৃতীয় নেত্রের দ্বারা ভূমা, বিভুকেই সর্ব্বভূতে দেখিয়াছেন। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় 'রেশম পশম, আসন বসন, স্বর্ণ রৌপ্য' ছাড়া আর কিছুই দেখাইতে পারে না—তাহারা 'পরম সম্পৎকে অন্তরাল' করিয়া দিয়া 'সকল সত্যের সত্য, অন্তরে বাহিরে, জ্ঞানে ধর্ম্মে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে দেয় না।

কিন্তু সকল সসীমের মধ্যে অসীমের পরশকে দেখিতে হইলেই যে কোন ব্যক্তি কার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে কিম্বা নারীরূপ এক বিশেষ সসীমতার মধ্য দিয়া ছাড়া প্রেমস্বরূপ ভগবানের সর্ব্বভূতে পরিচয় পাওয়ার অন্য উপায় নাই—আর তাহা না হইলে 'প্রকৃতি' নিশ্চয়ই 'প্রতিশোধ' লইবেন একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মানব যে কোনও সসীম প্রবাহিনীকে অবলম্বন করিয়া অসীম সমুদ্রে উপস্থিত হইতে পারে—কারণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সকল সসীমতার অন্তরালে বর্ত্তমান। কই কোনও বালিকা ত সন্ন্যাসীর স্নেহ মাধুর্য্যের গুরু হইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিতে শিক্ষা দেয় নাই?

'দর্পণে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তবরূপ সর্ব্ব ঘটে।

কেন তাঁহার কর্ম্মে এবং শব্দের বর্ণে বর্ণে প্রেমের উৎস বহিয়া যাইতেছে ?

'শোন বলি মরমের কথা, জানছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরি করে পারাবার—
মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়ম, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান, ত্যাগ, ভোগ
বুদ্ধির বিভ্রম 'প্রেম' 'প্রেম,'—এইমাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ,
পশু পক্ষী, কীট অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।'

কই 'প্রকৃতি' ত তাঁহাকে 'পরিবোধ' দেন নাই। কবি বলিতেছেন 'সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধ ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুরই বাহিরে।' অনন্ত সব কিছুরই বাহিরে নয় বলিয়াই ত সন্ন্যাসীর ঈপ্সিত প্রকৃতির পরপারে বিশুদ্ধ নিত্য অবস্থা 'মিথ্যা শূন্যতা' নয়—সত্য, কারণ সেখানেও যে অনন্ত। কবি যেমন বুদ্ধি ও কল্পনাবৃত্তি সহায়ে সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করিয়া 'সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা' দূর করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ বিশুদ্ধ অসীমকেও যে সকল সসীমতা ত্যাগ করিয়া সম্ভোগ করা যায়, তাঁহার এ অবস্থা উপলব্ধির কোনও নিদর্শন আমরা পাই না। যাহা আমরা বিবেকানন্দে দেখিতে পাই,—

"একরূপ অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশ হীন, সর্ব্ব হীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়॥"
* * * 'শূন্যে শূন্য মিলাইল
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার'॥

রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য ভীষণ হইলেও মঙ্গলকর, তাঁহার তীব্র তালের আঘাতে মানুষের বক্ষ পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেলেও যে, তাহাতে সমস্ত সন্দেহ মন হইতে পলায়ন করে, লেখক কবির মর্ম্মের ছন্দ বিধৃতির দ্বারা দেখাইয়াছেন—

'নাচো যখন ভীষণ সাজে, তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে সন্দেহ বিহ্বল।

সেই প্রচণ্ড মনোহরে প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার দিক্‌ সে রসাতল।'

আচার্য্যও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

'তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালি, তুই প্রলয় রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তাঁরি কাছে আসে।'

(ইংরাজীর অনুবাদ)

দুঃখই মানুষের অন্তরের জিনিষটা জাগাইয়া তুলে। তাই কবি বলিতেছেন,

'এই করেছ ভালো, নিঠুর এই করেছ ভালো,
এমনি করে' হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার—
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে' আমায় যত কালো।'

যে সত্য কবির আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা আচার্য্য সেই সত্যই নিজ জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া ভাষায় তাহার প্রকাশ দিতেছেন--

'বিস্তারে বিশাল ফণা দলিতা ফণিণী
প্রজ্বলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে,
শূন্য ব্যোম পথে যথা উঠে প্রতিধ্বনি
মর্ম্মাহত কেশরীর কুপিত গর্জ্জনে।
শ্রাবণের ধারা ঢালে যথা মহাঘন,
দামিনী দলকে তার হৃদি বিদারিয়া,
আত্মার গভীর দেশে করিলে স্পন্দন,
মহদাত্মা উচ্চ তত্ত্ব দেয় প্রকাশিয়া।' (ইংরাজীর অনুবাদ)

সংবাদ।

১। বেলুড় মঠে গত শ্রীস্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রায় ২৫০০০ হাজার ভক্তের সমাগম হয় এবং প্রায় ৭০০০ হাজার দরিদ্র নারায়ণ এবং ভদ্র নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসাদ গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজির সভাপতিত্বে একটি ধর্ম্মসভা আহূত হয়। তাহাতে ব্রহ্মচারী অখণ্ডচৈতন্য, ব্রহ্মচারী অনন্তচৈতন্য এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ আচার্য্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী পাঠ করেন। স্বদেশ-সেবক মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক এই দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন এবং উৎসবে যোগ দান করেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহাম্মদ আলি এবং অপরাপর দেশনায়কেরা আগমন করেন। জন সাধারণের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধী হিন্দীতে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন "আচার্য্যের বাক্যাবলী তাঁহার জীবনে নূতন আলোক আনয়ন করিয়া নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তোমরাও এই পুণ্য দিবসে তাঁহার মন্দির হইতে নূতন ভাব ও আলোক লাভ করিয়া স্বদেশ সেবায় নিরত হও। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে অনেক অলীক কথা বহু দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার প্রতিবাদও করিয়াছি। হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু বোধ হয় অনেকে অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।

২। রামকৃষ্ণ-আশ্রম, বাসাভাসুড়ি, ব্যাঙ্গালোর সহরে স্বামীজির জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এন্, কেশব আএনগার এবং রাজা শম্ভুভূষণ কপুর, শ্রীনিবাস রাও আচার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পাঠ, আরাত্রিক, হরিকথা যথানিয়মে সম্পাদিত হয়।

৩। বিগত ২৪শে মাঘ রবিবার ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণমঠে পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজির উনষষ্ঠিতম জন্মমহোৎসব উপলক্ষে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা ও স্বামীজির জীবন ও কার্য্যালোচনা এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তদুপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ ও সেবকগণ সহ অন্যান

চারি সহস্র লোক পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছিলেন। সমগ্র মঠপ্রাঙ্গণে ঐ দিবস প্রায় দশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্নে সভায় ঢাকা ল' কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন এম, এ, ডি, এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকা মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী একটী কবিতা পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করিলে পর তত্রত্য অপর একজন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ সিকদার এম, এ, এবং অধ্যাপক সুরিন্দ্রকুমার দাস এম, এ,—"বর্ত্তমানে ভারতীয় যুবকদের কর্ত্তব্য ও তৎপ্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান", "ভারতীয় জাতীয় জীবনে ধর্ম্মভিত্তি ও বেদান্তের কার্য্যকারিতা", এবং "অদ্বৈতবাদ ও ব্যবহারিক প্রমাণ" বিষয়ে বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনটী সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে দুইএকজন স্বামীজির জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিবার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমানযুগে স্বামীজি প্রচারিত উপনিষদের 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'ত্যাগ ও সেবা'রূপ আদর্শ অবলম্বনই যে জাতীয় কল্যাণের একমাত্র উপায় তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে সমাজ ও শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি সমস্যা সকলের সমাধান কল্পে জগতের অন্যান্য জাতি সকলের নিকট হইতে শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি কিভাবে গ্রহণ করিলে আমরা যথার্থ জাতীয় কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারি তদ্বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হইলে কিছুক্ষণ নানাবিধ ধ্রুপদ সঙ্গীত বাদ্যাদি হইয়া ঐ দিবসের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।

৪। কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্তৃক বিগত ২৪শে মাঘ, ইংরাজি ৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ৫৯তম জন্মোৎসব সভা আহূত হয়। এই সভায় সহস্রাধিক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাধুভক্ত ও ছাত্রবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন—সোসাইটীর অন্যতম সদস্য কলিকাতার সরিফ রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে অন্যতম সদস্য অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে কলিকাতা

হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যর জন, জি, উডরফ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি বরণের পর 'উদ্বোধন' সম্পাদক স্বামী বাসুদেবানন্দ উপনিষদের বাণী পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। এই সময় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সহঃ সম্পাদক পণ্ডিত কালিপদ তর্কাচার্য্য প্রথমে একটা সুললিত সংস্কৃত বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করিয়া দুটী সংস্কৃত কবিতা পাঠ দ্বারা শ্রীবিবেকানন্দ বন্দনা— ও সভাপতির সম্বর্দ্ধনা করেন। তৎপরে সোসাইটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বিবেকানন্দ সোসাইটীর ১৯২০ খৃঃ কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। এই বিবরণ শীঘ্রই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তদনন্তর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি, এ কর্ত্তৃক দুটী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতায় শ্রীবিবেকানন্দের কীর্ত্তিমুখরিত স্তোত্র পঠিত হয়।

এই সময় সঙ্গীতাধ্যাপক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক 'কোটীকণ্ঠে গাহিছে তোমার মহিমা অপার' শীর্ষক ব্রহ্ম-বন্দনা গীত হইলে বক্তৃতাবলী আরম্ভ হয়। একে একে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দাশরথী সান্যাল, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ডাঃ এচ, বি, মোরেনো ও কাপ্তেন জে, পিটাভেল মহাশয়গণ কর্ত্তৃক ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষায় নানাভাব হইতে স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ত্ব কীর্ত্তিত হয়। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীবিবেকানন্দের উচ্চ আদর্শ জীবন ও কার্য্যাবলীর কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে স্বামীজির অমূল্য গ্রন্থরাজি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে বলেন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থানুসরণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিশেষে 'বেঙ্গলী' পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী সুললিত ইংরাজি বক্তৃতা করিয়া শ্রীবিবেকানন্দের মহনীয় জীবনের বর্ত্তমান উপযোগিতা বুঝাইয়া সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার উন্নত চরিত্র, ভারতপ্রেম ও ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থার কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ দিলে ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে।

দেখা যাইতেছে দেশে আন্দোলনের পর আন্দোলনের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, সমাজকে উন্নতির দিকে কিছু কিছু আগাইয়াও দিতেছে, কিন্তু স্থায়ী ভাবে ঐ সকল আন্দোলনের ভাব সমাজ চিত্তে দৃঢ়রূপে ধারণা আঁকিয়া দিতে পারিতেছে না। কোন্ অন্তরাল হইতে এক অলক্ষিত শক্তির তীব্র কম্পনধারা পুনঃ পুনঃ আসিয়া জড়প্রায় ভারত-ভারতীর সুপ্তহৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত দিয়া জাগরণের নব উষ্মায় বহিয়া যাইতেছে—যেন নিজ শক্তি-ক্রীড়ার উপযুক্ত আধার না পাইয়া ব্যর্থতার করুণ নিশ্বাসে শূন্যে ফিরিয়া উচ্চ কণ্ঠে ব্যাকুল আহ্বান করিতেছে—উত্তিষ্ঠত। জাগ্রত! অভীঃ।

*　　*　　*　　*

ভারতের সকল তপস্যা, সকল আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্রীভূত হইয়া এক মহান বিরাট বিদ্যুদাধার সৃষ্ট হইয়াছে। উপযুক্ত বহনকারী আধার ব্যতিরেকে ঐশী লীলা-ক্রীড়া ভারত-রঙ্গমধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ত্যাগের অগ্নিশিখায় দগ্ধ কলুষহীন দুই চারিটী হৃদয় সেই বিরাট আধ্যাত্মিক বিদ্যুদাধার হইতে কিঞ্চিৎ শক্তি সংগ্রহ করিয়া বিপুল উৎসাহে এক জ্বালাময়ী ভাবধারা অসংখ্য নর নারীর উপর ঢালিয়া দিতেছেন—তাই বিরাট জাতি তমোনিদ্রা পরিহার করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে, কিন্তু এই বিরাট কুম্ভকর্ণ একবার পাশ ফিরিয়া আবার যেমন সুখে নিদ্রা যাইতেছিল তেমনি সুখেই নিদ্রিত হইতেছে। ইহার কারণ কি?

কারণ—শক্তি-ক্রীড়ার উপযুক্ত আধারের অভাব। শিশু মানবের কোমল হৃদয়কে সত্যের আদর্শে ব্রহ্মচর্য্য অবিলাসীতার অগ্নিস্পর্শে গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী মাতার অভাবে ভারতীয় উদ্বোধনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। যে বিলাসীতার কোমল ক্রোড়ে লালিত, সত্যকে প্রাণপণ করিয়া ধরিয়া থাকিতে আশৈশব আদি শিক্ষয়িত্রী মাতার নিকট হইতে উৎসাহিত হয় নাই, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা বীর্য্যলাভ করে নাই, সে কি করিয়া দেশ নায়কদের হঠাৎ উত্তেজনায় নিজেকে পরার্থে সর্ব্বত্যাগী করিবে।

* * *

এই আকস্মিক উত্তেজনার ফলে হঠকারিতা বহু হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া তাহাদের ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, আর না হয় উত্তেজনার প্রতিক্রীয়া তাহাকে বিপরীত পথগামী করে, আর না হয় দেশ নায়কদের বক্তৃতা শ্রবণান্তর যথাবৎ পূর্ব্বজীবনের পুনরাবৃত্তি করিয়া বিলাস সুখের অনুসন্ধানে ধাবিত হয়।

* * *

মানবের শৈশবে জননী শিক্ষয়িত্রী, কৈশোরে পিতা শিক্ষক, যৌবনে মানব নিজের চক্ষে জগৎ দেখে ও শিক্ষা করে নিজেই। কিন্তু জননী শিশুহৃদয়ে যে চরিত্রাদর্শ দান করেন তাহাই মানবের ভবিষ্যৎ ভাব-প্রাসাদের ভিত্তি—তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মানব আগামী জীবনের গঠন-ক্রিয়া আরম্ভ করে। বহু অতীতের সংস্কার এবং বর্ত্তমানে জননীর আদর্শকে পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়, গ্রন্থ, বক্তৃতা, উপদেশ সাহায্যকারী মাত্র। মাতা পুরাণের মদালসার ন্যায় 'ত্বমসি নিরঞ্জন' বলিয়া দোলায় দোল দিতে দিতে ব্রহ্মজ্ঞ বা রাজর্ষি অলর্কের ন্যায় সন্তান সৃষ্টি করিতে পারেন, কিম্বা ইদানীংএর দ্বিতীয়ভাগের ভুবনের ন্যায় হতভাগার সৃষ্টি করিয়া ভূভার বৃদ্ধি করিতে পারেন—উভয়ই তাঁহার হস্তে।

* * *

জগদ্ধাত্রীদের এসকল বিষয় এক্ষণে প্রণিধান করার বিশেষ প্রয়োজন

হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত। বিলাসের জড়-কলুষ তপস্যার নির্ম্মলায় অনাবিল করিয়া বজ্র-কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং কুসুম-পেলব প্রীতির সমবায়ে নব যুগের ভারত ভারতীর সৃষ্টি করুন—অন্তরালে দেবতারা, পূর্ব্বপুরুষেরা আনন্দমুক্ত হউন,—জগৎ ধন্য, কৃতার্থ হউক।

(২)

প্রকৃতির গতি-স্পন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে ক্রমবিকাশের আলোক আবার সে আলোক নিভিয়া যাইতেছে ক্রমসঙ্কোচের অন্ধকারে। ক্রম-বিকাশের ফলে জীব জগতের অভিব্যক্তি আর ইতরের ফল মহাপ্রলয়। অনাদিকাল হইতে এই সঙ্কোচ বিকাশের অনন্ত গতি-প্রবাহ চলিয়াছে অপ্রতিহতভাবে। এ কাল-চাঞ্চল্য রুদ্ধ করে, সাধ্য আছে কার।

* * *

সেইরূপ প্রবাহাকারে জাতীয় উত্থান পতনও অবশ্যম্ভাবী। এক নব ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক প্রতাপশালী জাতির অভ্যুদয় ঘটে, ধীরে আবার কোন যাদুবলে সেই ভাবধারা যাহাতে তাহার প্রাণ, সে ভুলিতে থাকে আর দেখিতে দেখিতে অধঃপতনের অন্ধকার আসিয়া সে জাতিকে ঢাকিয়া দেয়। যে জাতি তাহার সেই প্রাণ-শক্তিকে বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে তুলিতে সমর্থ আর না হয়—তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

* * *

বৈদিক কর্ম্মমার্গ হইতে প্রবুদ্ধ জ্ঞানমার্গে সমাপ্ত, আর্য্যভূমে যে শিক্ষা দীক্ষার পরিণতি ঘটে—যে উপলব্ধি সহায়ে ঋষিগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মানব জাতিকে অমর করিবার জন্য সঞ্জীবনীমন্ত্রে বিশ্বকে ধ্বনিত করিয়াছিলেন—সে শিক্ষা দীক্ষা, সে অনুভূতির ঝঙ্কার ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইয়া আসিল সেথায় প্রাণহীন বাক্যের অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

* * *

বাক্-সর্ব্বস্ব, কর্ম্মবিমুখ, উপলব্ধিহীন জাতি আত্মগোপন করিবার চেষ্টায় দুইটী পথ অবলম্বন করে—(১) পূর্ব্বপুরুষগণের গুণকীর্ত্তন (২)

পূর্ব্বব্যবস্থায় দোষালেপন। ভারতে এই দুই ভাবযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। প্রথম প্রকারের ব্যক্তিরা বাক্যের দ্বারা জাতীর নিকট নানাপ্রকার অপূর্ব্ব মতবাদ প্রচার করিতে এক অদ্ভুতজীবরূপে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের মস্তিষ্ক দেবতার ন্যায় উজ্জ্বল, কিন্তু হস্ত ও হৃদয় নূতনত্ব শূন্য, আহার-বিহারের চেষ্টায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিরা কেবল পুরাতনের দোষানুসন্ধানে ব্যাপৃত—ধ্বংসই তাঁহাদের নীতি, গঠনশক্তি একেবারে শূন্য। দেবতা ও শাস্ত্রের অবমাননাকারী স্থূল-মস্তিষ্ক আসুর প্রকৃতিক কালাপাহাড়েরাই পুরাতন বিগ্রহ মন্দির চূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সমালোচনার লৌহদণ্ড হস্তে লইয়া ফিরিতেছেন।

* * *

স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের জন্য অন্নসংস্থান জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই তথ্য তাঁহারা অতি উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছেন,—যে তথ্যে আদৌ নূতনত্ব নাই, যাহা পশুকেও বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয় না। হাতে-নাতে কাজ করিতে অনিচ্ছুক এই দুই পক্ষের প্রথম পক্ষ গালি-গালাজ করেন না—কেবল মাঝে মাঝে মুরুব্বিয়ানার সুরে কর্ম্মীদের কর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন 'ভাল, ভাল'। আর দ্বিতীয় পক্ষ কুৎসা রটায়, গালি দেয়—ক্রমে তাহাতে বিফলকাম হইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে বলে, 'আরে রাম কহো ভাই, ভিক্ষা করে যে খায় সে আবার মহৎ কায়। আর ঐ দরিদ্রের সেবা করে করে দেশটা একেবারে দরিদ্র হয়ে গেল।' কিন্তু শেষোক্ত যুক্তি শ্রবণ করিয়া এক শিশু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'যদি দরিদ্রের সেবা করে মানুষ দরিদ্র হয় তবে বাক্যরূপ মোসাইবীর দ্বারা ধনির সেবা করে মানুষ ধনি হয় না কেন?' (সেবার দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আমরা এখানে স্থগিত রাখিলাম)।

* * *

এই সকল ব্যতিরেকে তৃতীয় পক্ষ আছেন তাঁহারা দৃঢ়, বলবান, মেধাবী, সচ্চরিত্র কর্ম্মীদের অর্থ সাহায্য করিয়া লোকহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করেন, যাহা তাঁহারা সংসারের গুরুভার হেতু নিজ নিজ কর্ম্ম ব্যপদেশে

নিবদ্ধ থাকায় ঐ সকল সৎকার্য্যে সময় ক্ষেপ করিতে পারেন না। এবম্প্রকার অর্থ এবং স্বার্থহীন কর্ম্ম সমবায়ে জগতে যে কত বড় বড় মহৎ কার্য্য সকল সুসম্পাদিত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন। মহান্ সৎকার্য্য সকলের আরম্ভ নির্ভর করে দেশবাসীর সহৃদয়তা এবং বদান্যতার উপর, স্থায়ীত্ব নির্ভর করে কর্ম্মযোগীর অনলস নিষ্কাম কার্য্য প্রবণতার উপর। প্রকৃত কর্ম্মী যাহারা তাঁহারা মুরুব্বি এবং হিংসুকদের 'ভাল ভাল এবং ছি ছি' এই উভয় ধ্বনির দিকে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় গন্তব্যে স্থিরলক্ষ্য থাকেন।

অনন্তের পথে।

(ধ্রুব।)

সসীম পিঞ্জর ভাঙ্গি ছুটিযাছে মন-পক্ষী মোর।
উধাও অনন্ত পথে ছিঁড়িয়াছে করমের ডোর॥
নেতির ঝঙ্কারে তোলে অসীমের পুরাতন গান।
মুগ্ধ মৃত্যু প'ড়ে রয় মূর্ত্ত হয় ধাবে মহাপ্রাণ॥
দূরে, দূরে, চল মন সকল আমিত্ব ফেল মুছে।
স্তব্ধ হ'ক সগধারা পড়ে থাক স্বার্থে সান্ত পিছে॥
হের ওই গম্ভীর গগনে আঁধারে লুকায়ে আঁধিয়ার।
জলদ ঘূর্ণনে ছায় কেশজাল অনন্ত অমার॥
উদ্ধে তার পরপারে মহাকালী মহাকাল কোলে।
খেলে নিরন্তর আদিশক্তি লীলার কম্পন ছলে॥
কোটি গগনের রঙ্গমঞ্চ দোলায় ইচ্ছার বায়।
কোটি সূর্য্য আবর্ত্তিয়া তাতে পুলক নর্ত্তনে ধায়॥
উদ্ধে চল দহর আকাশে নিবৃত্তির স্বরাজ্য নগরে।
মিশাইয়া দেও আপনায় শান্ত স্থির নির্ব্বাণ সাগরে॥
অস্তি নাস্তি হীন যেথা জ্যোতিতে মগন জ্যোতি ধার।
উচ্ছ্বাস তরঙ্গহীন স্তব্ধ প্রাণ বৈচিত্র্য উজার॥
অস্তি ভাতি প্রীতিপূর্ণ বিরাজিছে শূন্য রূপ হয়ে।
চিকাশে বিরজা আত্মা দ্বৈত-হিম জড়ত্বের লয়ে॥

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

C/o সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
গোরাবাজার, গাজিপুর।
ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার আপসোস পত্র পাইয়াছি। আমি শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিতেছি না, বাবাজির অনুরোধ এড়াইবার যো নাই। সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল বলিয়া আপসোস করিয়াছেন। কথা ঠিক বটে, অথচ নহে বটে। Ideal bliss (আদর্শ আনন্দ) এর দিকে চাহিতে গেলে একথা সত্য বটে, কিন্তু যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর। পরন্তু ঐ প্রকার কি হইল কি হইল অতি ভাল—উন্নতির আশাস্বরূপ—নহিলে কেহ উঠিতে পারে না। "পাগড়ি বেঁধেই ভগবান্" যে দেখে, তাহার ঐখানেই খতম্। আপনার সর্ব্বদাই যে মনে পড়ে "কি হইল" আপনি ধন্য নিশ্চিত জানিবেন—আপনার মার নাই।

গিরীশবাবুর সহিত মাঠাকুরাণকে আনিবার জন্য আপনার কি মতান্তর হইয়াছে—গিরীশবাবু লিখিয়াছেন—সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে আপনি অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি—কার্য্যসিদ্ধির প্রধান উপায় যে ধৈর্য্য—এ আপনি ঠিক বুঝেন, সে বিষয়ে চপলমতি আমরা আপনার নিকট বহু শিক্ষার উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কাশীতে আমি —র ঘাড় না ভাঙ্গা যায় এবিষয়ে একদিন বাদানুবাদছলে কহিয়াছিলাম। তৎসওয়ায় আর আমি কোনও খবর জানিনা এবং জানিতে ইচ্ছাও রাখি না। মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে,

সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন নরাধম তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কথা কহি?—কে যে বারণ করিয়াছিলাম, তাহা যদি দোষের হইয়া থাকে, তজ্জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সদ্বিবেচক—আপনাকে কি বলিব? কান দুটো, কিন্তু মুখ একটা, বিশেষতঃ আপনার মুখ বড় কড়া এবং ফস্ ফস্ করিয়া Large promises (বেশী বেশী অঙ্গীকারবাক্য) বাহির হয় না বলিয়া আমিও আপনার উপর অনেক সময়ে বিরক্ত হই, কিন্তু পরে বিচার করিয়া দেখি যে, আপনিই সদ্বিবেচনার কার্য্য করেন। "Slow but sure" (মন্দগতি, কিন্তু নিশ্চিতগামী)

"What is lost in power is gained in speed" (আপাততঃ যে পরিমাণ শক্তির অপচয় বোধ হয়, গতির পরিমাণে তাহা পুরাইয়া যায়) যাহাই হউক, সংসারে কথা লইয়াই কায। কথার ছাল ছাড়াইয়া (তাতে আপনার কৃপণতার আবরণ এক ছড়াইয়া) অন্তর্দৃষ্টি সকলের হয় না এবং বহু সঙ্গ না করিলে কোনও ব্যক্তিকে বুঝা যায় না। ইহা মনে করিয়া এবং শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণীকে স্মরণ করিয়া* যদি আপনাকে কিছু কড়াকাটব্য বলিয়া থাকে ক্ষমা করিবেন। ধর্ম্ম দলে নহে, হুজুকে নহে, ৺গুরুদেবের এই সকল উপদেশ ভুলিয়া যান কেন? আপনার যা করিবার সাধ্য করুন, কিন্তু তাহার কি ব্যবহার হইল কি না হইল, ভাল মন্দ বিচার করার অধিকার আমাদের বোধ হয় নাই। দলের idea (ভাব) যতক্ষণ থাকিবে, পরমহংসের শিষ্যের উপর বিশেষত্ববোধ যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইবে। * * আপনাকে অধিক কি লিখিব—এসকল সম্বন্ধে কোনও কথা আমাকে না লিখেন এই প্রার্থনা। গিরীশবাবু যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে এ সময়ে মাতাঠাকুরাণীর সেবায় তাঁহার বিশেষ শান্তিলাভ হইবে। তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি বিচার করিব। আর ৺গুরুদেব আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। আপনার বাটী ভিন্ন কোথাও অন্নাদি গ্রহণ করিতেন না এবং

শুনিয়াছি, মাতাঠাকুরাণীও আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন—এই সকল মনে করিয়া আমাদের ন্যায় চপলমতি বালকদিগের (নিজ পুত্রের কৃত অপরাধের ন্যায়) সকল অপরাধ সহ্য ও ক্ষমা করিবেন—অধিক কি বলিব।

জন্মোৎসব কবে হইবে পত্রপাঠ লিখিবেন। আমার কোমরে একটা বেদনায় বড় অসুস্থ করিয়াছে। আর দিন কয়েক বাদে এস্থানে বড় শোভা হইবে—ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী গোলাপফুলের মাঠে ফুল ফুটিবে। সেই সময়ে সতীশ কতকগুলা তাজাফুল ও ডাল মহোৎসব উপলক্ষে পাঠাইবে বলিতেছে। যোগেন কোথায় কেমন আছে? বাবুরাম কেমন আছে? সা—কি এখন তেমনি চঞ্চলচিত্ত? গুপ্ত কি করিতেছে? তা—দাদা, গোপাল দাদা প্রভৃতিকে আমার প্রণাম। মাষ্টারের ভাইপো কতদূর পড়িল? রাম ও হরিব ও কৃ—কে আমার আশীর্ব্বাদাদি দিবেন। তাহারা পড়াশুনা কেমন করিতেছে? ভগবান্ করুন, আপনার ছেলে যেন মানুষ হয়—নামবদ না হয়। তুলসী বাবুকে আমার লক্ষ লক্ষ সাদর সম্ভাষণ দিবেন এবং এবারে একলা সা— ও নিজের খাটনি খাটিতে পারিবে কি না? চুনীবাবু কেমন আছেন?

মাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে বলিবেন, যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়—কিম্বা এশরীরে যদি তাহা অসম্ভব যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।

নিম্নে লিখিত কয়েক ছত্র গুপ্তকে দেখাইবেন,—

দাস

নরেন্দ্র।

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(৪)

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

মানবীয় সভ্যতা-স্রোতে জড় ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের তরঙ্গদ্বয় অব্যাহত গতিতে চলেছে। জড় তরঙ্গের নিবৃত্তির সঙ্গে যখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন মানব তার স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মকে উন্নত করে একদল অতি শক্তিসম্পন্ন আধিকারী পুরুষদের নিকট থেকে—যাঁরা স্বতপস্যা বলে নিজ নিজ জীবনে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার প্রকাশ দিয়ে যান। কিন্তু সন্তান-মর্য্যাদা গুণকে চিরকালই উপেক্ষা করে এসেছে। সেই মহাপুরুষদের বংশগৌরবে, শিষ্য-সন্তানদের অক্ষমতা সত্ত্বেও মানব তার স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মকে নিজের অজ্ঞাতসারে তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদেরে পঙ্গু করে ফেলে—পুরোহিত বা সন্ন্যাসীর নিকট বিত্ত নিক্ষেপ করেই তারা ধর্ম্মের কর্ত্তব্য শেষ করতে চায়, নিজেদের খোলসা বোধ করে। ধর্ম্মটা যে সকলের নিজের জিনিষ, আত্মস্বরূপ ও শক্তি প্রকাশ করার নামই যে ধর্ম্ম, ধর্ম্মের রাজ্যে যে প্রতিনিধি প্রেরণ চলে না, একথা তাদের মনে না থাকায় "এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয়, যাহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার একচেটিয়া দাবী করিয়া থাকে।" সাধারণের ধর্ম্ম বিষয়ে এই অগ্রাহ্যতাকে হেতু করে সেই ধর্ম্মসাধকেরা সমাজের মন-দেহ-আত্মায় দাসত্বের লৌহনিগড় রচনা ক'রে দিয়ে সমাজচিত্ত থেকে সকল নূতনত্ব, ভাব, উৎসাহ, আশা, আকাঙ্ক্ষা মুছে ফেলে এবং নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখে। সমাজ বা সঙ্ঘে দেখা যায়, যখনই আয়াস-মূল্য ধর্ম্মে এবং সর্ব্বাবয়ব জীবনের স্বাধীন বিকাশে অনিচ্ছুক স্বল্পতৃপ্ত জনসাধারণ অপরের হস্তে নিজেদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য তুলে দিয়েছে,

* উদ্ধৃত অংশগুলি পরমকুডি অভিনন্দনের উত্তর হইতে গৃহীত।

তখনই সেই সাধারণের প্রতিনিধিরা সমাজের বক্ষে চেপে বসে সমাজ ও সঙ্ঘকে গ্রাস করে ফেলেছে। "ক্রমশঃ এমন সময় আসে যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি নহে, তাহার সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলি অল্পসংখ্যক কয়েকটী ব্যক্তির একচেটিয়া হয়। এই অল্পসংখ্যক লোক সর্ব্বসাধারণের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে।" ধীরে যখন আভিজাত্য অত্যাচার সমাজ বক্ষে অসহ্য কঠিন অনুভব দেয় তখন প্রাচীন নিয়ম কারার লৌহঅর্গল ভাঙ্গবার জন্য মন বিদ্রোহীর মত ছুটে এসে ভীষণ আঘাত করে—কেবল প্রাচীন যেটুকু সত্য আছে সেই টুকুই থেকে যায়, আর যা জীর্ণ তা হয় একেবারে চুরমার।—এই বিদ্রোহী প্রচেষ্টার ফল জড়বাদ। মানুষ তখন তথাকথিত সমাজ এবং ধর্ম্ম নেতাদের ভিতর আধিকারী পুরুষদের তুল্য শক্তি, ত্যাগ এবং স্বাধীন বিকাশ দেখতে পায় না—তথা নিজেরাও তাহার অনুশীলন কখনও করেনি—ফলে দাঁড়ায় শাস্ত্র, গুরু, এবং নেতার চরিত্র ও বাক্য সম্বন্ধে ঘোরতর অবিশ্বাস। মানব তখন পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে ইন্দ্রিয় সুখের, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং সমাজের সকল প্রাচীন নিগড় ভেঙ্গে নূতন করে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সত্যের উপর সমাজ গড়বার নব নব পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়। অভিজাতকে ভাঙ্গবার জন্য সাম্য-মৈত্রীর ধ্বজা তুলে প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযান করে। ইহার ফলে দলিত, অভিশপ্ত গণশক্তি অভিজাতের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে জাগ্রত হয়। এই হিসাবে "জড়বাদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন করিয়াছে—উহা সকলেরই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে—উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকার দূর করিয়া দিয়াছে—অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হস্তে যে অমূল্য রত্ন গুপ্তভাবে ছিল, এবং তাহারাও যাহার ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঐ অমূল্য রত্নের অর্দ্ধভাগ নষ্ট হইয়াছে, অপরার্দ্ধ এমন সকল লোকের হস্তে রহিয়াছে, যাহারা গরুর জাবপাত্রে শয়ান কুক্কুরের মত নিজেরাও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবে না।"

এই জড়বাদ তখন পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব করে—ধরিত্রী তখন ধন-ধান্য

সৌভাগ্য-সম্পদে ভূষিত হইয়া উজ্জ্বল দেখায়। ধর্ম্ম হয় তখন সাহিত্য ও কিম্বদন্তীতে পর্য্যবসিত—শিক্ষা অর্থ তখন অন্নাগম ও সুখের উপায় স্বরূপ। কিন্তু সৌভাগ্য লক্ষ্মী চিরকালই চঞ্চলা—তাঁকে উপলক্ষ্য করেই মানুষ মনের হিংসা দ্বেষ প্রবলাকার ধারণ করে—"পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই যেন তখনকার যুগধর্ম্ম হইয়া পড়ে।" সকলেই তখন নিজের স্বার্থের কড়ির হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত—দয়া, ত্যাগ, প্রেম কেবল আভিধানিক শব্দ মাত্রেই থেকে যায়। তখন সেই প্রাচীনের সত্যটুকু যারা ধরে ছিল তাদের মধ্য দিয়ে ভোগ ও জড়বাদের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতি-ক্রিয়া উপস্থিত হয়ে এক প্রচণ্ড ঐশীশক্তিসম্পন্ন অতিমানবের আবির্ভাব ঘটে। মানবের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় সময় সময় সব জাতির মধ্যেই যেন একটা সংসারে বিরক্তি আসে। সেই সময় তাদের অবস্থা এমনি হয় যে তারা যে কোন মতলব করুক না কেন সবই যেন হাত ফসকে পালায়—হতাশ দৈন্য এসে যেন সেই ভোগবাদের প্রত্যেক ভিত্তির পাথরগুলো আলগা করে দিয়ে যায়। তখন "ক্রমশঃ জড়বাদের গভীর আবর্ত্তে মুজ্জমান জগতের সাহায্যার্থ ধর্ম্ম অগ্রসর না হইলে, জগতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" এই যুগ সন্ধিক্ষণে সেই অতিমানবের পাদস্পর্শ জগৎকে ধন্য করে—তাঁহার অঙ্গ জ্যোতি স্পর্শ করে দেয় প্রাণের স্পন্দন, ভরিয়া দেয় বিশ্বকে আশা, উৎসাহ, ভাব অনুরাগের আলোক বন্যায়।

শত শত শতাব্দী ধরে পরীক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজ জড়বাদের শেষ পরিণতির উদাহরণ। "রাজনৈতিক শাসনসংসৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার প্রণালী এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে, আর এক্ষণে ইউরোপ অশান্তি সাগরে ভাসিতেছে—কি করিবে, কোথায় যাইবে, বুঝিতে পারিতেছে না।" সেখানে ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অত্যাচার অসহ্য পাষাণের মত সমাজ বক্ষে চেপে বসেছে। কূট বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জন কতক আজ শত শত নরনারীর জীবন মরণের ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসেছেন, তাঁরা যন্ত্রী আর লক্ষ লক্ষ জীব অজ্ঞ তাঁদের হাতের যন্ত্র। এই জীব-যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক-শক্তি সহায়ে আজ তাঁরা জগতে রক্তের বন্যা আনয়ন করেছেন। ধর্ম্ম ও নীতি অন্ধ হয়ে ধলিধূসরিত—"পাশ্চাত্য

মুষ্টিমেয় শাইলকের শাসনে পরিচালিত হইতেছে। তোমরা যে প্রণালী-বদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পলিয়ামেণ্ট মহাসভা প্রভৃতির কথা শুন, সেগুলি বাজে কথা মাত্র। পাশ্চাত্য প্রদেশ শাইলকগণের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত। প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতগণের অত্যাচারে কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতেছে। উভয়কেই পরস্পরকে শাসনে রাখিতে হইবে।”

এর একটীর দ্বারাও জগতের কল্যাণ হবে না। কারণ নিরপক্ষপাত ভগবান্ তাঁহার শক্তির বৈচিত্র্য নানা জীবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন। এমন ঢের গুণ আছে যা নগণ্যে প্রকাশ পায় অধিক, বড় বড় মহাপুরুষে হয়ত যার একেবারে অভাব। কুলী মজুরে যে দৈহিক তিতিক্ষা, নীরব সহগুণ দেখতে পাওয়া যায় তা শতকরা একজন বেদান্তীতেও দেখতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তুমি হয়ত রাজ্য শাসন করতে পার আমি জুতো শেলাই করতে পারি, তুমি দার্শনিক ব্যাখ্যা করতে পটু আমি রাস্তা ঝাড়ু দিতে দক্ষ, আমি তোমায় ছেড়ে চলতে পারি না, তুমি আমায় ছেড়ে চলতে পার না। কেউ কারও মাথায় পা দিয়ে চলতে পারে না, ঘৃণা করতে পারে না, কারণ সেই একই আত্মা তাঁর সমাজ শক্তির বৈচিত্র্য প্রকট করচেন ব্যষ্টি মানবের মধ্য দিয়ে। সেই বিচিত্র শক্তিসকলের সমবায় যদি শ্রদ্ধা দিয়ে হয়, তবেই মানবের চির অভিলষিত নবীন সভ্যতার অভ্যুদয় হবে। শ্রদ্ধার মূল হচ্চে সর্ব্বভূতে প্রেমাস্পদ আত্মার অনুভূতি। আর তা না হলে যদি লাখো বৎসর ধরে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মন্ত্র জপ করা যায়, সিদ্ধি সে মন্ত্রের ইষ্টকে প্রত্যক্ষ হতে দেবেন না —মন্ত্রের অর্থজ্ঞান হীন সাধকের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাই সে প্রচেষ্টার পরিণতি। এই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা বীজের সাধ্য দেবতা হচ্চেন সর্ব্বভূতান্তর্যামী পরমাত্মা। এই দেবতার ধারণা যত দৃঢ় হবে ততই সিদ্ধি অগ্রসর হয়ে প্রীতির অঞ্জন মানব চক্ষে পরিয়ে দিয়ে প্রাণের প্রাণকে দেখিয়ে দেবেন। তখন সকল তুচ্ছ দৈন্য নষ্ট হয়ে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা স্বার্থক হবে। “যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী ৫০ বর্ষের

মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে। মানব জাতিকে তরবারি বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। তোমরা দেখিবে, যে সকল স্থান হইতে পাশব বলে জগৎ শাসন এই ভাবের উদ্ভব, সেই স্থান গুলিতেই প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়, সেই সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। জড় শক্তির লীলাক্ষেত্র ইউরোপ যদি নিজের ভিত্তি সরাইয়া আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তাহার সমাজ স্থাপন না করে, তবে ৫০ বৎসরের মধ্যেই ইউরোপীয় সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্ম্মই ইউরোপকে রক্ষা করিবে।"

ভগবান্ ও জীবে, সাধু ও পাপীতে, রাজা ও প্রজাতে ব্যবধান করেছে অজ্ঞান প্রসূত শক্তির তারতম্যে। কিন্তু সকলেরই অন্তরতম দেবতা হচ্চেন সেই পরমাত্মীয় আত্মা। এখন 'অভীঃ' মন্ত্রে বীর্য্যবান হয়ে সকল কুসংস্কার দূরে ফেলে নিজ আত্মাতে এবং সর্ব্ব প্রাণীতে সেই মহাপ্রাণের ভাবনা জাগ্রত করে তাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হলে এ জগৎ আর এক রকম হয়ে আমাদের নিকট প্রকাশ হবে। তখন দুঃখ মরণ হবে অনন্ত সুখের তোরণ—ভগবান্ ও জীবের ঐশ্বর্য্যের ব্যবধান, সাধু ও পাপীতে ধর্ম্মের ব্যবধান, রাজা ও প্রজাতে সিংহাসনের ব্যবধান ঘুচে যাবে। সাম্য যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল দুর্ব্বলতা, পাপ, ভীতি এবং আভিজাত্যের কঠোর শৃঙ্খল থেকে মানব ও তার সমাজকে নিস্তার দেবে। তখনই মানব বুঝতে পারবে যে জীবনের উদ্দেশ্য স্বার্থ ভোগের জন্য নয়—ত্যাগের জন্য, পরমপুরুষের সেবার জন্য, মহত্ত্ব দুর্ব্বলের উপর সবলের বল প্রকাশে নয়—তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতা ত্যাগ করে তাকে উপরে তুলে ধরা, তাকে ইহকালে সমাজ এবং পরকালে নরক-ভীতি থেকে মুক্ত করা। কারণ 'ভয় হইতেই দুঃখ, ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে।" "বেদান্ত ভয়ে ধর্ম্ম করিতে বলে না। বেদান্ত বলে না যে শয়তান সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে তোমার দিকে লক্ষ্য করিতেছে, যদি তুমি একবার পদস্খলিত হও, অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।" এ সব গল্প কথা মাত্র। বেদান্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নেই। আমরা যেমন দেবত্বকে বিকাশ করে মুক্তি এবং

আনন্দের ভাগী হ'তে পারি, সেইরূপ শয়তানটাকেও আমরা নিজ মায়ায় সৃষ্টি করে প্রলোভনে মুগ্ধ হই। ধন্য সেই পরমব্রহ্ম মহিষী।

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্ লক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্।

বৈদিক ভারত।

(বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন।)

No nation can vie with the Hindus in respect of the antiquity of their civilization and the antiquity of their religion.

Count Bjornstjerna.

ভারতবর্ষ বিশ্বপ্রকৃতির স্বর্গীয় সম্পদে বিভূষিত হইয়া সমগ্র জগতের প্রদর্শনাগার রূপে বিরাজিত। হিমাচলের রজতশুভ্র তুষার, পঞ্চ সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনার সুমনোহর কল কল তান, সুশোভিত শ্যামল প্রান্তর, সুকান্ত সমতল, উন্নত গিরিমালা, অপার জলধির উচ্ছ্বাস কল্লোল, নির্ম্মল সুহাসিনী উষা, কমনীয় দিনান্ত শোভা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সুষমা এদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক অনাবিল স্বপ্নময় ভাব ও স্মৃতিমাখা প্রেরণা ওতপ্রোত করিয়া রাখিয়াছে। সজীব ও সতেজ বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে বাস করিয়া ভারতীয় মন স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী হইয়া রহিয়াছে এবং ভোগোন্মত্ত অশান্ত ভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া চেতন, অচেতন, জড় ও উদ্ভিদ প্রভৃতির সহিত আপনাকে একীভাবে ব্যাপ্ত করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস নিষ্পাপ, পবিত্র অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস,

রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি কৌশলময়ী নীতিজাল বিস্তারের কাহিনী নহে। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিতা সিষ্টার নিবেদিতা বলেন,—

How great is India possessing within her boundaries every kind of beauty! She could not but be the home of a vast and complex civilisation

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণ চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভারতবর্ষকে "Geographical Expression" বা ভৌগলিক সংজ্ঞামাত্রে পর্য্যবশিত করিয়াছেন। সত্য বটে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপ্রসূত বিবিধ প্রাদেশিক বিভাগ আমাদের নিকট এত অধিক বিসদৃশ মনে হয় যে ভারতবর্ষের ভৌগলিক অখণ্ড একত্ব (India as a Geographical unit) কল্পনায় আনয়ন করা সুদূর পরাহত হইয়া উঠে। কিন্তু স্থিরভাবে ভারত-সীমান্তস্থিত প্রতিবন্ধক গুলির অনুধ্যান করিলে দেশান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাকৃতিক বিভাগ সমূহ অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। বিরাট হিমাচল যে বিশিষ্ট প্রকারে সমগ্র এশিয়া হইতে এ দেশকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে তাহার সহিত দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথ বিভাগকারী বিন্ধ্যাচল তুলনার অযোগ্য, এবং ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর যেরূপ সমগ্র পৃথিবী হইতে এদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, দেশের বিভিন্ন নদনদী সেরূপ করিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত মৌসুম বায়ুর প্রবাহ একই আবহাওয়ায় দেশকে প্রধানতঃ সুজলা ও কৃষিপ্রধান করিয়া প্রাদেশিক বৈচিত্র্যের অনেকাংশে সমতা-বিধান করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় "Fundamental unity of India"য় বলেন,—

The whole country was thus visualised and naturally grasped by the national thought as a geographical unit whose strength and fervour triumphed over physical difficulties of pre mechanical ages in the way of having an ultimate knowledge of the different parts which were welded into a whole'

জাতীয়তার উদ্বোধন ও জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ লাভের নিমিত্ত একই মাতৃভূমিরূপ ভিত্তির সহিত বিশিষ্ট পরিচয় ও তৎপ্রতি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন। সনাতন ধর্ম্ম সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মাতৃভূমির অখণ্ড ভৌগলিক বিগ্রহের পূজা করিতে শিখিয়াছিলেন—এবং আজ পর্য্যন্তও আমরা প্রত্যেক পূজা পার্ব্বণে ভিতরের গূঢ় অর্থ না জানিয়াও জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত ভাবে বলিয়া থাকি—"গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি স্বরস্বতী, নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।" ভারতের সর্ব্বত্র আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইবার পর এই ভাবটী সাধারণের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু প্রাচীন ঋগ্‌বেদেও এই ভাবের সংক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে স্বরস্বতি
শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে
শৃণুহ্যা সুষোময়া।"

অন্য নানাবিধ উপায়েও ভারতবর্ষের একত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াস বর্ত্তমান ছিল। অথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরিয় সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে রাজসূয় নামক যজ্ঞের বৈদিক প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই রাজসূয় যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভারতব্যাপী এক বিশিষ্ট ভাবের ঐক্য বন্ধন স্থাপিত হইত। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উদাহরণে আপনহারা না হইয়া সমদর্শীর মত আত্মস্থভাবে প্রাচীন অনুষ্ঠান গুলির আলোচনা করিলে উহাদিগের পশ্চাতে এক একটি মহান ভাব অনুভূত হয়। বিদেশীয়গণ ভারতবর্ষকে ইণ্ডিয়া অথবা হিন্দ্ নামে অভিহিত করিলেও আর্য্যদের নিকট এ দেশ চিরকালই ভারতবর্ষ নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মহারাজ ভরতের উপাখ্যান আছে—তাঁহারই নামানুসারে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। বিভিন্ন চরিত্র ও গুণসমন্বিত কতকগুলি বিসদৃশ পদার্থে সামঞ্জস্য বিধায়ক কোনও বিশেষ চরিত্র বা গুণ না দেখিলে [illegible]

তাহাদিগকে এক আখ্যায় অভিহিত করি না। সুতরাং এই ভারতবর্ষ নামের মধ্যে বহির্বৈচিত্র্যের সমতা বিধায়ক একত্ব বর্ত্তমান থাকা অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ আখ্যায় সামঞ্জস্যীকৃত একত্ব এক মহান্ সাধনা প্রসূত। মহারাজ ভরত বিরাট সাধনার প্রতিভূ-রূপে সমগ্র দেশ একীভূত করিয়াছিলেন। "Soul of India" নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন—"Bharata stood before the multitudinous peoples that inhabited in the territorres that took his name as the representative of a great civilisation and culture * * * Bharata was a Vedic personage" দেশের প্রাকৃতিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও যে এক মহান্ সাধনার ধারা সুদূর অতীত হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ভারত-ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা উহা বুঝিতে অকৃতকার্য্য হইব। বর্ত্তমান পতনাবস্থা দেখিয়া অতীতে বিশ্বাসহীন আমরা বৈচিত্র্যবহুল নানা ধর্ম্ম, নানা জাতি, নানা আচার-ব্যবহার প্রভৃতির পশ্চাৎবর্ত্তী সাধনার চরম একত্ব অজ্ঞাত থাকিলেও সত্যানুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ধীরে ধীরে এই ভাব-মন্দাকিনীধারা স্পর্শ করিতে পারিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ বলেন,—

"India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity far more profound than that produced either by geographical isolation or political suzerainty.

দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী প্রসূত অন্তর্মুখিনতা, অভিনব সভ্যতা গঠনোপযোগী ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈসাদৃশ্যের সমতাবিধায়ক একই অনাবিল চিন্তার ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা দেশের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় অগ্রসর হইলাম। ভৌতিক উন্নতিকে সভ্যতার চরম আদর্শ ভাবিয়া আমরা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতায় সন্দিগ্ধ হইলেও, যথার্থ তত্ত্বদর্শী ও জ্ঞানলিপ্সু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের প্রাচীনতার গভীরতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। অধ্যাপক হিরেণ ম্যাগ্র ডঙ্কার, জ্যাবর্ণস্‌জোবর্ণা, [illegible]মূলর, উইলসন, মুইর, টড প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ শতমুখে

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব, গাম্ভীর্য্য ও প্রসারের প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীনতার কাল নির্ণয়ে 'নানা মুনি নানা মত' প্রদান করিলেও অনেকেরই মতে ৫৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দই ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকযুগের সূচনা করে। কিন্তু আমাদের কিম্বদন্তি বা বৈদিকগ্রন্থাদি হইতে বৈদিক সভ্যতার কালনির্ণয়ের কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, এক একটি অসভ্যজাতি কালস্রোতের আবর্ত্তের সহিত বর্ব্বরোচিত আচরণ ও পাশবিকতা পরিহার পূর্ব্বক ধীরে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্ব-প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ বাহির করিতে পারা যায় না যে আর্য্যগণ বর্ব্বরতা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত হইতেছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসকে প্রধানতঃ তিনটি অবস্থায় বিভক্ত করা যায়—(১) শারীরিক (২) মানসিক ও (৩) আধ্যাত্মিক। সভ্যতার প্রথমস্তরে মানব পাশবিক দৈহিক বলে বলীয়ান্, দ্বিতীয়স্তরে মানসিক ও বুদ্ধিজাত নানাপ্রকার উদ্ভাবন ও আবিষ্কার রত ও শেষ অবস্থায় জড়জগতের সীমাবহির্ভূত যথার্থ মানব-স্বরূপ অনুভব ও বিশ্বরহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন পরায়ণ। বৈদিক সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়া আর্য্যসভ্যতার স্তর নির্ণয় করিতে গেলে স্পষ্ট বোধগম্য হয়—আর্য্যসভ্যতা তৃতীয় অবস্থায়ই উন্নীত হইয়া রহিয়াছে। কোন্ সুদূর অতীতের তমসাচ্ছন্ন যুগে আর্য্যসভ্যতা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়াছে তাহার চিহ্ন মাত্রেরও ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। জগৎ প্রহেলিকার পূর্ণ সত্যের সন্ধান পাইয়া তদনুযায়ী জাতীয়জীবন পরিচালিত করিলেই সভ্যতা পূর্ণ বিকশিত হয়। সুতরাং আর্য্যসভ্যতা কিম্বদন্তীর সুদূর অতীতযুগে পূর্ণবিকশিত হইয়াছিল—ইহা নিশ্চিত। হিন্দুসভ্যতার প্রাচীনতার নিকট অবনত মস্তক মিঃ হ্যালহেড্ বলেন—"To such antiquity the mosaic creation is but yesterday."

আর্য্যজাতির আদিতত্ত্ব ও আদিম নিবাস সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত নানাভাবে আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ

আর্য্য জাতির আদিম বাসভূমি সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণই ঋগ্বেদ সংহিতায় প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত কয়েকটি স্থান ও নদ নদীর অবস্থান মধ্য এসিয়ায় স্থির করিয়া এবং আর্য্য জাতির বর্ণ, ভাষা ও দেবদেবীর সহিত মধ্য এশিয়াবাসীর বর্ণ, ভাষা ও দেবদেবীর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া প্রতিপন্ন করেন—মধ্য এশিয়া বা কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী কোনও ভূখণ্ড প্রাচীন আর্য্যনিবাস ছিল এবং নানা সংঘর্ষের তাড়নায় তাঁহারা ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বিতীয় একদল ঐতিহাসিক বেদোক্ত দীর্ঘকাল-ব্যাপী দিবারাত্রি ও শৈত্যাধিক্যের সহিত উত্তর মেরুর ছয়মাস-ব্যাপী দিবারাত্রির সাদৃশ্য দেখিয়া এবং জ্যোতির্গণনা দ্বারা উত্তর মেরু বহু অতীতে বাসযোগ্য ছিল প্রমাণ করিয়া প্রতিপন্ন করেন—আর্য্য জাতির আদিম বাসভূমি উত্তর মেরুতেই ছিল। আর্য্যগণের মেরুত্যাগ-বিবরণ তাঁহারা জেন্দা-বেস্তা নামক প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই মতের একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার লিখিত Orion এবং Artic home in the Vedas গ্রন্থদ্বয়ে তিনি এই মতের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয় অপর দল জার্ম্মাণ ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্যানুভব করিয়া পোলাণ্ড বা স্কাণ্ডেনেভিয়াকে প্রাচীন আর্য্যনিবাস বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন।

মধ্য এশিয়ার প্রাকৃতিক অবস্থা এমনই যে এই ভূখণ্ড কোন সভ্যতার লীলা-নিকেতন হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই দৃষ্ট হয় যে বর্ব্বর, দুর্দ্ধর্ষ, রণদুর্ম্মদ নানাজাতি এই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অনেক দেশকে পাশবিকতায় পর্য্যুদস্ত ও ধ্বংস করিয়াছে। শক, হুন প্রভৃতি জাতি চিরকালই জগতের ভীতি উৎপাদন করিয়াছে। উপরন্তু বেদাদিগ্রন্থ হইতে এবং নানা দেশের প্রত্নতত্ত্বালোচনা দ্বারা বহু পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক যুগের বহু পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীর অনেক স্থলে আর্য্য হিন্দুগণের যাতায়াত

ছিল। যাঁহাদের সভ্যতা ও সাধনা প্রাচীন জগতের দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, অভিজ্ঞতার প্রমাণের উপর তাঁহাদের আদিবাস নির্ণয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত নহে। এই বিষয় ক্রমশঃ বিশদ আলোচনা করিব লোকমান্য তিলকের মতে—মেরুত্যাগের সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরে বৈদিক সূক্ত লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু বেদে তাঁহাদের যাতায়াত ও সুদীর্ঘ ভ্রমণের সুখ-দুঃখের কথা ঘুণাক্ষরেও বর্ণিত নাই। এমন কি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতীত হয় না যে অতীতে উত্তরমেরু সূর্য্য-রশ্মিতে উত্তপ্ত ও বাসোপযোগী ছিল। তৃতীয়তঃ স্কাণ্ডেনেভিয়া প্রভৃতি সমুদ্রসন্নিকটস্থ স্থান হইতে আর্য্যজাতি বিস্তৃতি লাভ করিলে তদ্দেশস্থ সামুদ্রিক জীবজন্তু ও মৎস্যাদির নামের সহিত বেদোক্ত শব্দ সমূহের সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু সে প্রকার কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই তিনটি মতবাদের যৌক্তিকতায় সন্দিহান হইয়া অপর একদল ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে ভারতবর্ষকেই প্রাচীন আর্য্যনিবাস বলিয়া প্রমাণ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী পৃথিবীর ইতিহাসে—ভারতবর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা সিন্ধু প্রভৃতি নদনদী সমূহের বারবার প্রয়োগ ও গান্ধার ও কীকট দেশের উল্লেখ দর্শনে বহু পণ্ডিত উত্তরে গান্ধার (আফগানিস্থান) ও উক্ত নদনদী সমূহের মধ্যবর্ত্তী কোন ভূখণ্ডকেই আদিম আর্য্যনিবাস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদের দুই তিনটি শ্লোকের অর্থান্তর ঘটাইয়া উহার বিরুদ্ধ মতের পোষকতা করা হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন—দেবতা বিষ্ণুর আশ্রয়ে আর্য্যেরা ভারতভূমে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পথে তিনটি স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রিধা নিদধে পদং"। তদ্ব্যতীত তাঁহারা 'প্রত্যেক' শব্দের অর্থ উত্তর মেরু, "কে ষ্টা নর শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আযয়" শ্লোক দ্বারা কোনও উচ্চ ভূখণ্ড হইতে আর্য্যদের ক্রমাগমন ও বক্ষু, রুশম প্রভৃতি নদীকে মধ্য এশিয়ার অক্সাস (Oxus) প্রভৃতি নদী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য "প্রত্নৌক" শব্দের অর্থ স্বর্গভূমি করিয়াছেন, এবং শাকপুণি

ঔর্ণনাভ প্রভৃতি প্রাচীন নিরুক্তকারগণ বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য, ও বিশ্রামস্থান-ত্রয়কে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনুবাদে পণ্ডিত মোক্ষমূলরও বিষ্ণুর অর্থ সূর্য্য করিয়াছেন— "The stepping of Vishnu is emblematic of the rising, the culminating and the setting oft he sun." "কে তোমরা *দূর প্রদেশ হইতে একে একে আসিয়াছ?"* উহা—*মরুদ্গণের* উদ্দেশ্যে লিখিত, কিন্তু এই মরুদ্গণই কি আর্য্যগণ?—উহার কোন প্রমাণ নাই। যক্ষু, রুশম প্রভৃতি শব্দসমন্বিত সমগ্র বাক্যটিদ্বারা প্রমাণিত হয়, আর্য্যগণ তদ্দেশে যাতায়াত ও যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন। মিঃ মুইর (Muir) সংস্কৃত ভাষার বহু অনুশীলন করিয়াছেন; তিনি বলেন—

They could not have entered from the west because it is clear that the people who lived in that direction were descended from the very Aryans of India ...nor could the Aryan have entered India from the north or north-west beacuse we have no proof from history or philosophy that there existed any civilised nation with a language and religion resembling theirs which could have issued from either of those quarters at early that period and have created Indo-Aryan civilisation."

বৈদিক যুগের ইতিহাস অন্বেষণ করিতে মিশর, আসিরীয়া, বাবিলন প্রভৃতির ন্যায় খনন দ্বারা কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এখনও ঘটিয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য ও সমতলের আর্দ্রতা কোন অতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। হেভেল সাহেব অনুমান করেন—রাজপুতনার বিশুষ্ক ভূমি খনন দ্বারা প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। সাক্ষাৎ প্রমাণের অভাববশতঃ বৈদিক সাহিত্যই পুরাতত্ত্ব আলোচনার একমাত্র অবলম্বন। বৈদিকযুগের ইতিহাস বৈদিকসাহিত্যেই নিহিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদীয় গাথা সমূহের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সাহিত্যিক প্রমাণ জগতের কোন জাতি দেখাইতে পারেন না। মোক্ষমূলর বলেন—

"They are the oldest books in the library of mankind" সমগ্র বেদ চারিভাগে বিভক্ত যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। কেহ কেহ অথর্ব্ববেদকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন, আবার কেহ কেহ—উহার যাদুমন্ত্র ও অদ্ভুত গাথাসমূহ আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদেরও পূর্ব্বে স্থান দিতে চাহেন। প্রত্যেক বেদ তিনখণ্ডে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ বা আরণ্যক। সংহিতা প্রাচীন ঋষিগণের প্রাকৃতিক নানা শক্তির প্রতি স্তবস্তুতিতে পূর্ণ। ব্রাহ্মণ সমূহে কোন্ গাথা কোন্ বিশেষ ক্রিয়ায় প্রশস্ত ও গীত হইবার যোগ্য তাহাই উল্লিখিত রহিয়াছে। উপনিষদ বা আরণ্যক এই জড় জগতের পশ্চাদ্বর্ত্তী সনাতন সত্যের আবিষ্কারে ব্যস্ত। এতদ্ভিন্ন তিনখানি সূত্রগ্রন্থ বেদাঙ্গ ও উপবেদ সমূহকেও বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির নিয়মাবলী, গৃহ্যসূত্রে পারিবারিক ধর্ম্মকর্ম্মের উপদেশ ও ধর্ম্মসূত্রে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয় কথিত হইয়াছে। মনুসংহিতার ভিত্তি বলিয়া ধর্ম্মসূত্র ঐতিহাসিকগণের নিকট পরিচিত। বেদাঙ্গসমূহ শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ এই কয়েকটি বিষয়ে বিভক্ত। উপবেদসমূহের চারিভাগ—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। ধনুর্ব্বেদ আখ্যাত বিজ্ঞান বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে বহুল প্রচলিত ছিল। কঠোর সংযম ও সাধনা দ্বারা প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্মপালন নিমিত্ত উহা লাভ করিতেন। উহা আদৌ অবৈজ্ঞানিক বা অবিশ্বাসযোগ্য নহে। (এই বিষয় বিশেষ জানিতে হইলে—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত ভারতের সাধনা দ্রষ্টব্য)।

বৈদিক সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার: কাব্য মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বিকশিত করিয়া দেয়। মানবীয় চিন্তা ও প্রেরণা—মানব মনের মূর্চ্ছনা চিরদিনই এক; সুতরাং কাব্য জাতিগত, দেশগত বা ধর্ম্মগত সংস্কারের গণ্ডীবদ্ধ নহে। এই হেতু জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমরা বৈদিক সাহিত্য-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি। বৈদিক গাথাসমূহে আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাবই প্রবাহিত। এক প্রতিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, আত্মশ্রদ্ধাপরায়ণ, ভগবানে অগাধ বিশ্বাসশীল জাতির

বহুশতাব্দি ব্যাপী মনোভাব ও প্রেরণা এই গাথাসমূহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সমূহে "সরলতা, তেজস্বিতা ও সুদৃঢ় সত্যানুরাগের সহিত যেন একটি অপরিণত যুবার উদ্দামগতি ও উদ্দমশীলতার সুন্দর সুষমা সংমিশ্রিত রহিয়াছে। যদিও ভীতি প্রসূত নিম্নাঙ্গের ভক্তি ও সুকৃত-দুষ্কৃতানুযায়ী দণ্ড-পুরস্কার বিধায়ক ঈশ্বরের অর্চ্চনা উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।" উপনিষদের রাজ্যে প্রবেশ করিলে আমরা ধীরে ধীরে জড় হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন্ অন্তররাজ্যে চলিয়া যাই—মন যেন এক অনাবিল শান্তভাবে লয় পাইতে চায়। কবির ভাষায় বলিতে হয়—"ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়—সব চাওয়া সব পাওয়া।" সোপেনহাওয়ার উপনিষদের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"It has been the solace of my life and it will be the solace after my death. উপনিষৎ ভয়লেশমাত্র শূন্য হইয়া সত্যের আহ্বানে রত—শান্তি ও শক্তিতে মহিয়ান্। বিখ্যাত কবিগণ সাধারণতঃ ব্যক্তের ভিতর দিয়াই অব্যক্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—অনন্তের মহান্ ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া ব্যক্ত জগতের সামগ্রীকে তুলনা ও অনুমানযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষৎ অনন্তের বার্ত্তা আনয়ন করিতেছেন—সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তজগতের তুলনা ও অনুমানকে পরিহার ও অস্বীকার করিয়া, উপনিষৎ সত্যকে অসম্পূর্ণ ব্যক্ততার সাহায্যে প্রকাশিত না করিয়া সেই শাশ্বত সৌন্দর্য্য—যাহার ক্ষীণ অস্ফুট রেখা মাত্র এই বিশ্ব প্রকৃতি তাঁহার সম্বন্ধে গাহিতেছেন—

"যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

(ক্রমশঃ)

ভূমার সন্ধানে।

(পথিক ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আলোচ্য আখ্যায়িকাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবর্ষি নারদ সমগ্র বৈদিক ও লৌকিক বিদ্যার অনুশীলন করিয়াও পরাশান্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। 'আত্মবিৎ' হইলেই সে পরাশান্তি অধিগত হয় এ কথা ঋষিমুখে শুনিয়া তিনি আত্মবিদ্যালাভে আকাঙ্ক্ষী হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আদিঋষি সনৎকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে প্রথমে তদধিগত বিদ্যাকেই ব্রহ্মভাবে চিন্তা করিতে উপদেশ করিলেন। এই খানেই অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রারম্ভ। ব্রহ্মদৃষ্টির অভাবেই নারদের অধিগত বিদ্যা ব্যবহারিক বিদ্যাতেই পর্য্যবসিত ছিল, সনৎকুমার ব্রহ্মদৃষ্টিতে সেই বিদ্যার অনুশীলন করিতে উপদেশ করিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করিলেন। নারদ ঋষি অপূর্ব্ব অধিকারী, তিনি শ্রবণ মাত্রই উপদেশ ধারণা করিয়া উচ্চ উচ্চ বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীজই ক্রমশঃ শাখা-পল্লবে প্রসারিত হইয়া সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল, "মৃদিত কষায়" নারদ ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। নারদ ঋষি যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব সমূহের ধারণা করিতে লাগিলেন তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, তাঁহাকে একেবারেই সর্ব্বোপাধিরহিত পরমাত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেও তিনি তাহা অনায়াসে ধারণা করিতে পারিতেন। কিন্তু শ্রুতির তাহা অভিপ্রেত নহে। সাধক সাধারণ ব্যবহারিক জীবনাবলম্বনে কিরূপে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে তাহা বিবৃত করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। সেই সত্যটি সহজে বোধগম্য করিবার নিমিত্তই আখ্যায়িকার অবতারণা।

আশঙ্কা হইতে পারে—ব্যবহারিক বিদ্যাকে অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিণত করিবার জন্য যে "ব্রহ্মোপাসনার" উপদেশ হইল তাহার অর্থ কি?

বাহ্য বিদ্যাগুলি ত' কিছুতেই ব্রহ্ম হইতে পাবে না, যদি হইত তবে বাহ্য-বিদ্যার চর্চ্চাতে ব্রহ্মবিৎ হওয়া যাইত, তবে আর নারদের তাহা হইল না কেন? যদি বলা হয়, নারদেব তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি ছিল না বলিয়াই তিনি ব্রহ্মবিৎ হইতে পারেন নাই,—তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, যদি ব্যবহারিক বিদ্যাতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিলেই 'ব্রহ্মবিৎ' হওয়া যাইত তবে নারদকে পর পর এতগুলি উপদেশ প্রদত্ত হইল কেন? 'নাম' বা বাহ্যবিদ্যাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া লইয়াই ত' তিনি নিবস্ত হইতে পারিতেন; সুতরাং এ কথা নিশ্চয় যে "যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম" এরূপ একটা কথা শুনিয়া লইয়া বাহ্য বিষয়েই সবটা মন নিবদ্ধ বাখিলে তাহাকেই অধ্যাত্মবিদ্যা বলা যাইতে পাবে না, তাহাতে আত্মতত্ত্ব অবগত হইবাব কোনই সম্ভাবনা নাই। এমতাবস্থায় একজন বৈজ্ঞানিক যদি বিজ্ঞান চর্চ্চার ভিতব দিয়া ব্রহ্মচিন্তা কবিতে ইচ্ছুক হন, তবে একই সময়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও ব্রহ্মের চিন্তা কিরূপে সম্ভবপর হয়?

উত্তরে বলা যাইতে পারে, এ কথা সত্য যে উপাসনাতে উপহিত ব্রহ্মেব চিন্তারই প্রাধান্য। যেমন শালগ্রাম শিলায় যখন বিষ্ণু বুদ্ধিতে উপাসনাব উপদেশ করা হয়, তখন ধ্যানেব উপদেশ হয় শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী নারায়ণের, শিলাটি সেই চিন্তার একটি অবলম্বন মাত্র, সেই শিলাব সেবায় সাধক নারায়ণেরই সেবার চিন্তা করিবেন। বিজ্ঞা-নাদির চর্চ্চাও সেইরূপ আত্মচিন্তার প্রাধান্যে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। প্রত্যেক চেষ্টারই দুইটি দিক্ আছে, একটি কার্য্যকর্ত্তার নিজের দিক বা subjective side অপরটি তাহার কার্য্যের দিক বা objective side। নিজের দিক্ হইতে, যখনই যিনি যে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন অথবা যে চিন্তাদি কবিতেছেন তখনই তিনি নিজেকে সেই কার্য্য বা চিন্তা-শক্তিরূপে অনুভব কবিয়া পবে বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। বস্তুতঃ বিশেষ বিশেষ এক একটা কার্য্য বা চিন্তার মূলে বিশেষ বিশেষ এক একটি 'আত্মানুভব,' জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ নিজেকে পূর্ব্বে অনুভব না করিয়া কোন চেষ্টাই করিতে পারে না অথবা কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারে

না। আমি যখন একটি প্রস্তর উত্তোলন করি তখন প্রথমে আমি নিজকে বলবানরূপে অনুভব করিয়া পরে তার উত্তোলন ব্যাপারে সেই শক্তির প্রকাশ করিয়া থাকি। কবি যখন কাব্য প্রণয়ন করেন তখন তিনি নিজকে কবিত্ব শক্তিরূপে অনুভব করিয়া তবে ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন। এই প্রকারে সর্ব্বত্রই সকল চেষ্টা বা জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে এক একটি বিশিষ্ট আত্মানুভব। অভ্যাসের দ্বারা এই সকল স্বাভাবিক অস্পষ্ট আত্মানুভবগুলিকে স্পষ্টতর করিয়া সেই বিশেষ বিশেষ আত্মানুভব সকলকে অবলম্বন করতঃ নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই বৈদিক ব্রহ্মোপাসনার তাৎপর্য্য। নিজের দিকটা (subjective side) এইরূপে স্পষ্টতর ও উচ্চতর হইয়া উঠিলে তাহাতে বাহ্য চেষ্টার দিকটা (objective side) পঙ্গু না হইয়া বরং অধিকতর বীর্য্যবান হইয়া উঠিবে। শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন "তেনোভৌ কুরুতে, যশ্চ এতৎ এবং যশ্চ ন বেদ, নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ, যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।"* কারণ যে আত্মানুভব সকল ক্রিয়াশক্তির একমাত্র প্রেরক, তাহাকে যদি অনন্ত-শক্তির আধার ভাবিয়া স্পষ্টতর রূপে অনুভব করিতে শিক্ষা করা যায় তবে যে বাহ্য চেষ্টাও সমধিক কৃতিত্ব ও নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইরূপে আত্মচিন্তার অভ্যাস করিলে, বাহ্যতঃ যে কার্য্যটি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকেও আত্মশক্তিরই স্থূল বিকাশ রূপে স্পষ্ট অনুভব করিয়া সাধক বিকারের ভিতর দিয়াও অবিকারীকেই দেখিতে পাইবেন, এবং তাঁহার চিত্ত উত্তরোত্তর অন্তর্ম্মুখী হইতে থাকিবে। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত' (Practical Vedanta). বেদান্ত শাস্ত্রের এই সত্যটিকে লক্ষ্য করিয়াই স্বামিজী বলিতেছেন :—

* ভাবানুবাদ—যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং যে ব্যক্তি না জানিয়া করে, তাহারা উভয়েই বস্তুতঃ আত্মার শক্তিতেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, এই জানা ও না জানাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ফল প্রসব করে। আত্মার শক্তি অবগত হইয়া শ্রদ্ধা ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা সমধিক বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে।

"These conceptions of the Vedanta must come out, must remain not only in the forests, not only in the cave, but they must come to work out at the Bar and the Bench, in the Pulpit, and in the Cottage of the poor man with the fisher man that are catching fish, and with the students that are studying."*

বেদান্তোক্ত এই আত্মচিন্তাই ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনের একমাত্র মিলনভূমি। সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে আধ্যাত্মিকতার বীজ রোপন করিয়া ধীরে ধীরে সাধনার সলিল সেচন দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টাই বেদান্তের উপসনা কাণ্ডের একমাত্র অভিপ্রায়।

দ্বিতীয়তঃ—জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, বলবীর্য্য ও অভ্যুদয় সাধনের কথা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানুষের ভিতর যখনই যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এক একটি বিশেষ বিশেষ আত্মানুভবের ফল। 'সকলের ভিতর সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপ আত্মা 'চিৎ'রূপে সর্ব্বদা সমভাবে বিদ্যমান আছেন, প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহারই প্রকাশ হইতেছে'—বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত বাক্যে যাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে এবং সেই স্বাভাবিক আত্মানুভবটিকে অভ্যাস দ্বারা যিনি স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তিনি যখন যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, নিজেকে সেইরূপ ভাবে অনুভব করিয়া, সেইরূপ শক্তি অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারেন। যিনি দৈহিক বলের অভিলাষী তিনি আত্মাকে বলরূপে উপাসনা করুন। এই প্রকার যিনি যে শক্তির অভিলাষী তিনি নিজেকে সেইরূপ ভাবে অনুভব করিতে অভ্যাস করুন। বাস্তবিক পক্ষে, মানুষ যখনই যে শক্তির অনুশীলন করে তখনই সে একটা বিশেষ ভাবে আত্মানুভবেরই চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান তাহার ভিতরেই অনুভূত হইতেছে বাহিরের দিকটা সেই অনুভবেরই প্রকাশ মাত্র। না জানিয়াও মানুষ সেই সর্ব্বশক্তিমান আত্মাকেই বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া শক্তির প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু

* 'Vedanta in its application to Indian life" (Lectures from Colombo to Almora)

জানিয়া শুনিয়া সে যদি ভিতরে সেই শক্তিটিকে অনুভব করিতে প্রথম হইতেই সচেষ্ট থাকে তবে তাহার চেষ্টা আশুফলপ্রদ ও সমধিক বীর্য্যবান হইয়া থাকে। উপরে আমরা এ বিষয়ে শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। মহাবীর হনুমান অনন্ত বলবীর্য্য সম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রকে আপনার আত্মারূপে স্পষ্ট অনুভব করিতেন বলিয়াই তিনি অসাধ্য সাধন করিতেন। আত্ম-শক্তির নিকট অসাধ্য বলিয়া কোন কিছুই নাই, ইহাই বেদান্তের উপদেশ। আলোচ্য আখ্যায়িকার 'ফলশ্রুতি' গুলির কথা ভাবিয়া দেখিলে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অনন্তশক্তিসম্পন্ন আত্মাকে যিনি যে ভাবে অনুভব করিবেন তাহাতে সেই শক্তির বিকাশ অবশ্যই হইবে। শক্তি-প্রকাশের মূল আত্মপ্রত্যয়—বেদান্তের আত্মতত্ত্বে বিশ্বাস। আমাদের আজ অভাব হইয়াছে শক্তির, কিন্তু বাহির হইতে তাহা আসিবে না, অভ্যাস দ্বারা ভিতর হইতেই তাহাকে বিকাশ করিতে হইবে। এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই স্বামিজী তার-স্বরে বলিতেছেন:—

"Therefore my friends as one of your blood as one that lives and dies with you, let me tell you that we want Strength, Strength and every time Strength! And the Upanishads are the great mine of Strength Therein lies Strength enough to invigorate the whole world, the whole world can be vivified, made strong, energised through them

এবার তৃতীয় বা শেষ কথা—জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও তাহার সাধন।

জগতের সকলেই চাহিতেছে সুখ। কেন চাহিতেছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেককেই নির্ব্বাক হইতে হইবে। বৈ দুঃখ ত' কেহ চাহিতেছে না,—আর চাহিবেই বা কেমন করিয়া, দুঃখ বলিতে মানুষ সুখের অভাব ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারে না, সুখের তুলনায়ই দুঃখকে বুঝিয়া থাকে। সুখটা যেন তার নিজস্ব আর দুঃখটা যেন একটা আগন্তুক ভাব, সুতরাং দুঃখকে সে চাহিতেই পারে না। আর চাহিতেছে বলিয়া আপাততঃ যাহাকে মনে হয়, সেও কিন্তু দুঃখকে চাহে না, বস্তুতঃ অপরের নিকট যাহা দুঃখজনক, সে তাহারই ভিতর

অনুসন্ধান করিতেছে সুখ। সুখের ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ ধারণা-গুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া, মূল সুখানুসন্ধান ব্যাপারটার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা সকলেরই স্বাভাবিক—কোনওরূপ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নহে। মোট কথা, জন্মাবধি মানুষ স্বভাবতঃই ইহা বোধ করে যে, তাহার যেন কি একটা হারাইয়াছে, সেটা পাইলেই সে সুখী হইবে। সেই হারাণ ধনটিকে খুঁজিয়া খুঁজিয়াই মানুষ জীবনের সারাটি পথ অতিবাহিত করিতেছে। সৃষ্টির যদি একটা আদি থাকে তবে সে দিন হইতেই বোধ হয় এই খোঁজাখুঁজি চলিয়াছে,—এই হারাণধনের সন্ধানেই যেন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সেই হারাণ রতনের সন্ধান মানুষ পাইয়াছে কি? "পাইলাম" বলিয়া আজ যাহাকে আকড়াইয়া ধরিতেছে, কাল বুঝিতেছে সেটা ঠিক তার হারাণ ধনটি নয়। এইরূপে একটি ফেলিয়া আর একটি তুলিয়া অনাদিকাল ধরিয়া জগৎটা চলিয়াছে সেই হার ধনের সন্ধানে। উহাকে পূর্ণভাবে পাইয়া চিরদিনের তরে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে, এতটুকুও এদিক ওদিক হইতে না দিতে পারিলেই, বোধ হয় নিখিল বিশ্ব চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিত।

এই যে সুখের ধারণাটি, উহা যখন বাহির হইতে আসে নাই, মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিতরই যখন উহা স্বভাবসিদ্ধরূপে রহিয়াছে, তখন বাহিরে খুঁজিলে উহাকে পাওয়া যাইবে কি?—গলায় হার রাখিয়া, হারের সন্ধানে সারাগৃহ পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করাও যা, জগতের সুখের সন্ধানটাও বস্তুতঃ তদ্রূপ। রূপ-রসের বিপুল ... মানুষ ওলট-পালট করিয়া দেখিতেছে, কিন্তু সেই সুখের স্থির সন্ধান পাইয়াছে কি? মাঝে মাঝে রূপরসের ভিতর দিয়া তার একটু অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া মানুষ এক একবার "পাইলাম" বলিয়া হাত বাড়াইতেছে সত্য, কিন্তু সেটা বাস্তবিক পাওয়া না লুকোচুরী?—সেটা কিন্তু বাস্তবিক রহিয়াছে মানুষের ভিতরে। রূপ-রসের ভিতরে অনুসন্ধান করিতে করিতে, এক একবার তার অজ্ঞাতসারে মানুষ যেন ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে সুখের কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিতেছে, বাহিরে। আর তার স্মৃতি-টুকু লইয়া পাগল হইয়া ছুটিতেছে।

যে মুহূর্ত্তে মানুষ সুখের অনুভব লাভ করে তখন তাহার মনোবৃত্তিগুলি বাহিরের দিক হইতে ভিতরে প্রবেশ করে, ক্ষণিকের জন্য তাহার বাহ্য বৃত্তিগুলি ভিতরের দিকে গুটাইয়া আসিয়া একটা স্থানে স্থির হয়, তখনই ভিতরের সুখস্বরূপ বিদ্যুতের মত চকিতে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অনভ্যস্ত চিত্তবৃত্তিগুলি সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, উহারা আবার বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, আর সেই সুখের অস্পষ্ট স্মৃতিটুকু লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে। বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট সন্তানকে সহসা কাছে পাইয়া, স্নেহময়ী জননী যে সুখ অনুভব করেন, সে সুখটা তিনি পান তাঁহার অন্তর হইতে। "এই যে আমার বাপ্" বলিতেই তাঁহার সমস্ত বহির্মুখী বৃত্তিপ্রবাহ এককালে স্থির হইয়া যায়, অমনি ভিতরের শাশ্বত সুখস্বরূপটি ছাই চাপা আগুনের মত যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তখন সম্মুখে অবস্থিত পুত্রের অস্তিত্বও তাঁহার অনুভব হয় না। অনুভব হয় শুধু একটা আনন্দের। কিন্তু নানাপ্রকার বৃত্তিপ্রবাহের পুনরুন্মেষে আবার তাহা ঢাকা পড়িয়া যায়, তখন আনন্দ আর থাকে না, থাকে শুধু তার স্মৃতি। বেদ বলেন, পতি-পত্নীর দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে উভয়ের যে আনন্দ হয় তাহাও সেই আত্মানন্দেরই ক্ষণিক আংশিক স্ফুরণ মাত্র। সে সময়ে পতি পত্নীকে জানিতে পারে না, পত্নী পতিকে জানিতে পারে না, সমস্ত বাহ্য সংজ্ঞা বিলুপ্ত হওয়ায় তখন বুদ্ধিতে আত্মানন্দ প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। মোট কথা, মানুষ বিষয়-সঙ্গে যে আনন্দের আভাস মাত্র পাইয়া মনে করিতেছে, বিষয়-সংযোগে উহা 'উৎপন্ন' হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ ভিতরে সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিত আত্মানন্দেরই এক একটি অস্পষ্ট বিকাশ মাত্র। শুষ্ক মৃতাস্থি চর্ব্বন করিতে করিতে, নিজের দন্তমূল হইতে বিগলিত রক্তের আস্বাদ পাইয়া, কুকুর যেমন মনে করে, রক্তের আস্বাদটা সে চর্ব্বিত হাড় হইতেই পাইতেছে, মানুষও সেইরূপ নিজের স্বরূপ হইতে প্রকাশিত সুখের সামান্য আভাস মাত্র পাইয়া, মনে করে, উহা বিষয় হইতেই আসিতেছে, আর পাগল হইয়া, সুখের আধার সেই পরমাত্মার দিকে পিছন ফিরিয়া সুখের আশায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। হায় রে! যাহার আভাস-

মাত্রে জগৎটাকে এমনি ভাবে পাগল করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিলে যে কি হয় তাহা "বুঝে প্রাণ বুঝে যার" !!

সেই হ্রাস-বৃদ্ধিহীন পূর্ণ আনন্দকে পূর্ণভাবে লাভ করাই মানুষের উদ্দেশ্য। বুঝিয়া বা না বুঝিয়া সে তাহারই জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। যে ব্যক্তি একথা বুঝিয়া, বিষয়ের নেশা কাটাইয়া ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন, তিনিই মুমুক্ষু, ত্যাগী, বিবেকী, আর না বুঝিয়া বাহিরটাকে লইয়াই যাহারা ব্যস্ত, তাহারা বদ্ধভোগী, ভ্রান্ত প্রাকৃত জীব—তাহাদের সকল চেষ্টাই প্রাকৃত চেষ্টা, অতএব পরিণামে দুঃখপ্রদ। উল্লিখিত আখ্যায়িকাতে, মানুষের স্বস্বরূপ সেই পূর্ণ আনন্দ বা "ভূমা'কে লাভ করিবার উপায়ই আখ্যায়িকাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। উপায়, বুদ্ধিকে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী করিতে অভ্যাস করা। তাহার জন্যই একটির পর একটি করিয়া সূক্ষ্মতর তত্ত্বাবলম্বন আত্ম-চিন্তা অভ্যাসের উপদেশ। জীবনের প্রত্যেক স্তরেই সেইরূপ উপাসনার প্রারম্ভ হইতে পারে, তাহাতে যে জীবনটা পঙ্গু না হইয়া সকল অঙ্গে পূর্ণ হইয়াই উঠিতে থাকে, ফল-শ্রুতির প্রসঙ্গে একথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্য বিষয়গুলিকেই সার বলিয়া ভাবিয়া তাহাদের দিকেই মুখ ফিরাইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই বিবেক অসিটিকে সর্ব্বদা সুশানিত ও কোষমুক্ত করিয়া রাখার আবশ্যকতা।

যাহা হউক, আখ্যায়িকাতে বর্ণিত উপাসনা-ক্রমে অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে "ভূমা"কে অবগত হইতে হইলে প্রথমেই কি কি সাধনের প্রয়োজন আখ্যায়িকাতে সুস্পষ্টভাবে তাহা বিবৃত হইয়াছে। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"—হ্রাসবৃদ্ধিহীন, অপার অনন্ত, সমস্ত ভেদবুদ্ধির অতীত, আত্মানন্দই সুখ, বিষয় সুখ তুচ্ছ ও বিনশ্বর, "অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং"—এ কথাটি জানিলে তবেই অন্তর্ম্মুখিনতা অভ্যাসের প্রবৃত্তি হইতে পারে। ইহাই নিত্যানিত্য বস্তুবিচার। একটা বড় কিছুর সন্ধান পাইলে, যাহা ক্ষুদ্র তাহাতে আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেগুলি স্বভাবতঃই নিবৃত্ত হইয়া যাইতে থাকে, তাহাই 'কৃতি' বা শমদমাদি সাধন। সেই আকাঙ্ক্ষিত বড় বস্তটিকে লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিলেই মানুষ উপায়ের

অনুসন্ধানে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া উপযুক্ত উপদেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। তার পর নিষ্ঠার সহিত শুশ্রূষাদিতে রত থাকিলে ক্রমে উপদিষ্ট বিষয়ে শ্রদ্ধার উন্মেষ হইয়া উপদেশ দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। তখনই সকল চেষ্টার ভিতর উপদেশটিকে বজায় রাখিয়া সকল অবস্থায় তাহারই মননে ব্যাপৃত থাকা সম্ভবপর হয়। মননের দ্বারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। উপাসনা মননেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। মননই সকল প্রকার সিদ্ধির সাধারণ উপায়। এই মননকে আয়ত্ত করিবার জন্য উল্লিখিত ক্রমে সাধন অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লৌকিক ও পারমার্থিক সকল প্রকার সাধনাতেই এই ক্রমটি অনুস্যূত রহিয়াছে, কোন সাধনাতেই এই ক্রমের একটিও লঙ্ঘন করিবার জো নাই।

এইরূপে, বৈদিক সাহিত্যের সামান্য সামান্য আখ্যায়িকা বা রূপকের অন্তরালে যে কত আশ্চর্য্য দেশকাল-নিরপেক্ষ সত্যসমূহ নিহিত রহিয়াছে, শ্রদ্ধাসহকারে তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। পাশ্চাত্য মনীষিকেও তাহার আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া বলিতে হইয়াছে "উপনিষদ্ সমূহ সনাতন সত্যরাজির অফুরন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ।" চর্চ্চা ও শ্রদ্ধার অভাবে আমরা তাহা হারাইয়া উপায়ের অনুসন্ধানে মূর্খের মত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। শ্রুতির ভাষায় বলিতে গেলে ক্ষোভের সহিত বলিতে হয় আমাদের অবস্থা হইয়াছে—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

আমাদের সনাতন বৈদিক সত্যসমূহই দেশের বর্ত্তমান সমস্যা—এমন কি জগতের যাবতীয় সমস্যার—সমাধান করিয়া দিতে সমর্থ। মন্ত্র আমাদের রহিয়াছে, আজ চাই শুধু, দেশকালের উপযুক্ত পদ্ধতিতে যজ্ঞস্থলে তাহার অব্যর্থ প্রয়োগ-কুশলতা, অমেয়বীর্য্য, শুদ্ধ নিষ্পাপ, নিরাকাঙ্ক্ষ ঋত্বিকের দল! দেশবাসী কি এ মহাযজ্ঞের উদ্‌যাপন করিয়া তাহার অমোঘ ফল হস্তগত করিতে আজও পশ্চাৎপদ থাকিবেন?

মায়ার খেলা।

(শ্রীঅজ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সবে সুপ্রভাত। পুরীর অসংখ্য মন্দির হইতে মঙ্গলারতির শঙ্খ ঘণ্টা ও নহবতের তরল তান, লয়, মূর্চ্ছনা ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ তুলিয়া এই সবে মাত্র থামিয়াছে। ফেনশীর্ষ তরঙ্গরাজি চুম্বিত সমুদ্রের বালুকা বেলায় দণ্ডায়মান অসংখ্য নরনারী নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছে সীমাহীন উলঙ্গ সিন্ধুর সেই রুদ্র-মধুর নৃত্য। বালার্ক-কিরণ-সম্পাতে স্বর্ণাভ নীল জলের তরঙ্গ তুলিয়া উদধিবর কত ভঙ্গিমায় ছুটিতে ছুটিতে হাসিতে হাসিতে বেলাভূমি চুম্বনে ফাটিয়া পড়িতেছে, মুক্তাফলক সদৃশ কত শত জলকণা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কত নব নব রূপতরঙ্গের সৃজন করিতেছে, জলকণাবাহী মৃদুল মলয়ানিলের সহিত সুর মিলাইয়া সিন্ধুরাজ মেঘমল্লার রাগিনীতে কেমন দিবা রজনী করুণাময় জগন্নাথের স্তব করিতেছে—ইহা দেখিতে দেখিতে অসংখ্য নরনারীর চির-চঞ্চল মন সুখদুঃখ সম্পর্ক শূন্য অতিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আনন্দৈকরসপরিপ্লাবিত এক অভিনব রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সময়ের জন্যও এই স্থূল জগৎ হইতে বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। ঘননীল দিকচক্রবাল বেষ্টিত, সদা নৃত্যশীল উদধিবরের এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সুষমা দর্শনে সকল দর্শকই 'আপন-ভোলা' হইয়া যাইলেও ঐ অমার্জ্জিত দেহ, উন্মনা দৃষ্টি, ইতঃস্তত পরি-ভ্রমণশীল যুবককে দেখিয়া মনে হয়, কোন উপদেবতার সংস্পর্শে উহার হৃদয় এরূপ কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়া গিয়াছে যে প্রকৃতি দেবীর এই প্রাণমন বিমোহনকারী লীলা বৈচিত্র্যও তাহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই। কে এ যুবক, যাহার এই নব বিকসিত জীবন-কুসুম কোন্ ঊষর মরু তাপে বিদীর্ণপ্রায়, কে এ যুবক, যাহার সকল সুখ লালসা, সব খানি তুমুল হাস্য কোলাহল কোন্ এক অমানব পুরুষের তৃতীয় নয়ন বিচ্ছুরিত জ্বলীয়মান অগ্নিশিখা সম্পাতে পুড়িয়া ছাই হইয়া তাহার সমস্ত জীবনটাকে

কঠোর পরিহাসময় করিয়া তুলিয়াছে। তাহার দেহের প্রতি রোমকূপে বক্ষের প্রতি পঞ্জরে হৃৎপিণ্ডের প্রতি কক্ষে ধমনীর প্রতি বিন্দুতে, যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার দগ্ধ যন্ত্রনায় সে যেন উন্মত্ত হইয়া সমুদ্রের এই দিগন্ত প্রসারিত বেলাভূমিতে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত ছুটাছুটি করিতেছে। তবুও কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, লক্ষ্য করিলেও কেহ তাহার উপর মনযোগ দেয় নাই—কেবল একটী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, যাঁহার শীর্ণ দেহ-পিঞ্জর তাঁহার জীবন নাট্যের শেষ দৃশ্যের অভিনয়-কাল অতি সন্নিকট বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছিল, তিনি কৃপা পরবশ হইয়া এই বিশীর্ণ-বদন যুবকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছে'? যুবক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখের উপর দুটো ফ্যাল-ফ্যালে দৃষ্ট নিক্ষেপ করিয়া কহিল—"আমি মৃত্যু-যাত্রী, মৃত্যুর দেশ হইতে আসিতেছি মৃত্যুর দেশে যাইব বলিয়া।" সন্ন্যাসী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"সে কোথায় যুবক?" যুবক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল—ঐ নীল সিন্ধুর শীতল স্নেহময় ক্রোড়ে। মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী যুবকের হাত ধরিয়া অতি কাতর ভাবে বলিলেন,—"কেন বাবা জীবনে এরূপ হতাশ হইয়াছ? আমার সহিত চল, আমি তোমার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিব।" যুবক সশঙ্ক কণ্ঠে উত্তর করিল—"কেন সাধু, এই পাপাত্মার ঘৃণিত শরীর স্পর্শ করিয়া তোমার এই পবিত্র অঙ্গ কলুষিত করিতেছ?" সাধু প্রফুল্লহাস্য মুখে কহিলেন,—"কে পাপাত্মা বৎস, আমি দেখিতেছি তোমার মধ্যে যে সাক্ষাৎ জগন্নাথ বিরাজ করিতেছেন!" যুবক বলিল,"—না সাধু, যদি সাধ্য থাকিত তবে বুক চিরিয়া দেখাইতাম সেই পাপাত্মার ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি, দেখাইতাম হৃদয়ের স্তরে স্তরে কি গভীর ক্ষত করিয়া সে আমার সব শোণিত ধারাটুকু দিবা রাত্র শোষণ করিতেছে, দেখাইতাম কি বিভীষিকা মূর্ত্ত হইয়া আমার নয়ন সমক্ষে অবিরাম নৃত্য করিতেছে। সে কি একদিনের? কত দিনের, কত রাশি রাশি পাপ জমাট বাঁধিয়া আমাকে অহর্নিশি দগ্ধ করিতেছে তাহা কি তুমি জান সাধু? যাও, আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও—আমাকে নির্ব্বিঘ্নে মরিতে দাও। হে ভগবান্,

মরিয়াও কি আমায় শান্তি পাইতে দিবে না?" সন্ন্যাসী আর থাকিতে পারিলেন না—গভীর সমবেদনায় নয়নাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে তিনি যুবককে বাহু পাশে জড়াইয়া ধরিলেন।

*　　*　　*

এই যুবক আর কেহ নহে, ইনি যদু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্র ও তারাসুন্দরীর তনয়—আমাদের সেই হারাধন। চক্রান্ত করিয়া সন্ন্যাসী ও গিরিবালাকে অমানুষিক ভাবে নির্যাতিত করিবার পর হইতে তাহার সকল সুখে ভাঙ্গন ধরিল। তাহার যথাসর্ব্বস্ব নিলাম হইয়া গিয়া সে সর্ব্বস্বান্ত হইল, বন্ধুগণও সকলেই একে একে তাহাকে পরিত্যাগ করিল। অসংখ্য পাপাচারের অনুশোচনা-রূপ শত শত বৃশ্চিক দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া উন্মাদবৎ দেশ হইতে দেশান্তরে সেই নির্যাতিত সাধুর সন্ধানে ঘুরিয়া কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না—অবশেষে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে পূর্ব্বোক্ত সহৃদয় সাধুটী হারাধনকে চরণে স্থান দিলেন। জগন্নাথের অপার করুণায় ও সন্ন্যাসীর প্রেমপূর্ণ শিক্ষায় হারাধন শান্তিলাভ করিতে আরম্ভ করিল। সে দুই বেলা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে এবং নিয়মিত রূপে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার স্মরণ-মনন সমাপন করিয়া সমস্ত দিনই সাধুর সেবায় ব্যস্ত থাকে। এইরূপে ধীরে ধীরে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। সাধু বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না—বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হারাধনকে যে বলিয়াছিলেন,—"বাবা, আমি তোমার তাপদগ্ধ জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিব" তাহা সে অন্তরে অন্তরে অনেক পরিমাণে অনুভব করিয়াছে,—কিন্তু সেই সাধু ও সেই সতীসাধ্বী গিরিবালার উপর অমানুষিক অত্যাচারের অনুতাপ তাহার প্রাণের মধ্যে যে রাবণের চিতা জ্বলিয়াছিল তাহা যে আর নির্ব্বাপিত হয় না। 'সাধু নিশ্চয় ক্ষমা করিবে, কিন্তু গিরিবালা? গিরিবালা কি তৎকৃত সমস্ত অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া তাহার সকল অপরাধ, তাহার সকল পাপ মার্জ্জনা করিতে পারিবে? যদি আমি তাহার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—"গিরি, বোন্ আমার, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্, আমায় মরিয়া শান্তি লাভ করিতে দে" তবুও কি গিরিবালা আমায় ক্ষমা করিবে না?'

যদি না করে—হারাধন সঙ্কল্প করিল তবে এ দুঃসহ পাপ জীবন রাখিয়া আর কাজ কি? তাহারই সম্মুখে সে এ পাপলীলার অবসান করিবে। হারাধন একদিন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—'বাবা, অনেক দিন বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, একবার বাড়ী যাইব।' সাধু সহাস্য বদনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"এস বাবা, জগন্নাথ তোমার মঙ্গল করুন।"

হারাধন দিবারাত্রি হাঁটিতে হাঁটিতে চলিয়াছে। তাহার অনভ্যস্ত পদ দুটী অতিরিক্ত শ্রমজন্য ফুলিয়া গিয়াছে। অনাবৃতদেহ—সমস্ত শীতাতপ সে অম্লান বদনে সহ্য করিতেছে। একদিন মধ্যাহ্নে হারাধন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। যখন পুনরায় সংজ্ঞা হইল তখন সে দেখিল সে বৃক্ষতলে নহে। একটী পরিত্যক্ত অট্টালিকায় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে এবং অনুভবে বুঝিতে পারিল কে যেন তাহার কপোল দেশে কোমল হস্ত বুলাইয়া তাহার সর্ব্ব শরীরের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শীতল করিয়া দিতেছে। হারাধন চক্ষু মেলিয়া চাহিল—দেখিল এযে তাহার মূর্ত্তিমতী জননী। তাহার পরলোকগতা জননীর সহিত দেহের বিশেষ কোন সৌসাদৃশ্য না থাকিলেও হারাধন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিল এযে তাঁহারই মত স্নেহময়ী। রোগশয্যায় শায়িত হারাধনের মনে পড়িল সেই বাল্যকালের কথা। সেই যখন একটী দুরন্ত বালক মারামারি ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া স্তিমিত সন্ধ্যাবেলায় জনীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িত, তখন তাঁহার স্নেহভরা নিবিড় চুম্বন রাশি স্বর্গের সকল সুখ মর্ত্ত্যে টানিয়া আনিয়া তাহার হাসিকান্নার অভিনয়ের সকল শোকভরা স্মৃতিটুকু যে চিরতরে তাহার মন হইতে মুছাইয়া দিত, মনে পড়িল কত দুঃখ রজনীর কথা—একটী বালক দুরন্ত রোগের তীব্র যাতনায় জর্জ্জরিত হইয়া যখন দীর্ঘ রজনী ব্যাপিয়া বিছানার উপর আর্ত্তনাদ করিত —তখন কে একটী মানবী না দেবী বিশুষ্ক বদনে, নিদ্রাহীন নয়নে, আলু থালু বেশে রাত্রির পর রাত্রি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অমৃত শীতল করস্পর্শে তাহার সকল দুঃখরাশি অপহরণ করিত। তবে এ কি

তাহারই জননী?—সন্তানকে মৃত্যু শয্যায় দেখিয়া পরলোক হইতে নরলোকে নামিয়া আসিয়াছেন? হারাধন মনে বল আনিয়া অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'কে মা তুমি?' ধীরে উত্তর আসিল—"আমি তোমার মা।" যাহা হউক এই দেবীর অদ্ভুত সেবা ও যত্নে হারাধন শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিল। এই দেবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ গন্তব্যাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য একদিন সে তাহার নিকট গিয়া বলিল—"মা—তোমার সেবা-যত্নে আমি এবার প্রাণ পাইলাম—মা, আমার জীবনদায়িনী—বলিতে হইবে তুমি কে?" দেবী ধীরে নতমুখে উত্তর করিল—"আমি গিরিবালা।" হারাধনের সমস্ত শিরায় শিরায় তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল—তাহার দেহের সমস্ত রক্তস্রোত জমাট বাঁধিয়া বক্ষস্থলে তীব্রভাবে আঘাত করিতে লাগিল, হারাধন দুর্ব্বলতা সংযত করিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রাণদায়িনী বোন্, তুমি কিরূপে এখানে?" গিরিবালা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল—"সে অনেক কথা হারাদাদা, জাতিপাতিত হবার কয়েক মাস পর গৃহবাস অসহ্য হওয়ায় তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হই। জগন্নাথ দর্শন করিয়া পায় হাঁটিয়া কাশী যাইতেছিলাম—পথে এইখানে বাবা জগন্নাথ-দেবের কৃপায় হটাৎ সেই জটাধারী সন্ন্যাসীব দর্শন পাই। তিনি আমায় আদেশ করিলেন—"মা আর কাশী যাইবার প্রয়োজন নাই। এইখানেই থাক, যে সব যাত্রী পথ হাঁটিতে হাঁটিতে রাস্তায় অসুস্থ হইয়া পড়িবে তাহাদের তুমি কায়মনোবাক্যে সেবা শুশ্রূষা কর, আর অস্পৃশ্য বর্ণের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেব লেখাপড়া শিখিয়ে, সুশিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মানুষ করে তুল, তা'হলে এখানে বসিয়াই তুমি শিব-দর্শনের ফল পাইবে"—হারাদাদা, সেই থেকে আমি এইখানেই আছি। হারাধন জিজ্ঞাসা করিল—"আমি এখানে আসিলাম কিরূপে?" গিরিবালা বলিল—"তুমি গ্রামের পার্শ্বে বৃক্ষতলে, জ্বরবিকারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলে—স্বামিজী তোমায় দেখিতে পান—তোমাকে তুলিয়া আমার নিকট শুশ্রূষার ভারার্পণ করিয়া যান।" হারাধন ধীরভাবে উত্তর করিল—"তিনি কোথায়" গিরিবালা উত্তর করিল—"নিকটেই

তাঁহার কুটীরে।" হারাধন নতজানু হইয়া করজোড়ে গিরিবালাকে বলিল—"বোন্ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমায় শান্তি দে"—গিরিবালা ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল—"সে কি হারাদাদা—তোমার আবার অপরাধ কি? মা যে তোমার অপরাধ বহুদিন ক্ষমা করিয়াছেন।"

হারাধন সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হওয়ায় গিরিবালা তাহাকে নিকটস্থ কুটীরে লইয়া গেল, হারাধন সন্ন্যাসীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তার পর হারাধন অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে সন্ন্যাসীকে বলিল—"বাবা আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুণ, আমায় রক্ষা করুণ।" সাধু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—"বৎস, আমার কাছে ত তুমি কখনও কোন অপরাধ কর নাই।" হারাধন কাতরভাবে বলিল—"অনুতাপানলে আমার হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আমায় শান্তি দিন।" সাধু তাহার দিকে একবার সহানুভূতিপূর্ণ নয়নে চাহিয়া শান্তভাবে বলিলেন—"গিরিবালা যে কর্ম্ম করিতেছে তুমিও নিষ্কামভাবে জগজ্জননীর সেই কর্ম্ম কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠান কর—বৎস, তাহা হইলেই প্রাণ পাইবে—শান্তি পাইবে।"

ইচ্ছা সৃষ্টি।

(আনন্দ চৈতন্য)

ইচ্ছা মাত্র একে একে হইল উদয়,
প্রাণ মন, দেহ আর ইন্দ্রিয় নিচয়।
আকাশ, পবন, জ্যোতি উঠিল ফুটিয়া
কল্ কল রবে জল আসিল ছুটিয়া
দেখিতে দেখিতে কিবা পরম সুন্দর
হাসিতে লাগিল পৃথ্বী পূর্ণ কলেবর।

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

(৭)

"শ্রদ্ধা" শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

নচিকেতার শ্রদ্ধার উদয় হইল।—উপরে লিখিত এই "শ্রদ্ধা" শব্দটীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। অনেক সময় সকল শব্দের অর্থ ঠিক্ ঠিক বুঝান যায় না, কিন্তু বুঝা যায়। গীতা যে কি ভাবকে 'যোগ' বলিয়াছেন এবং 'ভক্ত' অর্থেই বা কি বুঝাইয়াছেন, তাহা যেমন মনের মধ্যে অনুভব করা যায়, কোন ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়া, তেমন ভাবে বুঝাইতে পারেন না। অতএব, আগে একবার যেমন বলা হইয়াছে—'যোগ' অর্থে কোন এক গভীরতম ভাবের সহিত অন্তরের একান্ত সংযোগ, শ্রদ্ধা সম্বন্ধেও সেইরূপ ভাবেই মাত্র বলিতে পারি, যে, তাহা এমন এক ভাবময় অনুভূতি, যাহা তুচ্ছত্বের আবরণ হইতে তাহার প্রাণস্বরূপ মহান্ বস্তুটীই গ্রহণ করে। কর্ম্ম-জগতে সর্ব্বত্র এই ভাবময় অনুভূতিই প্রাণস্বরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, দয়া সেই অনুভূতির নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশের কতকগুলি সংজ্ঞা মাত্র। এই অনুভূতি যথায় প্রতিভারূপে দীপ্যমান, বুদ্ধি সেখানে স্তব্ধ, যেখানে কঠোর দুঃসাহসের অনল রূপে প্রদীপ্ত, বিবেচনা সেখানে মূক, প্রেমের দিব্য আলোকে যেখানে উজ্জ্বল, মৃত্যুর অন্ধকার সেখানে অন্তর্হিত। যেন তাহা কর্ম্মযজ্ঞের হোমাগ্নিরূপে কর্ম্মীকে আহ্বান করে "এস বীর আহুতি দাও, এই পবিত্র যজ্ঞাগ্নিতে জড়সম্পর্কীয় সুখ, সম্পদ, বাসনা যাহা কিছু অবিবেচনার আহুতি দাও, ক্ষুদ্র আমিত্বকে আহুতি দিয়া আত্ম বিসর্জ্জনে বৃহত্তর আমিত্বের নবজীবনে সঞ্জীবিত হও।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বিবেচনা ও অবিবেচনা প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি,—শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। এই দুঃসাহসের মধ্যে প্রবল অবিবেচনা আছে। যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া

তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। বিজ্ঞ মানুষের ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙ্গিয়া, পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিক নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলা ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দেয় ইহারাই।"

স্বল্প কথায় কি সম্পূর্ণ চিত্র! লক্ষ্মীছাড়া না হইলে আর কে সিন্ধুকের ভিতর হ তে লক্ষ্মীকে বাহিরে আনিয়া জগৎ শতদলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে? কৃপণের পক্ষে কি তাহা সম্ভব—জীবনকে যাহারা ছিন্নবস্ত্রের সহস্র সতর্কতার গ্রন্থিবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে যায়? অবিবেচক মৃত্যুবিলাসী ব্যতীত আর কে তাহাদের বাঁচিবার প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতে পারে?

ইতিহাস এই দুঃসাহসের সাক্ষী স্বরূপ। বুদ্ধিমান যেখানে অনায়াসে আপনাকে বাঁচাইয়া যাইতে পারে, দুঃসাহসী নিজের খেয়ালে কেন যে সেখানে নিজের মাথা মৃত্যুর সম্মুখে হাসিমুখে উপহার দেয়, ইহার রহস্য বলা বড় কঠিন। "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এই সত্য আবিষ্কারের ফলে গ্যালিলিও ধর্ম্মদ্রোহীর কারাগারে রুদ্ধ হইলেন। এক বৎসর কারাবাস ক্লেশ ভোগের পর পোপ যখন তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিলেন "যদি আপনি স্বীকার করেন যে পৃথিবী স্থির ভাবেই আছে, তবে অগ্নিদাহের মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।" উত্তরে গ্যালিলিও গর্ব্বিতভাবে ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "হাঁ, এই পৃথিবী ঘুরিতেছে।"

শিখ সর্দার তরুসিংহকে মোগল সম্রাট বলিলেন "তরুসিং, তোমার উপর আমার কোন শাস্তি দিতে ইচ্ছা নাই, কেবল এই আমার অনুরোধ যে, তোমার বেণীটী কাটিয়া দিয়া যাও।" তরুসিং হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বেশ, বেশ, তুমি যখন চাহিয়াছ তখন আরও কিছু বেশী দিব। কেবল বেণী কেন, মাথাটী শুদ্ধ দিতেছি।" তরুসিং অবশ্য পরিহাস করিয়া বলেন নাই, সত্য করিয়াই বলিয়াছেন। কোনরূপে মাথাটী রক্ষা করিয়া যে পরে তাহা কাযে লাগাইবেন এমন বিবেচনার কথা তাঁহার মাথায় উদয় হওয়া অসম্ভব, কেন না তাঁহার বিবেচকের মাথা হইতে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত।

এখানে দুটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, একটী অবিবেচনা আর একটী গর্ব্ব। দুয়েতেই যেন এক "থাতিরনাদারত ভাব" অর্থাৎ কোন কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না। দুঃসাহস, এই গর্ব্বেরই একটী অঙ্গ। এ গর্ব্ব—অহমিকাজাতদম্ভ নহে, কিম্বা সেই শ্রেণীস্থ কোন ক্ষুদ্রভাব নহে, অথচ ইহা গর্ব্ব। এ গর্ব্ব বাহিরের বিষয়-সমূহের অনুকূলতা-প্রতিকূলতার অপেক্ষা রাখে না, আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ, আপনাতেই আপনি গর্ব্বিত। পরম বিনয়ী সক্রেটিসও এই গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন, তাঁহার বিচারকালে তাঁহার "এথেনীয়গণের প্রতি" উক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্রান্সের ভূমিতে এই গর্ব্বের বীজ এক সময় নানাক্ষেত্রে নানাভাবে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কারিকর বানাড পলিসী কঠোর সাধনায় এনামেলের পুনরাবিষ্কার করেন। পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য ও রিক্ত-সম্বল হইয়াও পলিসী তাঁহার সাধনার পথ হইতে চ্যুত হন নাই। নিজে দরিদ্র, জমীমাপ প্রভৃতি সামান্য কার্য্য করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, এনামেল আবিষ্কার করিবার পরীক্ষাতেই তাহা ব্যয় হইয়া যাইত। ইহাতে তিনি দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিবারের অন্নবস্ত্রের কষ্টের জন্য স্ত্রীর নিকট সর্ব্বদা লাঞ্ছিত হইয়া এবং অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াও তাঁহার উদ্যমের নিবৃত্তি হয় নাই। একবার তিনি ছয়দিন ছয়রাত্রি ক্রমাগত চুল্লীর পার্শ্বে বসিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপিও দুর্ভাগ্যক্রমে এনামেল গলাইতে পারেন নাই। এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আবার কিছুদিন অতি কষ্টে নানা উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া কিছু টাকা জমাইলেন, কিন্তু সে সামান্য অর্থে কুলাইল না। শেষে এক বন্ধুর নিকট কিছু ধার পাইয়া সেই অর্থে আবার নূতন উপাদান সংগ্রহ করিলেন, এবং নবোৎসাহে পুনরায় পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্নি জ্বলিল, কিন্তু প্রবল তাপেও এনামেল গলিল না, কাঠ ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া অনন্যোপায় পলিসী ক্রমশঃ বাগানের বেড়া, দুয়ার, জানালা ও আসবাব পত্র ভাঙ্গিয়া আগুনে আহুতি দিতে লাগিলেন। ব্যাপার দেখিয়া পলিসী পাগল হইয়া গিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার স্ত্রী ও

সন্তানেরা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং প্রতিবাসীরা ছুটিয়া আসিল। অবশেষে অগ্নিদেব প্রসন্ন হইলেন, উত্তাপে উপাদান সমূহ গলিয়া এনামেল প্রস্তুত হইল। এই কর্ম্মযজ্ঞের কঠোর সাধক বৃদ্ধবয়সে তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় হেনরী কর্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। হেনরী স্বয়ং তাঁহার সহিত কারাগারে গোপনে দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধায় নূতন মত ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যখন বলিলেন—"পলিসা তুমি অতি সৎ এবং ৭৫ বৎসর আমার ও আমার জননীর অধীনে বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিয়াছ. এই জন্যই এই নূতন ধর্ম্মে আসক্তিরূপ তোমার যে গুরুতর অপরাধ তাহা আমরা এতদিন সহ্য করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখন আমি তোমাকে তোমার শাস্তি-দাতাদের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছি। আগামী কল্যের মধ্যে যদি তোমার মত পরিবর্ত্তন না কর তবে তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে।" তখন সেই কর্ম্মবীর বৃদ্ধ গর্ব্বের সহিত উত্তর দিলেন "মহাশয়, ভগবানের মহত্ত্ব প্রচারের জন্য জীবন বিসর্জ্জনে আমার দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। আপনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন যে, আপনি আমাকে কৃপা করেন, কিন্তু এখন আমিই আপনাকে কৃপার পাত্র মনে করিতেছি, যেহেতু আপনি বলিতেছেন 'আমি বাধ্য হইতেছি'। মহাশয় এই কথাটী ঠিক রাজার মত বলা হয় নাই। কি আপনি, কি সেই অভিজাত সম্প্রদায়, অথবা guiseএর দল—যাহারা আপনাকে বাধ্য করিতেছে,—আমার উপর কেহই এরূপ প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে না, কেন না কিরূপে মরিতে হয় তাহা আমি জানি।"

(৮)

বিষাদ-যোগ না আনন্দ-যোগ ?

যখন ইতিহাসে এই সব বীরচরিত পাঠ করি তখন আমাদের প্রাণে কেমন এক আনন্দের ভাব জাগিয়া উঠে। দুর্গম পন্থা, দুঃসহ দুঃখ, দুর্ব্বহ ভার, ইহার সহিত আনন্দের কি যোগ। বিষাদের আঘাতে সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গে যে জাগরণ, তাহার সহিত আনন্দের কি সম্বন্ধ ? নিশ্চিন্ত জীবন, প্রিয়জনের বাহুবন্ধন, আরামের কোমল শয্যা, লোক প্রতিষ্ঠা,

সম্পদ গৌরব, ইহার পরিবর্ত্তে দারিদ্র্য, প্রিয়বিরহ, লোক গঞ্জনা, দুঃখময় জীবন, স্বেচ্ছায় কে কামনা করে? তবু মানব সকল সময়ই নিঃস্বার্থভাবের নিকট মস্তক নত করিয়াছে, স্বার্থপরতার নিকট করে নাই,, মহত্বকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, নীচত্বকে কখনও ভয়ের ঊর্দ্ধে অপর কোন সম্মান দিতে পারে নাই, যে দুষ্কৃত, সেও নিজের অন্যায় কখনও মনের সহিত অনুমোদন করিতে পারে নাই, অসীম সম্পদশালী সাংসারিক সর্ব্বসুখে সুখী ব্যক্তিও পরকল্যাণে সর্ব্বত্যাগার প্রতি ঈর্ষাতুর নেত্রে চাহিয়াছে। নষ্টস্মৃতি ফিরিয়া পাইবার জন্য যেমন অহরহঃ ব্যাকুলতা জাগিতে থাকে, অথচ কিসের ব্যাকুলতা নিজে সে জানে না, সেইরূপ ধন মান-সম্পদে বেষ্টিত হইয়াও মানবের চিত্তের অতৃপ্তি দূর হয় না। তাই যদি কোন উপাখ্যানে শুনি, ইতিহাসে পাঠ করি বা ভাগ্যক্রমে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে কোন বীর এই সমুদায়ের নিবিড় বেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়াছেন, তাহা হইলে আমরাও যেন একটা পথ দেখিতে পাই।' যে, সঞ্চয়ের জন্য আমরা চিরদিন প্রাণপাত করিয়া আসিয়াছি, তুচ্ছ লোষ্ট্রখণ্ডের মত একমুহূর্ত্তে তাহা দূরে নিক্ষেপ করি,—যেন আমরা এই সব বোঝা ফেলিয়া দিয়া ত্রাণ পাই। কৃপণ সর্ব্বস্ব বিলাইয়া, ভীরু বিপদে ঝাঁপ দিয়া যেন, যে ভার তাহাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া যায়।

চল, চল, আগে চল, আরও আগে আরও আগে।
না জানি কি মধুর ভাষা প্রাণের ভিতর হাসে।
না জানি কি আলো এক চোখের উপর ভাসে।
ভাষা সে মধুর ভাষা আমিও বুঝিনা ভাল।
আমি অন্ধ তবু কিন্তু আলো সে উজ্জ্বল আলো।
তাইত গো অবিরাম চলিয়াছি দিশাহারা।
তাইত গো হেথা হোথা ছুটেছি পাগল পারা।

শিশুর অকাল মৃত্যু।

(শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম, বি।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আরও কতকগুলি কারণ ও তাহার নিবারণের উপায় দেওয়া হইতেছে—

(৪) বাল্যবিবাহ—

স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলিয়াছেন যে "এ দেশের লোকে ১২ বৎসরের মেয়ে বিবাহ করে" ইত্যাদি। কথাটি খুবই ঠিক। আমাদের দেশে কৈবর্ত্ত, গরাইদের মধ্যে এবং অনেক নিম্নতর মুসলমানদের মধ্যে দেখিয়াছি যে সাত, আট বৎসরের মেয়েদেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আবার বার, তের বৎসরের বালিকাদের মা হইতে দেখা যায়। মা হওয়ায় যে কত দায়িত্ব তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এরূপ কচিবয়সে মা হইলে তাহারা সে দায়িত্ব বুঝিবে কোথা হইতে? এই সব কচি মেয়েদের খাওয়া পরা আর একজন দেখিলেই ভাল হয়, সেইস্থানে তাহাদের দ্বারা একটী শিশুর যত্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে মেয়েরা যত আমোদে থাকিতে পারে, যত ভাল খাইতে পায় এবং যত মানসিক চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পায় ততই তাহাদের দেহের এবং মনের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বয়সে ছেলের মা হইয়া ফলে এই হয় যে উপযুক্ত বিশ্রাম ও আরাম না পাওয়ার দরুণ তাহারা অকালে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। একটী ছেলে মানুষ করিতে যে কত মানসিক অশান্তি—রাত্রে উপযুক্ত ঘুম হয় না, ছেলের অসুখ হইলে কি কষ্টই পাইতে হয়—তাহা মা মাত্রেই অবগত আছেন। ফলে ছেলেটী উপযুক্ত যত্ন ও লালনপালনাদির অভাবে হয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না হয় ক্ষীণাঙ্গ হইয়া থাকে।

ডাক্তারী হিসাবে মা যত অপরিণত বয়স্কা হন ছেলেও সেই হিসাবে

অপুষ্ট হয় অর্থাৎ সতর, আঠার বৎসর বয়স্কা মা হইলে ছেলে যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বার, তের বৎসরের মেয়ে মা হইলে সন্তানের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সেরূপ হয় না। ফলে সে যে কোন রোগেই অতিশীঘ্র আক্রান্ত হয়, কারণ এই সব অপরিণত শিশুদের জীবনীশক্তি অতি অল্প। ভগবানের রাজত্বে প্রত্যেক জিনিষেরই একটী সময়াসময় আছে—। অল্প বয়স্কা মায়েদের স্তন প্রায়ই থাকে না—তাহাও এই অপরিণত শিশুদেব মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কাবণ।

সুতরাং আমাদের সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য পুত্র কন্যাদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি কবা। আমার মতে অন্ততঃ ষোল বৎসবেব আগে কোন কন্যারই মা হওয়া উচিত নহে।

(৫) দেশে সর্ব্বসাধারণেব ক্রমশঃ ধর্ম্মহীনতা—

এইটিই আমার মতে শিশুর অপমৃত্যুব প্রধান কাবণ। যে ভারতবর্ষ এক সময়ে আধ্যাত্মিকতাব চরম সীমায় উঠিয়াছিল আজ তাব একি জডতা। ইযুরোপের চাকচিক্যময়জডবাদেব সংঘর্ষ এবং তাহার অন্ধ অনুকরণের এই পরিণাম। আজ ইয়ুবোপবাসীদেব মত আমবা মানুষকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করি তাহার বাহিব দেখিয়া। ভিতবে যদি তাহাব সমস্ত হৃদয় পাঙ্ক কলুষিত হয় তাহা দেখি না। অথচ এক দিন ছিল যখন নগ্নপদ উত্তরীয় সম্বল ব্রাহ্মণকে আমরা ভক্তি করিতাম শুধু তাহার চরিত্র দেখিয়া। চরিত্র জিনিষটী—বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষাভিমানী আমবা—শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভের প্রধান সোপান ইহা জানি না। দোষ কাহারও নয় কারণ আজকাল আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে কতকগুলি নাস্তিক বা অধার্ম্মিক লোকেরই সৃষ্টি হইতেছে বই আর কিছুই নয়, আরও সৃষ্টি হইতেছে কতকগুলি ভিক্ষুকের দল। শিক্ষা পাইয়া, এম্, এ, এম, বি, পাশ করিয়া, এই লাভ হইতেছে যে আমরা নিজেদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক সময় লোকের চক্ষে বেশ ধূলি দিতে শিখিয়াছি, আর শিখিয়াছি তর্কের দ্বারা প্রমাণ করিতে, চরিত্র না থাকিলেও চলে। কিন্তু আমার মনে হয় যে ধর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্ম কখনও সম্ভব হয় না। দুঃখের বিষয়, এই

ধর্ম্মহীনতার বীজ আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্কুল ছেলেদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের একেবারে কলুষিত করিতেছে।

ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে রবিবারে রবিবারে একবার করিয়া গির্জ্জায় যাওয়ার প্রথা আছে। মুসলমানদের মধ্যেও শুক্রবার শুক্রবার মস্‌জিদে প্রার্থনার নিয়ম আছে। আর আমাদের ধর্ম্মশিক্ষার যে কি উপায় আছে জানি না। আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম যাঁহাদের হাতে, বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ের পুরোহিতগণের জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য এত অল্প যে তাঁহাদের কাছে কোন সৎশিক্ষা পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। বলিতে চাই না যে তাঁহাদের মধ্যে ভাল লোক নাই কিন্তু ক্রমশঃই তাহার সংখ্যা কমিয়া কমিয়া একেবারেই লোপ পাইতেছে, ইহার জন্য দায়ী আমরা এবং আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা। কারণ লোকে দুই বেলা, স্বচ্ছন্দচিত্তে পেট ভরিয়া না খাইতে পাইলে কেহই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে না। এই অভাবগ্রস্ত হইয়া অনেক পুরোহিতই নিজেদের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি ধর্ম্মসমিতির নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁরা যেন বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের এই অভাব মোচনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা যেন পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া সেবাধর্ম্মের সহিত এই জ্ঞানধর্ম্মের প্রচার করেন। তাহা হইলে দেশের একটী মহৎ উপকার করা হয়। আমার এসব অবান্তর কথা নয়, শিশুর অপমৃত্যুর সহিত ইহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম। কারণ এই চরিত্রহীনতার ফলে বর্ত্তমান সমাজে দুইটী ভয়ানক জঘন্য-ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

তাহা ছাড়া বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের মধ্যে আরও নানা প্রকার কুৎসিৎ ব্যবহার এবং অনৈসর্গিক প্রথার প্রচলন ফলে যে কত শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

(ক) সিফিলিস্—এই রোগ প্রথমতঃ পিতার হয়। ক্রমে পিতা হইতে এই বিষ মাতার শরীরে সঞ্চারিত হয়। এই রোগ এত

ভীষণ যে বিশেষ ভাবে চিকিৎসিত না হইলে পৌত্রাদিতেও প্রকাশ পায়। এই যে মৃতবৎসা রোগ যাহাতে ছেলে জন্মিয়াই মারা যায় অথবা প্রায়ই মৃত সন্তান প্রসব হয় তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই রোগ। এই রোগ মায়ের ও বাপের উভয়েরই হইলে কখনও সন্তান জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় না—বিশেষতঃ তাহারা যদি উপযুক্ত ভাবে চিকিৎসিত না হয়। আরও দুঃখের বিষয়, প্রায়ই দেখা যায় যে লজ্জাবশতঃ রোগীরা, বিশেষতঃ মেয়েরা, রোগের প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হন না; প্রায়ই হাতুড়ে বৈদ্য দিয়া চিকিৎসিত হন। ফলে আসলরোগ শরীরের ভিতরই থাকিয়া যায়। এই রোগে আক্রান্ত লোকদের সন্তানেরা মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ না হইলেও প্রায়ই ১০।১৫ দিনের মধ্যে গায়ে ক্ষত হইয়া বা অন্য প্রকারে মারা যায়। পিতা মাতার শরীরে এই বিষ অল্পভাবে সঞ্চারিত থাকিলেও বা তাঁহারা চিকিৎসিত হইলেও শিশুরা প্রায়ই ক্ষীণাঙ্গ হয় এবং তাহাদের জীবনীশক্তি কিছুই থাকে না। নিজের ক্ষণিক সুখের জন্য রোগ ক্রয় করিয়া আনিয়া অবলা স্ত্রীলোকদের চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যহীনা করিতে এবং সবল নিষ্পাপ শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ হইতে কি এই সব পুরুষ পশুদের একটুকুও লজ্জা হয় না।

(খ) গণোরিয়া রোগও অতি ভয়ানক। সদ্যোজাত শিশুদের মধ্যে যাহারা অন্ধ হয় তাহাদের শতকরা ৮০টীর কারণ এই রোগ। জন্মিবার ২।১ দিন পরেই শিশুর চোক পিচটাইতে থাকে এবং শীঘ্র উপযুক্ত চিকিৎসা না করাইলে শিশুটী অন্ধ হইয়া যায়।

পরিতাপের বিষয়, এই রোগ দুইটী শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ধনী বা নির্দ্ধন সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। হায়রে আধুনিক সভ্যতা। যাহার ফলে মানুষকে পশু করে ও এতদায়িত্ব জ্ঞানহীন করে!! তোমার ক্ষণিক সুখের জন্য যে তোমার বংশলোপ হইতে বসিয়াছে, তোমার যে জাতিলোপ হইতে বসিয়াছে!!!

(৬) ব্রহ্মচর্য্যের অভাব :—

এই অভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। সংযম জিনিষটা এখন একটা হাস্যস্থলে দাঁড়াইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অনশন, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ একদিকে স্বাস্থ্যহীন করিতেছে, অপর দিকে ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা ফলে সুস্থ সবলকায় মা প্রায়ই উপকথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতায় আমরা অত্যধিক হীনবীর্য্য এবং তাহার ফল আমাদের অপদার্থ শিশুর জনকত্ব। আমার বোধ হয় যত প্রকার স্নায়বিয় দুর্ব্বলতায় আমরা জর্জ্জরিত এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। প্রায়ই দেখা যায় আঠার, উনিশ বৎসরের যুবক খিট্‌খিটে, অল্পেই রাগিয়া উঠে, মুখে সে স্বর্গীয় লাবণ্য নাই, কাজে উৎসাহ নাই, অনুসন্ধান করুন দেখিবেন দেহে তাঁহাদের আদৌ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা নাই। আমার কাছে এই সব রোগীরা আসিলে আমি বলি যে মনের যাতে উন্নতি হয় করুন, ঔষধের দরকার নাই। এরূপ ভাবে যে কত শত যুবক তাহাদের দেবতা দুর্লভ মন ও দেহ ঐ বিষাগ্নিতে আহুতি দিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অশ্লীলতার দোহাই দিয়া এই সব বিষয়ের আলোচনায় উদাসীন থাকিলে চলিবে না। এই সব ভগ্নস্বাস্থ্য যুবকেরা যে জাতির জনক সে জাতির শিশুরা যে ক্ষীণাঙ্গ বা ক্ষণজীবী হইবে তার আর আশ্চর্য্য কি।

দুঃখের বিষয়, শিক্ষিতদের মধ্যেও এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। শিক্ষাভিমানীদের জানা উচিত, তাঁহাদের উদাহরণ সাধারণে বিশেষতঃ অশিক্ষিতেরা—অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের দায়িত্ব কত বেশী! যে শিক্ষা মানুষকে ক্রমশঃই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে দূরে সরাইয়া দেয়—যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ হইতে শিখায় না, সে শিক্ষা যত শীঘ্রই দেশ হইতে লোপ পায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবের আর একটী কারণ এবং শিশুদের অকাল মৃত্যুরও অন্যতম কারণ আমাদের দেশে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রাচুর্য্য। মদ্য যে মানুষকে পিশাচ করে সে বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য। ডাক্তারী

হিসাবে মদ্যপায়ীদের সন্তানেরা কখনও স্বাস্থ্যবান হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে তাহারা দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বা নিরেট বোকা হয়, কারণ তাহাদের পিতার বা মাতার স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ প্রায়ই থাকে।

এই মাদক দ্রব্য ব্যবহারে দরিদ্র আমরা যে ক্রমশঃই দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইতেছি, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। যে পয়সা দিয়া হয়ত সদ্যজাত শিশুর কিম্বা তাহার মাতার আহারের সংস্থান হইত তাহাই অনায়াসে শিশুর পিতা শৌণ্ডিকালয়ে দিয়া আসিয়া থাকেন। ফলে গর্ভিণীর বা সদ্যজাত শিশুর উপযুক্ত খাদ্যাভাব প্রায়ই দেখা যায়। অবশ্য এ সব গরিবদের কথাই বলিতেছি। মহাত্মা গান্ধির কৃপায় আর কিছু না হোক এই আমাদের কৃষ্ণনগর সহরেই দেখিতেছি যে গরিবেরা মদের পয়সার বিনিময়ে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে। কত গরিবলোকদের গৃহিণীরা যে ছেলেদের দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন তাহা বলা যায় না।

(৭) দরিদ্রতা।

ইহাই শিশু-অপমৃত্যুর প্রধানতম কারণ। শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের আজ এ কি অবস্থা। সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম আজ অনশনে বা অর্দ্ধোপবাসে জীর্ণ, স্তব্ধ। যে কোন গ্রামে যাও, দেখিবে লোকের মুখে আর সে হাসি নাই—সকলেই যেন কি একটা ভয়ে আতঙ্কিত।

প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনীশক্তি বলিয়া একটী জিনিষ ডাক্তারী মতে আছে। দুই জন লোক একই ম্যালেরিয়াপূর্ণ জায়গায় একই ভাবে একই বাটীতে একই ঘরে বাস করে, এক রকম জিনিষই খায়, অথচ একজন হয়ত ম্যালেরিয়ায় খুবই ভুগিতেছে আর এক জনের কিছুই হইল না। কারণ এক জনের জীবনীশক্তি অর্থাৎ রোগের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা আর এক জনের অপেক্ষা অধিক। এই জীবনীশক্তি যে আমাদের দেশে ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহার প্রধান কারণ এই দরিদ্রতার দরুণ অনশন।

এই দরিদ্রতার দরুণ সদ্যজাত শিশু ও প্রসূতি উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য

পায় না, উপযুক্ত বিরাম বা পরিচ্ছদাদি পায় না, উপযুক্ত ডাক্তারের সাহায্যও পায় না। এই কৃষ্ণনগরে অনেক জায়গায় দেখিয়াছি যে, এক সের দুধ খাওয়াইতে বলিলে বলে—অত পয়সা কোথায় পাইব? যাহারা খাদ্য যোগাইতে অক্ষম তাদের কি ঔষধ দিয়া জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করা যায়? কখনই নয়। কুইনাইন খাওয়াইলে কি হইবে—যদি খাদ্য দ্বারা তাহাদের জীবনীশক্তি রাখিতে না পারা যায়।।

আক্ষেপের বিষয়, যে দুগ্ধ শিশুদের একমাত্র খাদ্য, আজকাল তাহাও এত মহার্ঘ হইয়াছে যে গরিবের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। প্রায়ই গরিবদের মধ্যে দেখা যায় যে ভাতের মাড়, সুজিসিদ্ধ প্রভৃতি দুই এক মাসের ছেলেদেরও খাওয়াইতেছে। ফলে Infantile Lever প্রভৃতি রোগ প্রায়ই এই সব ছেলেদের আক্রমণ করে এবং অকালে মৃত্যুমুখে আকর্ষণ করে।

যাহাতে দেশে ধন সংখ্যার বৃদ্ধি হয় প্রত্যেক লোকেরই সে দিকে দেখা উচিত। চেষ্টা ত কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে এখন শেষের উপায় —নারায়ণ।

অবাঙমনসোগোচরম্।

(আনন্দ চৈতন্য)

মন তাহা নাহি পাবে করিতে মনন,
বাক্য তাহা নাহি পারে করিতে বর্ণন।
মনাতীত বাক্যাতীত চিন্তাতীত রূপ;
বিরাজিছে প্রতি হৃদে আনন্দ স্বরূপ।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই হেতু শ্রুতি আছে (কঠ ৩।১২)—

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। ইতি

সূক্ষ্মদর্শী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত (কঠ, ৩।১০) প্রকারে উত্তরোত্তর সূক্ষ্মত্ববিচার দ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শনশীল, মহাবাক্যজনিত সূক্ষ্মপদার্থগ্রহণ-সমর্থ বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি দ্বারা এই আত্মাকে প্রত্যগ্রূপে (অর্থাৎ 'আমিই সেই' এইরূপে) সাক্ষাৎকার করা যায়। বায়ু দ্বারা যে প্রদীপ অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে তাহার সাহায্যে মণিমুক্তাদির লক্ষণসমূহ কখনই নির্দ্ধাণ করা যায় না এবং স্থূল খনিত্রের (শস্তা) দ্বারা সূচির ন্যায় সূক্ষ্মবস্ত্র সেলাই করাও সম্ভবপর নহে। অতএব এই প্রকার সত্ত্বগুণই যোগীদিগের হৃদয়ে তমোগুণযুক্ত রজোগুণের সাহায্যে বহুবিধ দ্বৈতবিষয়ক সঙ্কল্প করিয়া চেতয়মান হইয়া বা চিন্তনে নিযুক্ত হইয়া চিত্তরূপ ধারণ করে। তমোগুণের আধিক্য হইলে, সেই চিত্ত আসুরী সম্পদ সঞ্চয় করিয়া স্ফীত হয়। সেই কথাই বশিষ্ঠ কহিতেছেন :—

অনাত্মন্যাত্মভাবেন দেহভাবনয়া তথা।
পুত্রদারৈঃ কুটুম্বৈশ্চ চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ ॥ *

(উপশম প্র, ৫০।৫৭)

অনাত্ম বিষয়ে আত্মভাবনাহেতু এবং 'দেহই আমি' এইরূপ চিন্তা হেতু এবং পুত্র, দারা ও কুটুম্বহেতু (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি মমতাবশতঃ) চিত্ত পীন (স্ফীত) ভাব ধারণ করে।

---

* মূলের পাঠ এইরূপ—"অনাত্মন্যাত্মভাবেন দেহমাত্রাস্থযানয়া, পুত্রদারকুটুম্বৈশ্চ চেতো গচ্ছতি পীনতাম্। (৫৭)

অহঙ্কার বিকারেণ মমতামললীলয়া* ।
ইদংমমেতিভাবেন চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ ॥ (ঐ, ৫৮)

অহঙ্কারের বিকাশ এবং মমতারূপ মলে আসক্তিবশতঃ, 'এই শরীরই আমার আত্মা বা ভোগায়তন' এইরূপ ভাবনা দ্বারা চিত্ত স্ফীতভাব ধারণ করে।

আধিব্যাধি বিলাসেন সমাশ্বাসেন সংস্থতৌ।
হেয়াহেয় বিভাগেন চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ †॥ (ঐ, ৬০)

সংসারের রম্যতা ও চিরস্থায়িতাদি বিষয়ে বিশ্বাস, আধিব্যাধির বিলাস ভূমি, ঐ বিশ্বাস এবং "ইহা হেয়, ইহা উপাদেয় এইরূপ বিভাগ-পূর্ব্বক নিশ্চয় বশতঃ চিত্ত স্ফীত ভাব ধারণ করে।

স্নেহেন ধনলোভেন লাভেন মণি যোষিতাম্।
আপাত রমণীয়েন চেতো গচ্ছতি পীনতাম্ ॥" (ঐ, ৬১)

স্নেহ, ধনলোভ এবং আপাত-রমণীয় কামিনী-কাঞ্চনাদি প্রাপ্তি এই সমুদায় কারণে চিত্ত স্ফীতভাব ধারণ করে।

দুরাশা ক্ষীর পানেন ভোগানিল বলেন চ।
আস্থাদানেন চারেণ চিত্তাহিযাতি পীনতাম্ ॥ (ঐ, ৬২)

চিত্তরূপ সর্প, দুরাশারূপ দুগ্ধপান, বিষয়রূপ বায়ুর ভক্ষণ, এবং এই জগতে আবাস গর্ত্ত সংগ্রহার্থ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ দ্বারা (প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া তাহার গ্রহণের জন্য গমনাগমন প্রয়াস দ্বারা) চিত্ত স্ফীতভাব ধারণ করে।

শ্লোকস্থ 'আস্থা' শব্দে প্রপঞ্চে সত্যত্ববুদ্ধি বুঝিতে হইবে; তাহার 'আদান' অর্থে অঙ্গীকার বা গ্রহণ বুঝিতে হইবে, তাহাই "চার" বা গমনাগমন ক্রিয়া—তদ্দ্বারা (এইরূপ অর্থ গ্রন্থকারের অনুমোদিত)।

অতএব যে বাসনা ও মনের বিনাশ সাধন করিতে হইবে তাহাদের স্বরূপ এইরূপে নিরূপিত হইল।"

---

* মূলের পাঠ—"হেলয়া"।

† মূলের পাঠ—"সংস্থতেঃ" ও "হেয়াদেয়প্রযত্নেন"।

অনন্তর বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ যথাক্রমে নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে বাসনাক্ষয় কি প্রকার তাহা বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাস্ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ ॥"

(স্থিতি প্রকরণ ৫৭।১৯)

বাসনার বন্ধনকেই বন্ধন বলে, এবং বাসনাক্ষয়কেই মোক্ষ বলে। তুমি বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ প্রার্থীর ভাব অর্থাৎ মোক্ষকামনাও পরিত্যাগ কর।

মানসবাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষযবাসনাঃ।
মৈত্র্যাদি ভাবনা নাম্নী গৃহাণামলবাসনাঃ ॥ (ঐ, ২০)

প্রথমে "বিষয়-বাসনা" পবিত্যাগ কবিয়া (পরে) "মানস-বাসনা" পরিত্যাগ কর এবং মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষার ভাবনা নামক অমল বাসনা গ্রহণ কর।

তা অপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃ শান্ততমোস্নেহো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ (ঐ, ২১)

উক্ত মৈত্রী প্রভৃতি অমল বাসনা লইয়া বাহ্যতঃ ব্যবহার করিতে থাকিলেও, অন্তরে তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া হৃদয় হইতে সকল প্রকার আসক্তিকে একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র চিদ্বাসনা লইয়া থাক।

তামপাস্তঃ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধি সমন্বিতাম্।
শেষে স্থির সমাধানো যেন ত্যজসি তং ত্যজ ॥* (ঐ, ২২)

* উক্ত চারিটি শ্লোকের মূলের পাঠ এইরূপ :—
বন্ধোহি বাসনা বন্ধো মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাং ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ ॥ ১৯
তামসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং তক্ত্বা বিষয়বাসিতাঃ।
মৈত্র্যাদি ভাবনা নাম্নীং গৃহাণামলবাসনাম্ ॥ ২০
তামপ্যস্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃ শান্তসমস্তেহো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ২১
তামপ্যথ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধি সমন্বিতাম্।
শেষে স্থির সমাধানো যেন ত্যজসি তং ত্যজ ॥ ২২

মন ও বুদ্ধির সহিত সেই চিদ্বাসনাকেও অন্তরে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাতে (অর্থাৎ কেবল চিন্মাত্রে) স্থির ভাবে (অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে) সমাহিত হইয়া, যাহার দ্বারা (অর্থাৎ যে অহঙ্কার দ্বারা) ত্যাগ করিতেছিলে তাহাকেও ত্যাগ কর। ইতি।

এস্থলে (দ্বিতীয় শ্লোকে) যে 'মানস বাসনা' শব্দের প্রযোগ আছে তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তিনটি অর্থাৎ লোকবাসনা শাস্ত্রবাসনা, ও দেহবাসনাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষয়বাসনা শব্দে দম্ভ, দর্প প্রভৃতি আসুরী সম্পদই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, মানস বাসনাগুলি অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং বিষয়বাসনা তদপেক্ষা তীব্র। কিম্বা বিষয় শব্দে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ বুঝা যাইতে পারে। সেই সকল বিষয়কে যখন কামনা করা হইতেছে, সেই অবস্থায় যে যে

মূল ও টীকার অনুবাদ—

এখানে বন্ধ ও মোক্ষের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া, কি কি উপায় পরম্পরা দ্বারা বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন—'যে বাসনার দ্বারা আবদ্ধ সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বদ্ধ, বাসনা ক্ষয়কেই মোক্ষ বলে। তুমি বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থিতাও ত্যাগ কর।' ১৯। সেই বাসনাক্ষয় বিষয়ে বৈরাগ্যের দৃঢ়তাই প্রথম সোপান, তাহাই বলিতেছেন—'বিষয়ভোগ দ্বারা চিত্তে নিহিত তমঃ-প্রধান বাসনাসমূহকে (অর্থাৎ যে সকল তামসিক বাসনা থাকিলে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মলাভ হয়, এবং সেই সঙ্গে যে সকল রাজসিক বাসনা থাকিলে, মনুষ্যাদি জন্মলাভ হয়, তাহাদিগকেও) প্রথমে পরিত্যাগ করিয়া, তুমি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারি প্রকার ভাবনার নির্ম্মল (চিত্তশুদ্ধি সম্পাদক) বাসনা গ্রহণ কর' (নিম্নে ব্যাখ্যাত ১।৩৩ সংখ্যক পাতঞ্জলসূত্র দ্রষ্টব্য)। ২০। অন্তরে কেবলমাত্র চিদ্ব্যতিরেকে মৈত্র্যাদিও নাই, ইহা বুঝিয়া—বাহিরে মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা দ্বারা ব্যবহার-পর হইয়াও, অন্তরে সমুদয় কর্ম্মচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র চৈতন্যেরই বাসনা পরায়ণ হও; অর্থাৎ 'আমি কেবলমাত্র চিৎ—তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাস দ্বারা সেই সংস্কারকে দৃঢ় কর।২১। তাহার পর মন ও বুদ্ধির সহিত সেই চিন্মাত্র বাসনাও পরিত্যাগ করিয়া, পরিশিষ্ট একমাত্র আত্মতত্ত্বে স্থির সমাহিত হইয়া, যে অহঙ্কারের সাহায্যে এই সমস্ত ত্যাগ করিলে তাহাকেও ত্যাগ করিবে। ২২।

সংস্কার জন্মে তাহার নাম মানসবাসনা। আর যে অবস্থায় তাহাদের ভোগ চলিতেছে সেই অবস্থায় যে যে সংস্কার জন্মে তাহাদিগকে বিষয়-বাসনা বলে। এইরূপ অর্থ করিলে প্রথমোক্ত চারিটি বাসনা শেষোক্ত দুইটি বাসনার অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। কেননা, অন্তঃ (অর্থাৎ চিত্তগত) এবং বাহ্য (বহির্বিষয়গত) বাসনা ব্যতিরিক্ত, অপর কোন প্রকারের বাসনা ত হইতেই পারে না।* এস্থলে এক সংশয় উঠিতেছে :—আচ্ছা, বাসনার পরিত্যাগ কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? বাসনার ত মূর্ত্তি নাই যে ঝাঁটার দ্বারা রাশীকৃত করিয়া ধূলিতৃণের ন্যায় হস্তের দ্বারা উঠাইয়া তাহাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিব। সেই সংশয় নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন :—এরূপ সংশয় উঠিতে পারে না। উপবাস ও জাগরণ বিষয়ে যেরূপ ত্যাগ উপপন্ন অর্থাৎ সম্ভবপর হয়, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। (শরীরের স্বভাবগত ভোজন ক্রিয়া ও নিদ্রা, মূর্ত্তিহীন হইলেও, তদ্বর্জ্জনরূপ উপবাস ও জাগরণের অনুষ্ঠান ত সকলেই করিয়া থাকে ; এস্থলেও সেইরূপ হইবে।) "অদ্যস্থিত্বা নিরাহারঃ" (আজ নিরাহার থাকিয়া) ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া সাবধান ভাবে থাকিলে যদি তাহা 'ত্যাগ' হয়, তবে এস্থলেও ত সেইরূপ ত্যাগের অনুষ্ঠানকে বাধা দিবার নিমিত্ত কেহ লাঠী হাতে করিয়া খাড়া নাই। কেননা, প্রৈষ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া সাবধান হইয়া থাকা ত অসাধ্য নয়। যাঁহা-দিগের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার নাই, তাঁহাদের পক্ষে নিজের মাতৃভাষাতেই সঙ্কল্প হইতে পারে। যদি প্রথমোক্তস্থলে, অন্ন, ব্যঞ্জন সূপ প্রভৃতি সম্পর্ক ত্যাগ করা চলে, তাহা হইলে এস্থলেও সুগন্ধিমালা চন্দন বনিতা প্রভৃতির সম্পর্ক ত্যাগ কেন না চলিবে? আর যদি বল, উক্তস্থলে ক্ষুধা নিদ্রা আলস্য প্রভৃতিকে ভুলাইবার জন্য পুরাণ শ্রবণ, দেবপূজা, নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতির দ্বারা চিত্তকে উপলালন করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা হইলে এস্থলেও ত মৈত্রী প্রভৃতির দ্বারা সেইরূপ চিত্তের

* মুনিবর্য্য এই বিংশ শ্লোকের—মূলের উদ্ধৃত পাঠ না পাইয়াই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উপলালন করিবার ব্যবস্থা আছে। মৈত্রী প্রভৃতি, পতঞ্জলি ঋষি স্বকৃত যোগসূত্রে এইরূপ বুঝাইয়াছেন—

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্" ইতি। (পাতঞ্জল দর্শন, ১।৩৩)

সুখিতের প্রতি মৈত্রী (সৌহার্দ্দ), দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যাত্মার প্রতি মুদিতা হয) এবং অপুণ্যাত্মার প্রতি উপেক্ষা (ঔদাসীন্য) ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় (এবং একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে)।

চিত্তকে রাগ, দ্বেষ, পুণ্য ও পাপই কলুষিত করিয়া থাকে। রাগ এবং দ্বেষও পতঞ্জলি ঋষি যোগসূত্রে এইরূপে বুঝাইয়াছেন—

"সুখানুশয়ী রাগঃ॥" "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ॥" (পাতঞ্জলসূত্র ২।৭—৮)। বুদ্ধির এক প্রকার বৃত্তি যাহা সুখ অনুভব করিলে তাহার প্রতি আসক্তি বশতঃ অত্যন্ত আকৃষ্ট হয় এবং 'আমার যেন এই সমস্ত সুখই হয়' (এইরূপ আকার ধারণ করে, তাহাকে "রাগ" বলে) এবং সেই সমস্ত সুখ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সুখ-সামগ্রীর (তদুপকরণের) অভাববশতঃ সম্পাদন করা অসাধ্য বলিয়া, সেই রাগ চিত্তকে কলুষিত করে। যখন কেহ সুখী লোকদিগকে দেখিলে, 'এই সুখিগণ সকলেই আমার (আত্মীয়)' এইরূপে মৈত্রী ভাবনা করে তখন সেই সুখ তাহার নিজেরই ঘটিয়াছে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সুখবিষয়ে তাহার রাগ (আসক্তি) নিবৃত্ত হয়। (যেমন কাহারও নিজের রাজ্য না থাকিলেও নিজের পুত্র প্রভৃতির রাজ্যকে স্বকীয় রাজ্য বলিয়া মনে করে সেইরূপ।) এবং রাগ নিবৃত্ত হইলে, বর্ষাপগমে শরৎকালীন নদীর ন্যায় চিত্ত প্রসন্ন (নির্ম্মল) হয়।

সেইরূপ, কোন প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি দুঃখের অনুশায়িনী হয়, অর্থাৎ 'এইরূপ দুঃখ যেন কোন প্রকারে আমার না ঘটে', (এইরূপ আকার ধারণ করে)—তাহার নাম দ্বেষ। সেই দ্বেষ শত্রু, ব্যাঘ্র প্রভৃতি থাকিতে কোনও প্রকারে নিবারণ করা যায় না। আর দুঃখের সকল হেতুকেই নির্ম্মূল করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই হেতু সেই দ্বেষ সর্ব্বদা হৃদয়কে দগ্ধ করে। 'দুঃখ আমার নিকট যেরূপ হেয়, অপর

সকলের নিকটেও সেইরূপ হেয়, তাহা যেন তাহাদিগের না ঘটে'— যখন এইরূপে দুঃখী জীবের প্রতি করুণা ভাবনা করা যায়, তখন বৈরাদি-দোষের নিবৃত্তি হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়। এই হেতু স্মৃতিশাস্ত্রে আছে :—

"প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা,

আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ। (মহাভারত)

আমার প্রাণ যেরূপ আমার নিকট প্রিয়, সর্ব্বজীবের প্রাণও তাহাদিগের নিকট সেইরূপ প্রিয়। বিচারশীল ব্যক্তিগণ এইরূপে আপনার সহিত তুলনা করিয়া জীবগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। কি প্রকারে তাহা করিতে হয় সাধুগণ তাহা দেখাইতেছেন, যথা,—

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

এই সংসারে সকলেই সুখী হউক, সকলেই নীরোগ হউক, সকলেই নিজ নিজ শ্রেয়ঃ উপলব্ধি করুক, (এবং তদ্দ্বারা পুণ্যকর্ম্মে রত হউক), কেহ যেন দুঃখ না পায়।

কেননা দেখ, লোকে স্বভাবতঃ পুণ্যের অনুষ্ঠান করে না বটে কিন্তু পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কথিত আছে :—

পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।

ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥

লোকে পুণ্যফল পাইবার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু পুণ্যানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করে না, এদিকে লোকে পাপের ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না বটে কিন্তু যত্নপূর্ব্বক পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আর সেই পুণ্যপাপ পশ্চাত্তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রুতি (তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মবল্লী, ৯।১) সেইরূপ পশ্চাত্তাপকারীর বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন—

"কিমহং সাধু নাকরবম্ ' কিমহং পাপমকরবমিতি।" (তৈ, উ, ২।৯।১)

কি হেতু আমি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই? কি হেতু আমি পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম?

যদি সেই ব্যক্তি পুণ্যবান্ লোকদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে, "মুদিতা" ভাবনা করে, তাহা হইলে, তাহাদের সেই পুণ্যের বাসনা

(সংস্কার) দেখিয়া নিজেও সাবধান হইয়া পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেইরূপ পাপী লোকদিগের প্রতি "উপেক্ষা" ভাবনা করিয়া, নিজেও পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে।—এই কারণে পশ্চাত্তাপ না থাকায়, চিত্ত প্রসন্ন হয়। সুখী লোকদিগকে দেখিয়া মৈত্রী ভাবনা করিলে যে কেবল আসক্তির নিবৃত্তি হয় তাহা নহে, কিন্তু অসূয়া এবং ঈর্ষাও নিবৃত্ত হয়। অপরের গুণ সহ্য করিতে না পারার নাম ঈর্ষা এবং অপরের গুণসমূহে দোষাবিষ্করণের নাম অসূয়া। যখন মৈত্রীবশতঃ অপরের সুখ নিজের বলিয়া অনুভূত হয়, তখন পরের গুণ দর্শন করিয়া কি প্রকারে তাহাতে অসূয়া প্রভৃতি জন্মিতে পারে? এই প্রকারে অপরাপর দোষেরও নিবৃত্তি ঘটিতে পারে, তাহা যথাযোগ্যরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। যে দ্বেষবশতঃ লোকে শত্রুবধাদিতে প্রবৃত্ত হয়, দুঃখীদিগের প্রতি করুণা ভাবনা করিলে সেই দ্বেষ যেমন তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ যে সুখাবস্থা ঘটিলে (তদ্বিরুদ্ধ) দুঃখাবস্থা আসিতেই পারে না, সেই সুখাবস্থা প্রাপ্ত হইলে (সাধারণতঃ) সুখী ভাব জনিত যে দর্প উৎপন্ন হয় তাহাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। (পূর্ব্বে আসুর সম্পদের বর্ণনাকালে অহঙ্কারের কথা বলিতে গিয়া সেই দর্পের বর্ণনা করা হইয়াছে।)

"ঈশ্বরোঽহং ভোগীসিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।"
আঢ্যোভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।"

(গীতা ১৬।১৪-১৫)

আমি কর্ত্তা, আমি ভোগী, আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্ কুলীন—আমার তুল্য আর কে আছে?

(শঙ্কা)—আচ্ছা, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রতি মুদিতা ভাবনা করিলে তাহার ফলরূপে পুণ্যপ্রবৃত্তি জন্মে এই কথা বলা হইল। সেই পুণ্যপ্রবৃত্তি ত যোগীর উপযোগী নহে, কেননা পূর্ব্বেই সেই পুণ্যকে মলিন শাস্ত্রবাসনার অন্তর্ভূত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। যেহেতু কাম্য ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম, যাহা পুনর্জন্ম উৎপাদন করে, তাহাই মলিন বলিয়া বর্ণিত

হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে যোগাভ্যাস বশতঃ যে সকল পুণ্যকর্ম্ম (যোগাভ্যাস বশতঃ) অশুক্ল, অকৃষ্ণ * হইযা যাওয়াতে যোগীদিগেব পুনর্জন্ম উৎপাদন কবে না, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই সেই কথা বলা হইয়াছে। কর্ম্মের এই অশুক্লাকৃষ্ণত্ব পতঞ্জলি নিম্নলিখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্"।

(কৈবল্যপাদ, ৭ম সূ।)

যোগীদিগের চিত্তের ন্যায় যোগীদিগেব কর্ম্মও অনন্যসাধারণ, এই কথাই উক্ত সূত্রে বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—
তপঃস্বাধ্যায়শীল ব্যক্তিগণেব শুক্লকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা বাক্য ও মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য এবং কেবল সুখপ্রদ। কেবল দুঃখপ্রদ কৃষ্ণকর্ম্ম দুরাত্ম-দিগেব, সুখদুঃখ মিশ্রফলপ্রদ বহিঃসাধনসাধ্য শুক্লকৃষ্ণকর্ম্ম সোম-যাগাদিরত ব্যক্তিদিগেব, কেননা—সোমযাগাদিতে (এক পক্ষে যেমন) ব্রীহি প্রভৃতির বিনাশ দ্বারা পিপীলিকাদিব পরিপীডন করিতে হয়, (তেমনি অপর পক্ষে) দক্ষিণাপ্রদান প্রভৃতি পরানুগ্রহেরও সংযোগ রহিয়াছে। এই (শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ) ত্রিবিধ কর্ম্ম অযোগীদিগেব। কিন্তু যোগিগণ বাহ্য সাধনসাধ্য-কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া, তাঁহাদের শুক্লকৃষ্ণকর্ম্ম নাই, তাঁহারা ক্ষীণক্লেশ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণকর্ম্ম নাই, এবং যোগজধর্ম্ম, ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরে অর্পিত হওয়ায় তাঁহাদের শুক্লকর্ম্মও নাই। এই হেতু যে অশুক্লাকৃষ্ণকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি বিবেকখ্যাতি উৎপাদন করিয়া কেবলমাত্র মোক্ষফল প্রদান করে সেই কর্ম্মই যোগীদিগেব। (যোগমণিপ্রভাবৃত্তি)।

কাম্যকর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত বলিয়া শুক্ল, নিষিদ্ধ কর্ম্ম, কৃষ্ণ, মিশ্রকর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ। এই তিন প্রকার কর্ম্ম অপর অর্থাৎ যোগীভিন্ন ব্যক্তিগণের জন্যে। সেই তিন প্রকার কর্ম্ম তিন প্রকার জন্ম প্রদান করে। বিশ্ব-রূপাচার্য্য (সুরেশ্বরাচার্য্য) সেই কথা বলিতেছেন,—

---

* এস্থলে, আনন্দাশ্রমের উভয় সংস্করণেই পাঠের ভুল।

"শুভৈবাপ্নোতি দেবত্বং নিষিদ্ধৈ র্নারকীং গতিম্।
উভাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং মানুষ্যং লভতেঽবশঃ॥*

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, ১।৪১)

শুভকর্ম্মের দ্বারা লোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, নিষিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা নারকী গতি লাভ করে, এবং পুণ্য ও পাপ এই উভয়ের দ্বারা জীব অবশ হইয়া (অর্থাৎ কাম, কর্ম্ম ও অবিদ্যার অধীন হইয়া) মনুষ্যের জন্ম লাভ করে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, যোগ ত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই, সেই হেতু অকৃষ্ণ (কর্ম্ম), এবং শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়া শুক্ল (কর্ম্ম)। তবে যোগকে অশুক্লাকৃষ্ণ কেন বলা হইল?

(সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা ঘটিতে পারে না, যেহেতু যোগ (যোগীর নিকট) অকাম্য (ফলাভিসন্ধিরহিত কর্ম্ম)। সেই অকাম্যতাকেই লক্ষ্য করিয়া (যোগকে) অশুক্ল বলা হইয়াছে। এই হেতু (সুখদুঃখমিশ্র-ফলপ্রদ সোমযাগাদি রূপ) শুক্লকৃষ্ণ পুণ্য প্রবৃত্তিকে, যোগী উপেক্ষা করিয়া থাকেন।† (ক্রমশঃ)

---

* নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি-টীকাকার জ্ঞানোত্তম বলেন—এই শ্লোকে গ্রন্থকার "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং জয়তি (নয়তি ?), পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্য-লোকম্" (উদান বায়ু জীবকে পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে আর পাপবশতঃ পাপলোক—নরকে—লইয়া যায়, এবং উভয় দ্বারা অর্থাৎ তুল্যবল পুণ্য ও পাপ দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায়)—প্রশ্ন উপ, ৩।৭—এই শ্রুতি বাক্যেরই অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন। অবশ—কামকর্ম্মাদি পরতন্ত্র।

† উদ্ধৃত "যোগমণি প্রভাবৃত্তি" দ্রষ্টব্য।

"মুক্তি, যা' আমাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থই—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সব রকম স্বাধীনতা।"

"যতদিন না এই ঈর্ষাদ্বেষ যায় ও নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শিক্ষা করে, ততদিন একটা সমাজসংহতি হোতেই পারে না।"—বিবেকানন্দ।

সমালোচনা।

সবুজ পত্র—উড়োচিঠি (মাঘ, ১৩২৭)! চিঠির লেখক বলিতেছেন, "কোন কোন বাঙ্গালীর মনে এমন একটা জিনিষের এমনি ভাবে আবির্ভাব হয়েছে যে, সেটাকে একটা রিপু বলা চলে। সে জিনিষটীর নাম হচ্ছে বৈরাগ্য। এবং তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বল্‌লে দ্বিতীয় রিপুটি সহজেই অভিভূত হন।"

কিন্তু বৈরাগ্যকে রিপুর আখ্যা দেওয়া হিন্দু হইয়া, সেটাও বুঝিতে হইবে ঐ দ্বিতীয় রিপু তথা পঞ্চম রিপু হইতেই প্রসূত—রিপুর অতীত হইয়া নিশ্চয়ই ওরূপ যুক্তি মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইতে পারে না। তাহার পর পত্র লেখক লিখিয়াছেন "দেখ, স্বামী বিবেকানন্দের একটী কথা আমার মনে বড় লেগে আছে। সে কথাটা হচ্ছে 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না।' এই কথাটা আমি খুব মানি, তবে ওর দু'টি পদ ছাড়া—ঐ যে ঐ "মহৎ কাজ"। ঐখানেই স্বামী বিবেকানন্দ exclusive হয়েছেন। আসলে মহৎই হোক ও অসৎই হোক, কোন কাজটাই চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। কেন না মহৎ কাজ ও অসৎ কাজ এ-দু'টোতে প্রকৃতিগত কোন তফাৎ নেই।" কেন? 'একদা যখন বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়', তখন সেটা যে খুব মহৎ কাজ হয়েছিল এটা যে কোন স্বদেশ ও স্বজাতি ভক্ত বাঙ্গালীর কাছ থেকে শুনতে পাবে। তবে লঙ্কাবাসীদের কাছে সেটা নিশ্চয়ই তেমন মহৎ বলে প্রতীয়মান হয় নি।" "সুতরাং বুঝতে পাচ্ছ যে, "মহৎ" ও "অসৎ" এ যে তফাৎ সেটা বস্তুগত বা বিষয়গত নয়, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থাৎ—সেটা objective ততটা নয় যতটা subjective" আমরা বলি, এই যে ভেদ জিনিষটা যাহা এই বিশ্বে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে, একেবারেই objective নয়, পুরো মাত্রায় subjective পারমার্থিকের দিক হইতে যদি আমরা দৃষ্টি করি তাহা হইলে সেই এক অসীম সত্তারই লীলা-বিলাস সকল সসীমতার মধ্য আমাদের মানসে উপলব্ধি হইয়া থাকে, নিন্দা বা বন্দনার বস্তু তখন থাকে না। কিন্তু যদি লেখক একটু নিম্ন ভূমিতে অবস্থান করিয়া এই ব্যবহারিক রাজ্যের দিক দৃষ্টিপাত করেন তাহা

হইলেই দেখিবেন সেখানে মহত্বও আছে অসত্বও আছে, গৌরবও আছে তুচ্ছতাও আছে—আর এই সকলের একটা standard বা মাপকাঠিও মানুষ করিয়া লইয়াছে। তাহার যুক্তি এই—সকল জীবেতেই অনাদিকাল ধরিয়া দেবত্ব ও পূর্ণত্ব বর্ত্তমান—সসীমতা বা নাম-রূপ তাহার প্রকাশে বাধা দিতেছে। যে কর্ম্ম সেই দেবত্ব এবং পূর্ণত্ব বিকাশে সহায়ক তাহাই সৎ, আর যাহা তাহার উপর আরও অধিক আবরণ টানিয়া দেয় তাহাই অসৎ। আর সৎকর্ম্মের দার্শনিক লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর একটা সাধারণ লক্ষণ আছে সেটা হচ্চে 'greatest good of the greatest number'—'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'। যখন দেখা যায় দুই চারি জনের সুখের জন্য, ভোগের জন্য বহুকোটী লোক কষ্ট পাইতেছে তখন সেই দুই চারি জনের কৃত কার্য্য যত বড়ই বিরাট হউক না কেন, তাহাকে আমরা দেবত্ব বা পূর্ণত্ব বিধায়ক কার্য্য বলিতে পারি না—খুব বিপুল বলিয়া তাহাকে আসুর আখ্যায় খ্যাত করিতে পারা যায়। সৎকার্য্যের আর একটা নৈতিক লক্ষণ আছে। লেখক স্বামীজির কথার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া বহুযত্নে কলম পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু যদি আরও একটু যত্ন লইয়া তাহার পরের অংশ উদ্ধৃত করিতেন—তাহা হইলে মহৎ কার্য্যের যে নৈতিক লক্ষণ, যাহা তাহাকে অসৎ হইতে অবচ্ছেদ করে, সেইটী বুঝিতে পারিতেন। স্বামীজির কথার পরের অংশটী এই—"প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।" যেখানেই এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সত্যনিষ্ঠা এবং বীর্য্যের অভাব সেখানেই ভীতি ও কাপুরুষতা—সুতরাং সেখানেই 'চালাকী' জাল, চক্রান্ত, কুৎসা, হত্যা। এই বিভৎসতার সাহায্যে যত বড়ই প্রকাণ্ড কার্য্য সাধিত হউক না কেন তাহার সহিত আমরা বুদ্ধ, চৈতন্যের কার্য্যের সহিত ব্যবহারিক রাজ্যে এক করিয়া লইতে পারিব না।

তার পর লেখক বলচেন "লক্ষ্মীছাড়ার মধ্যে heroর বীজ যেমন তাজা অবস্থায় আছে, ভাল মানুষের মধ্যে তেমন নেই। তাই আমার স্বামিজীর ঐ exclusiveness এ আপত্তি।" এখানে লেখক নিজেই

exclusive হয়ে পড়েছেন। স্বামীজি এ বিষয়ে যেরূপ উদার সেরূপ জগতে বোধ হয় আর একটী আসেন নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ ব লয়াছেন, hero থেকে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীছাড়া পর্য্যন্ত সেই 'সচ্চিদানন্দ' সমভাবে বর্ত্তমান—কেবল প্রকাশের তারতম্য। এই তারতম্য স্বীকার করে লেখকেব কথাটা এক দিক দিয়ে সত্য হইতে পারে—যদি hero অর্থে অভিনয়েব hero ধবা যায় তাহা হইলে লক্ষ্মীছাড়াব মধ্যে heroর বীজ খুব তাজা অবস্থায় থাকে—আর নয় ত যদি 'ভালমানুষ' অর্থে, ইংরাজীতে যা'কে simpleton বলে, ধরা যায়, তাহা হইলে ভালমানুষের অপেক্ষা লক্ষ্মীছাড়ার মধ্যে heroর বীজ তাজা অবস্থায় আছে এ কথা সত্য। আর তাহা না হইলে ভালমানুষ বা মহৎ লোক, যেখানে শক্তির বিকাশ অধিক (Carlyle যে অর্থে ব্যবহার কবিয়াছেন) তাঁহারাই প্রকৃত Hero Heroব ideal বা আদর্শ তাঁহাবাই জগতে বাখিয়া যান।

লেখকেব তাবপবের অভিমত হইতেছে "দেশবাসীব সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যেব আদর্শকে অপসাবিত করতে হবে এবং তাদেব অন্তরাত্মার বস্তুর বিষয়েব ভোগেব আনন্দকে সত্য করে তুলতে হবে তবেই তাদের কর্ম্ম-প্রেরণাব সত্য প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে সেদিকে আনন্দের ভিতর দিয়ে—কেননা অন্তরাত্মার যে সত্য সেই সত্য আচরণেই মানুষের আনন্দ। আর তবেই তা সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে।" কথাটা আমাদের স্ববিরোধী বলিয়া বোধ হয়। হয় লেখকের আত্মা সদা নিরানন্দ তাই বিষয়ের ইন্দ্রিয় জনিত ভোগেব দ্বাবা আনন্দিত করিতে হইবে—আর তাহা যদি না হয়, তবে সদানন্দ আত্মাকে বিষয় ভোগের দ্বারা কিরূপ আনন্দিত করা যাইতে পারে? প্রদীপ জ্বালিয়া কি সূর্য্যকে আলোকিত করিতে হইবে? সে ত বাতুলতা। ইন্দ্রিয়-ভোগাদর্শ হইতে যে কর্ম্ম প্রেরণা সে ত পশু হইতে সকল জীবেই বর্ত্তমান। সকলেই বিষয় ভোগে রত হইয়া যদি বলিতে থাকে যে আত্মা তৃপ্ত হইতেছেন তাহা হইলে ত্যাগের স্থান হইবে কোথায়? আর ত্যাগ যতদিন জগতে থাকিবে, ততদিন বৈরাগ্য জগতে থাকিবে। বৈরাগ্য বা ত্যাগ অর্থে—জড়ত্ব নহে। ত্যাগ বা বৈরাগ্যের অর্থ—স্বার্থ এবং

সসীমতাকে অতিক্রম করিয়া নিরবচ্ছিন্নরূপে আনন্দস্বরূপ পরমাত্মীয় আত্মার মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত প্রকাশকে উপভোগ করিবার প্রচণ্ড কর্ম্ম প্রেরণা। এই ত্যাগের 'বিগ্রহ'ই জগতে থাকিয়া যায় এবং পূজিত হয় আর ভোগেব 'সাকার রূপ' চিবকালই ধূলি ধূসরিত হইয়া শূন্যে বিলীন হয়—ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য।

সংবাদ।

ক। শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে প্রসাদ বিতবণ এবং বক্তৃতাদি কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছে সংবাদ পাইয়াছি। স্থানাভাবে আমরা তাহাব সংক্ষেপ উল্লেখ মাত্র করিতেছি :—

১। কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে—বামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয় ইটালী, বক্তা স্বামী শর্ব্বানন্দ, বিবেকানন্দ সোসাইটি—বিববণ পূর্ব্বে প্রকাশিত, সাধাবণ সভা ষ্টাব থিযেটাব—বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তা ছিলেন; রামকৃষ্ণ সমিতি, পাশিবাগান সুসুড়ী, হাওড়া, বক্তা—ব্রহ্মচারী অখণ্ড চৈতন্য, চেৎলা এবং ব্যাংটবা, ফতেপুব, গার্ডেন বিচ, বক্তা—স্বামী বাসুদেবানন্দ, ২। সম্বলপুব, বক্তা—ব্রহ্মচাবী অখণ্ড চৈতন্য ৩। জামসেদপুব, বক্তা—ব্রহ্মচাবী অভয় চৈতন্য। ৪। বেতিলা—মাণিকগঞ্জ। ৫। ফরিদপুব, সভাপতি শ্রীযুক্ত মথুবানাথ মিত্র, বক্তা—প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ ঘোষ, কবিবাজ নগেন্দ্রনাথ ভিষগ্‌বত্ন। ৬। শ্রীবামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম—শ্রীহট্ট। ৭। ব্যসাভাঙ্গুড়ি, মহীশূব। ৮। রামকৃষ্ণসমিতি রেঙ্গুন, বাবমা। ৯। বিবেকানন্দ আশ্রম, কউলালামপুব, মালয়উপদ্বীপ, সভাপতি ডাঃ পি, এন্ সেন, বক্তা—স্বামী বিদেহানন্দ, ডাঃ জে, পি, জোসি, মিঃ এস্, এস্ ভোবাই। ১০। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা ব্র্যাঞ্চ।

খ। বালি আর্য্যধর্ম্ম-বক্ষণী সভায় কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে স্বামী সর্ব্বানন্দ ও বাসুদেবানন্দ বক্তৃতা করেন।

গ। ৩১শে চৈত্র বামবাজাতলায় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমেব প্রথম সভার অধিবেশনে পণ্ডিতপ্রবর বেদান্তবাবিধি শ্রীযুক্ত দুর্গাচবণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা কবেন।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

সময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজি যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছেন তাহা ফলোন্মুখী। পাশ্চাত্য অনেক কাল-লক্ষণাবিৎ পণ্ডিতেরা ঠারে ঠোরে অনেক কথা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ইউরোপীয় সমাজের বুকের উপর দাঁড়াইয়া এরূপ স্পষ্টস্বরে সত্য কথা আর কেহ বলেন নাই—যে ইউরোপ যদি তাহার সমাজনীতিকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না করায় তাহা হইলে তাহার ধ্বংস আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সুনিশ্চিৎ।

* * *

আগ্নেয়গিরির চূড়ার উপর নগর প্রতিষ্ঠা যেরূপ ভয়াবহ, ভোগ-শায়ে সমাজ সভ্যতার প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেরূপ সে নগরীর ধ্বংস আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই কল্পনা করিতে পারি, সেইরূপ ভোগান্তর্গত হিংসা দ্বেষের প্রচণ্ড বিস্ফারণে সে সমাজ সভ্যতার ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী।—ঘটিয়াছেও তাহাই। ভোগপরতন্ত্র ইউরোপীয় সমাজ আজ হিংসা দ্বেষের প্রচণ্ড স্ফুরণে ভীত, ত্রস্ত, চূর্ণ।

* * *

অপর দিকে 'সত্ত্বগুণের ধন্না ধরিয়া' এই বিরাট ভারতবর্ষ আজ অতল জড় সমুদ্রে ডুবিতে বসিয়াছে। ত্যাগ ভিত্তি বেদান্ত যে দেশের ধর্ম্ম—তাহা মাত্র ব্যাখ্যা ও পুঁথিতে সমাপ্ত হইয়া জীবনে তাহার বাস্তবতা কোথায় ভারতভারতী তাহা বিস্মৃতির অগাধ জলে ডুবাইয়া উহা অতীতের

কঙ্কালরূপে প্রদর্শনীতে সুসজ্জিত করিবার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। ভোগ ও কর্ম্মতৃপ্ত মানবের চক্ষে যে নিবৃত্তির আলোক প্রতিফলিত হয়, সে আলোকরাজ্যের সিংহদ্বারে লেখা 'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'—ভারতভারতী সেই মহাসত্যকে আকাঙ্ক্ষালালসা পরিপূর্ণ অথচ ত্যাগশূন্য নিজ জীবনে ধারণ করিয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ, ছিন্ন মেঘের ন্যায় জগদাকাশ হইতে বিলীন হইতে বসিয়াছেন।

* + *

তমঃ জীবকে জড়ত্বে পরিণত করে। রজোগুণ প্রাণের বিকাশ দেয় সত্য কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি সংঘর্ষে চূর্ণমার হইয়া যায়; সত্ত্বই আধ্যাত্মিকতার প্রকাশক। কিন্তু তমোগুণাবলম্বীকে সত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে রজের মধ্য দিয়া করা চাই। কেবল-রজঃ ধ্বংসের তোরণ, কিন্তু উহা যদি আধ্যাত্মিক সত্ত্ব সংযমিত হয় তবেই উহা জীবকে শুদ্ধ সত্ত্ব নগরের সাত্ত্বিক প্রজা হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলে।

* * *

এই আধ্যাত্মিকতা কি?—সর্ব্বভূতান্তর্যামী পরমাত্মাকে সকল কর্ম্মের ফল স্বরূপে, জ্ঞানের অভিধেয় স্বরূপে, প্রেমের বস্তু স্বরূপে সর্ব্বাগ্রে অনুমান—শেষে উপলব্ধি। আমারই পরম প্রেমাস্পদ আত্মা সর্ব্বভূতে বিভূ হইয়া রহিয়াছেন এই জ্ঞান যদি আজ হইতে প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে এই জগৎ যাহা আমাদের নিকট দ্বৈত দৃষ্টি দোষে সয়তানের বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহা হইতে একটা আবরণ উঠিয়া গিয়া উজ্জ্বল দেবজগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হইবে। —কেন? এই অদ্বৈত দৃষ্টিই সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধার হেতু, আবার শ্রদ্ধার পুষ্ট অবস্থা প্রীতি, এই প্রীতিই সকল সুখানন্দের বিধায়ক।

* * *

অনাদি অনন্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশ-প্রবাহের মানব এক বিশেষ তরঙ্গ। এই প্রাকৃত জগতে দেখা যায়, যখন কোনও জীব-জাতি-বিশেষ তাহার বেষ্টনীকে অবলম্বন করিয়া কোনও নূতনত্বের বিকাশ দিতে না পারে—নিজেকে উন্নততর করিতে সক্ষম না হয় তখনই জীর্ণ হইয়া মাত্র

ক্রোড়েই বিলীন হইয়া যায়। বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজও ঠিক এমন এক সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, হয় তাহাকে পুরাতন ত্যাগ করিয়া নূতনতর সমাজ গঠন করিতে হইবে, না হয় জীর্ণ হইয়া জগৎ রঙ্গমঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হইতে হইবে।

* * *

বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজ দুইটী অতি পুরাতন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত —(১) জন্মগত স্বত্ব এবং (২) পাপ। জন্মগত স্বত্বকে অবলম্বন করিয়া জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, কুল, বা ব্যক্তিবর্গের এতকাল জগৎ শাসন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকর্তৃক কতকগুলি এমন নিয়ম সৃষ্ট হইয়াছে যাহা সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে, যদিও তাঁহারা নিজেদের জন্য বরাবর কতকগুলি বিশেষ সুবিধা বজায় করিয়া আসিয়াছেন। এই নীতির এক উত্তম শক্তিও আছে—ইহার দ্বারা বহু মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। যাহারা এই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন তাঁহারাই পাপী এবং সমাজের দণ্ডার্হ। ইহাই বর্ত্তমান সমাজের সেতু।

* * *

কিন্তু নব জড়বিজ্ঞান জন্মিবামাত্র অসুরের ন্যায় বলশালী হইয়া জন্মগত স্বাধিকারের মূলে ধ্বংসের কুঠার নিক্ষেপ করিল। সে দেখাইল রাজা প্রজা, ধার্ম্মিক পাপী, পণ্ডিত মূর্খ, প্রভু দাস সকলই এক প্রকৃতির পরিণাম—কেবল কিঞ্চিৎ অবস্থার তারতম্য। দুর্ব্বল অসুস্থকে যেমন সবল ঘৃণা করিতে পারে না বরং সেখানে যেমন সমধিক দয়া, শ্রদ্ধা এবং যত্নের প্রয়োজন সেইরূপ রাজা, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত বা প্রভু—প্রজা, পাপী, মূর্খ বা দাসকে তুচ্ছ না করিয়া অধিক দয়া, শ্রদ্ধা এবং যত্ন দেখাইতে বাধ্য। বিশেষ সুবিধা কেহই ভোগের অধিকারী নহেন—কারণ সকলেরই উত্থান প্রকৃতি হইতে লয় প্রকৃতিতেই।

* *

আবার পাপের অসত্তা মানুষ ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছে, কারণ মানুষ 'মানুষ' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে নানা অভিজ্ঞতা ফলে। লোকে যাহাকে পাপ বলে, অধিকাংশ সময়ে সেই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ নিজ ব্যক্তিত্বের অধিকতর বিকাশ করিয়াছে দৃষ্ট হয়। 'চণ্ডাশোক'ই

পরে 'ধর্ম্মাশোক' হইতেছে। প্রবৃত্তিই নিবৃত্তি মার্গের পরিচায়ক। শিশুর হস্ত দগ্ধ হইলে সে আর অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। অতএব অসৎকে ঘৃণা করিবার কোনও যুক্তি নাই। তুমি অসৎ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া সৎকে উপলব্ধি করিতেছ, অপরে অসৎকে কর্ম্মের দ্বারা বুঝিতেছে পরে সেও তোমার পথ অবলম্বন করিবে। অসতের ফল দুঃখ, সতের ফল সুখ। এই দুঃখই আমাদের অন্তরের বস্তু জাগাইয়া তুলে—এই দুঃখই আমাদের গুরু, শ্রদ্ধার্হ।

* * *

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সাম্যের ভিত্তি ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করায় তাহার ফল পাশ্চাত্য জগতে এক মহাব্যভিচার সৃষ্টি করিয়াছে; মানবের জন্মগত সংস্কার—আত্মরক্ষা এবং সুখলাভেচ্ছা। বৈজ্ঞানিক সাম্য স্বাধীনতার ধারণা লাভ করিয়াও আধ্যাত্মিক একত্বকে না জানায় সে জগতে মৈত্রী লাভ করিতে পারে নাই। সে যেনতেনপ্রকারেণ নিজ ক্ষুদ্রআমিত্বকে ভোগৈশ্বর্য্যের দ্বারা পুষ্ট করিতে ব্যাপৃত। পরার্থে ত্যাগ সে ততটুকু করিতে প্রস্তুত, তাহার ব্যক্তিত্বের পুষ্টির সহিত যতটুকু সমাজ বা জাতির সম্বন্ধ নির্ভর করে। যেমন আমাদের পশু পালন। আমরা তাহাদের নিমিত্ত অর্থের ব্যয় করি নিজ ভোগের জন্য—অকর্ম্মণ্যের স্থান এ জগতে তাহাদের নিকট নাই।

* * *

কিন্তু সর্ব্বরক্ষণশীল বেদান্ত এই সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। বেদান্ত বলেন 'মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা'। আত্মার রক্ষা করিতে হইবে তাহার সসীমত্ব ভাঙ্গিয়া, সর্ব্বভূতে তাঁহার দর্শন করিয়া। যখন এই মহতী কল্পনা উপলব্ধিতে পরিণত হয় তখন শত্রু বলিয়া আর কেহ থাকে না—জগতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। আমারই আত্মা যখন সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান তখন আত্মবোধে জগৎসেবার দ্বারা সুখলাভ করিতে হইবে—সে সুখের অন্তরায়, প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ থাকিবে না। জগতে জড়ের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার তারতম্য নাই। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই সেই এক আত্মার অভিব্যক্তি। আমি হয়ত একটি লহরী তুমি একটি প্রকাণ্ড

তরঙ্গ কিন্তু আমাদের উভয়েরই তলদেশে এক অপরিণামী সচ্চিদানন্দ সত্তা। আমরা কেহ কাহাকেও ঘৃণা করিতে বা পাপী বলিতে পারি না—কেন না, সকলেরই অন্তরের অন্তরতম দেবতা আমার নিজেরই যথার্থ স্বরূপ। পাপ বল পুণ্য বল, ধর্ম্ম বল অধর্ম্ম বল সকলই সেই একই পরমাত্মার লীলা বৈচিত্র্য মাত্র, স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পথে বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র।

* *

এই অদ্বৈত তত্ত্বই মানবের চক্ষে শ্রদ্ধার অঞ্জন পরাইয়া দিয়া হিংসা দ্বেষাবরণ ভেদকারী অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন করিবে। মানুষ তখন বুঝিবে প্রভু সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। ত্যাগ ও প্রেমের উৎস স্বতঃ প্রসৃত হইয়া হৃদয়ের সকল রূঢ়তা, বর্ব্বরতা লোপ করিয়া সরস করিবে। তখনই ভারত ইউরোপের নিকট শিক্ষা করিবে বহিঃ প্রকৃতিকে কি প্রকারে জয় করিতে হয়, আর ইউরোপ ভারতের নিকট শিক্ষা করিবে কি প্রকারে অন্তঃ প্রকৃতিকে জয় করিতে হয়। এই শিক্ষার আদান প্রদানে তথা-কথিত প্রাচ্য পাশ্চাত্য বুদ্ধি লোপ হইয়া যথার্থ ভ্রাতৃভাবের উপলব্ধি হইবে এবং উহাই আগত ভবিষ্যৎ মানবের আদর্শ সমাজ।

পড়ে থাক।

(আনন্দ চৈতন্য)

শত শত প্রাণী ওই তুহারি মতন,
আসে যায় ঘোরে ফেরে কি দিবা রজনী,
তুই মূর্খ কেন এত করিস বিলাপ,
কেন মুখে তোর এত অসম্বদ্ধ বাণী ?
থাক্ পড়ে থাক্ ওরে ওই পথ চেয়ে,
আসিবে আসিবে কালে আসিবে সে ধেয়ে।

আহ্বান।

(স্বামী ভূমানন্দ)

" Instructed by misfortune be now united and prove to the World that one Spirit animates the Polish Nation

—Napolean

ভারতের ভাগ্যে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। এসময় যদি ভারত ভারতী জগতের জাতি সঙ্ঘের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে না পারে—যদি নিজেদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইতে না পারে, সভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতেরও যে দিবার মত অনেক মাল আছে দেখাইতে না পারে—তবে ভারতের মৃত্যু অনিবার্য্য।

ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় সকল অবস্থায়ই অভাবের তাড়নায় অধিকতর জর্জ্জরিত। তাহার ঘরে নাই বলিতে কিছুই নাই—যাহাও বা আছে তাহাও অভাবের তাড়নায় এবং আত্মরক্ষার উপায়ের অভাবে—নাম মাত্র মূল্যে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। খাটাইবার অর্থ নাই, দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার শক্তিও নাই। তার উপর এত মতবাদের প্রচারে শিক্ষিত লোক বহুধা বিভক্ত হইয়াছেন—অশিক্ষিতগণ ক্ষুধার তাড়নায় প্রায় উন্মাদ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কে কার কথা শুনিবে—কেই বা কাকে এই বিঘোরে রক্ষা করিবে? এখন মত প্রতিষ্ঠার জন্য দলাদলি করিবার সময় আছে কি?

সম্মুখে বিশাল ভারতক্ষেত্র। কোটী কোটী নরনারী সে ক্ষেত্রে অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে—বিদ্যার অভাবে পশুপ্রায় বিচরণ করিতেছে, ধর্ম্মের অভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছে—ত্যাগের অভাবে প্রতিবাসীর অনশন ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়াও ক্লেশ বোধ করিতেছে না—নগ্ন প্রায় নরনারী দেখিয়া লজ্জা বোধ করিতেছে না—কত আর বলিব? কেহই কিছু করিতেছেন না—তাহারই মধ্যে যদি কেহ বা কিছু করিয়া থাকেন তাহা দেখে কার সাধ্য। চতুর্দ্দিকে যে ভীষণ কোলাহল উঠিয়াছে—

মাথা যার নাই সে এখন আছে বেশ, যার মাথা আছে তাহাতে তার ব্যথাও ধরিয়াছে ।

কার জন্য এত মতবাদের প্রচার ? জনসাধারণের জন্য ত। জনসাধারণ যদি আসন বসনের অভাবেই লোপাট হইয়া গেল তখন তোমার মতবাদ লইবে কে ?

এই বিঘোরে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় আছে—মুখ বন্ধ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া । কার্য করিতে গেলেই তার দোষ গুণ ধরা পড়িবে —আর তখনই ভারতের কল্যাণের উপায় হইবে ।

আমরা সেজন্য ভারতভারতীকে আহ্বান করিতেছি । এবং বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি—যিনি যে সমাজের, যে ধর্ম্মের, যে মতবাদের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকুন না কেন, তাহাই যে শ্রেষ্ঠ সমাজ বা ধর্ম্ম তাহা তিনি কাজে, জীবনে প্রমাণ করুণ ।

সন্ন্যাসিগণ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায—' বলিয়া যে কথা প্রচার করিয়া থাকেন—এবার কার্য্যের দ্বারা বাক্যের সার্থকতা দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে রাখিবেন । জপ ধ্যান, পূজা পাঠ লইয়া যাহার সমস্ত দিন কাটে না—বাজে গল্পে এবং আলস্যে অবশিষ্ট সময় নষ্ট করা তাঁহার ভাল দেখায় কি ? কেহ অদ্বৈতবাদী হইতে পারেন, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন, আবার কেহ কেহ দ্বৈতবাদীও হইতে পারেন—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ কত কি আছেন—চিত্তশুদ্ধির জন্যই হউক, সেবা বুদ্ধিতেই হউক, দয়ার নামেই হউক—দেখান দেখি আপনার ধর্ম্মমত কতটা উদার হইয়া কত বেশী লোকের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতে পারে ? ভারতবাসীর অভাবের তাড়নায় বুদ্ধি বিভ্রম উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু জগতবাসী সকলেই সে তাড়না ভোগ করে না সুতরাং কথায় আমার সমাজ, আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিলেও সহজে তাহারা বিশ্বাস করিবে না । অথচ তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠা—সমকক্ষতা লাভ করিতে না পারিলে আমাদের নিস্তারও নাই ।

তেমনি গৃহিগণও নিজ মতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কার্য্যে পরিণত করিয়া

দেখান যে দ্বিতীয় আশ্রমে থাকিয়াও জগতে আদর্শ দেখাইতে পারা যায়।

কোন দেশেই সকলে সন্ন্যাসী হয় না, সকলে বাণিজ্য করে না, সকলের ক্ষাত্র বৃত্তি থাকে না। রুচি এবং সামর্থানুসারেই কর্ম্মের বিভাগ বর্ত্তমান। সে ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চ্চারূপ আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের সংবাদ রাখিতে যাইয়া বৃথা শক্তিক্ষয় করা কাহারও সঙ্গত নহে। বরং বিশ্বস্থ হৃদয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া লোকে আপন আপন রুচি এবং সামর্থানুসারে কর্ম্মে লাগিলে, দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন হইবে।

পর দোষ উন্মোচনের প্রচেষ্টাতে মানুষ নিজে 'হাল্কা' হইয়া পড়ে এবং অপরকেও 'হাল্কা' করিয়া ফেলে। হালকা বা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্ভবে কি?

"চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য" সাধন করা যায় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়ে" সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে —জাতিসঙ্ঘে আমাদের স্থান কোথায় হওয়া উচিত তাহা প্রত্যেক ভারত-ভারতীর ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কার্য্যের ফল না দেখিয়া কথায় বিশ্বাস করা মননশীল মানুষের ধর্ম্ম নহে, কর্ত্তব্যও নহে। যে কাজ করিয়া দেখাইতে পারে—তার মতের পোষকতায় লোকের অভাব হয় না। বৃথা নাম, যশ, প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মপ্রতারণা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে মানুষকে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

ভারতে এখন তিনটী সমস্যা সমধিক বিদ্যমান (১) Co-operation (সহযোগীতা) (২) Non Co-operation (সহযোগীতা বর্জ্জন) আর (৩) ফকিরি বা (ত্যাগ)। যদি কেহ বলেন Co-operation ভাল। আমরা বলিব খুব ভাল কিন্তু আপনি Non Co-oparetion মতটা ভুল প্রমাণ করিতে যাইয়া বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া পূর্ণ উদ্যমে কার্য্য করিয়া প্রমাণ করুণ Co-operationই ভাল। তেমনি Non-Co-operation সম্বন্ধেও সেই একই কথাই বলিতে হইবে। "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং।"

আর তুমি ফকির—সকল ত্যাগ করিয়াও ভোগের মোহ যদি না কাটাইতে পার তবে তোমার কথা কে শুনিবে ? ত্যাগে যে অমৃতত্ব লাভ হয় কে জানিবে ? যা তুমিই মান না—তা তুমি কেবল কথায় অপরকে মানাইবে ? তোমার ত্যাগটা 'ঝঝ্ ঝবে' হইবে তবে না লোকে দেখিবে। কোথায়ও কিছু নাই শুধু চিৎকার।

এক্ষণে আসুন সকলে, দেখান আপনাদের মতের মহিমা। বাদবিতণ্ডা পরচর্চ্চা অনেক হইয়াছে—কিন্তু তাতে কাহারও পেট ভরে নাই। এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া যদি অভ্যাস বশতঃ বলিতে ইচ্ছা হয় তখন প্রত্যেক সম্প্রদায় যাঁহারা একটা মল উদ্দেশ্য লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন তাহার বিষয় বলুন—বলুন শ্রীভগবানের নাম জয় যুক্ত হউক—ভারতের কল্যাণ হউক—ভারত ভারতী শান্তিতে থাকুক।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(স্বামী সদানন্দকে লিখিত।)

কল্যাণবরেষু,

বোধকরি—শারীরিক কুশলে আছ। আপনার জপতপ সাধন ভজন করিবে ও আপনাকে দাসানুদাস জানিয়া সকলের সেবা করিবে। তুমি যাঁহাদের কাছে আছ, আমি ত তাঁহাদের দাসানুদাস ও চরণরেণুর যোগ্য নহি—এই জানিয়া তাঁহাদের সেবা ও ভক্তি করিবে। ইঁহারা গালি দিলে বা খুন করিলেও ক্রুদ্ধ হইও না। কোন স্ত্রীসঙ্গে যাইও না—Hardy (কষ্টসহিষ্ণু) হইবার অল্প অল্প চেষ্টা করিবে এবং সইয়ে সইয়ে ক্রমে ভিক্ষা দ্বারা শরীর ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে। যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয়, সেই তোমার গুরু জানিবে। কর্ত্তাত্ব সকলেই পারে—দাস হওয়া বড় শক্ত। বিশেষতঃ তুমি শশীর কথা শুনিবে।

গুরুনিষ্ঠা ও অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ব্যতিরিক্ত কিছুই হইবে না—নিশ্চিত, নিশ্চিত জানিবে। Strict morality (খাঁটি নীতিপরায়ণতা) চাহি—একটুকু এদিক্ ওদিক্ হইলে সর্ব্বনাশ।

ইতি—
নরেন্দ্রনাথ।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

গাজিপুর।
১২ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

বলরাম বাবু,

Receipt (রসিদ) পাবামাত্র লোক পাঠাইয়া Fairlie place (ফেয়ালি প্লেস) রেলওয়ে গুদাম হইতে গোলাপ ফুল আনাইয়া শশীকে পাঠাইয়া—দিবেন। আনাইতে বা পাঠাইতে বিলম্ব না হয়।

বাবুরাম Allahabad (এলাহাবাদ) যাইতেছে শীঘ্র—আমি আর একযায়গা চলিলাম।

নরেন্দ্র

P. S. দেরী হলে সব খারাপ হইয়া যাইবে—নিশ্চিত জানিবেন।

নরেন্দ্র

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত)।

গাজিপুর।
১৫ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

রামকৃষ্ণো জয়তি।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র কল্য পাইয়াছি। সুরেশ বাবুর পীড়া অত্যন্ত কঠিন শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। আপনারও পীড়া হইয়াছে, দুঃখের বিষয়। অহংবুদ্ধি যতদিন থাকে,

ততদিন চেষ্টার ত্রুটি হইলে তাহাকে আলস্য এবং দোষ এবং অপরাধ বলা যায়। যাঁহার উক্ত বুদ্ধি নাই, তাঁহার সম্বন্ধে তিতিক্ষাই ভাল। জীবাত্মার বাসভূমি এই শরীর কর্ম্মের সাধন স্বরূপ—ইহাকে যিনি নরককুণ্ড করেন, তিনি অপরাধী এবং যিনি অযত্ন করেন, তিনিও দোষী। যেমন সামনে আসিবে খুঁৎ খুঁৎ কিছুমাত্র না করিয়া তেমনই করিয়া যাউন।

'নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা॥"

—যে টুকু সাধ্য সেটুকু করা, মরণও ইচ্ছা না করিয়া এবং জীবনও ইচ্ছা না করিয়া—ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কাশীতে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে—প্রমদা বাবু প্রয়াগে গিয়াছেন। বাবুরাম হঠাৎ এস্থানে আসিয়াছে—তাঁহার জ্বর হইয়াছে—এমন অবস্থায় বাহির হওয়া ভাল হয় নাই। কালীকে* ১০৲ টাকা পাঠান গিয়াছে—সে বোধ হয় গাজিপুর হইতে কলিকাতাভিমুখে যাইবে। আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম। কালী আসিয়া আপনাদের পত্র লিখিলে যাহা হয় করিবেন। আমি লম্বা। আর পত্র লিখিবেন না, কারণ আমি এস্থান হইতে চলিলাম। বাবুরাম ভাল হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবেন।

ফুল বোধহয় রিসিট (রসিদ) প্রাপ্তিমাত্রই আনাইয়া লইয়াছেন। মাতাঠাকুরাণীকে আমার অসংখ্য প্রণাম।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সমদৃষ্টি হয়—সহজাত বন্ধন ছাড়াইয়া পাতান বাঁধনে আবার যেন না ফাঁসি। যদি কেহ মঙ্গলকর্ত্তা থাকেন এবং যদি তাঁহার সাধ্য এবং সুবিধা হয়, আপনাদের পরম মঙ্গল হউক—ইহাই আমার দিবারাত্র প্রার্থনা কিমধিকমিতি—

দাস নরেন্দ্র।

---

* স্বামী অভেদানন্দ।

অতুল বাবু—*

আপনার মনের অবস্থা খারাপ জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম—যাহাতে আনন্দে থাকেন তাহাই করুন—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং
ইহ সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।

দাস
নরেন্দ্র।

পুনঃ—আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম—দেখি অদৃষ্ট কোথায় লইয়া যায়।

শান্তি—শ্রীমদাচার্য্য বিবেকানন্দ বিরচিত।

(অনুবাদক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।)

হের উহা আসে মহাবেগে
সেই শক্তি, যাহা শক্তি নয়।
অন্ধকারে যে আলোক জাগে,
দীপ্তালোকে যাহা ছায়া হয়।

অস্ফুট আনন্দ যারে কহে।
তীব্র শোক অনুভূত নহে।
অজীবিত অমর জীবন।
অশোচিত অনন্ত মরণ।

* ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা ৺অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লিখিত এই পত্রটুকু বলরাম বাবুকে লিখিত ১৫ই মার্চ্চের পত্র মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল।

নহে শোক, নহে এ আনন্দ !
সুখ দুঃখ মাঝে করে দ্বন্দ্ব।
নহে রাত্রি, নহে ইহা দিবা—
এ দু'য়ে মিলায়ে দেয় যেবা।

সঙ্গীতের সম যার নাম।
কলা-শিল্পে যা'হয় বিরাম।
বাক্য-মাঝে যাহা নীরবতা।
রিপুদ্বন্দ্বে চিত্ত প্রসন্নতা।

অদৃষ্ট এ শোভা সুষমার।
আত্ম-প্রেমে-প্রতিষ্ঠা যাহার।
অগীত এ সঙ্গীত রাগিনী !
অজ্ঞাত এ জ্ঞানের কাহিনী।

মৃত্যু মগ্ন-ব্যক্ত-প্রাণ মাঝে।
ঝঞ্ঝা-মাঝে শান্তি যথা রাজে।
যেই শূন্যে সৃষ্টির উত্থান।
যথা পুনঃ হয় অবসান।

আঁখি-জল পড়ে যথা ঝরে,
হাসি-রেখা তুলিতে অধরে।
জীবনের যথায় নির্ব্বাণ।
শান্তি মাত্র যার হয় ধাম।

———

বৈদিক ভারত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন)

স্বামী সারদানন্দ—Stray thoughts on Literature and Religion of India তে বলেন "The one peculiarity of the Upanishads in which they all differ from almost all other poetry of the world, is that they never try to express the infinite in the terms of matter, in the terms of bones and muscles."

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের আদি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন মিশর, চীন, বাবিলন প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বপুরুষ উপাসনা প্রচলিত ছিল। তদ্দেশবাসিগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—জড়দেহের ভিতর আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণী আছে—যাহা মৃত্যুর পরও দেহ চিরতরে বিলুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এই ভাবের অনুপ্রেরণা হইতেই প্রাচীন মিশরের ভুবন বিখ্যাত পিরামিড সমূহ ও "মমি" উদ্ভূত হইয়াছিল। অন্যদিকে বৈদিক ও গ্রীস্ দেশীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি প্রকৃতির সুমনোহর শক্তি সমূহের উপাসনা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। মনোরম উষা, স্নিগ্ধ গোধূলি প্রবল ঝঞ্ঝা, ঘর্ঘর বজ্রনাদ প্রভৃতি প্রকৃতির কমনীয় ও প্রচণ্ড দৃশ্যাবলীতে বিমোহিত, বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত চকিত প্রাচীন মানব প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে অতি গুণশীল, অতিমানবরূপে ধারণ করিয়া লইয়াছিল এবং এই প্রকার আবেষ্টনী প্রসূত ভাব ও চিন্তার বিভিন্নতারই বিবিধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—"That I propose to call the struggle to transcend the limitation of the senses." মৃত আত্মীয়ের আত্মার অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ অথবা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সমূহে অন্তর্নিবিষ্ট শক্তি উপাসনা মানব মনের স্বভাবজাত অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অন্বেষণই সূচিত করে। খুব সম্ভব স্বপ্নে দৃষ্ট নানা বিষয় ও

মৃত প্রেতাত্মার দর্শন প্রাচীন মানবকে আরও অন্তর্ম্মুখী করিয়া তুলিয়াছিল। বহু চিন্তাশীল মনীষীর মতে স্বপ্নের প্রহেলিকা ও প্রেতাত্মার দর্শন লাভই প্রাচীনকালে ধর্ম্মের সূচনা করিয়াছিল। মানবমন এই প্রকারে মনস্তত্ত্বের আলোচনায় গভীর নিবিষ্ট হইয়া মন বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন একটি অবস্থার সন্ধান ও অনুভূতি লাভ করিল—যাহাকে প্রহেলিকাময় স্বপ্নও বলা চলে না অথচ যাহা জাগ্রৎ অবস্থাও নহে। প্রত্যেক সুসংবদ্ধ প্রাচীন ধর্ম্মেই এইরূপ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক অবস্থার (Super Conscious State) কথা পাওয়া যায়। বেদের ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা—যিনি এই মহান্ অবস্থার দর্শন ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন।

সংহিতার গাথাসমূহ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, পর্জ্জন্য প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে গীত হইয়াছে। দেবগণের প্রসঙ্গে অনেক অলৌকিক ও রূপক কাহিনী বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়—অহি নামক সর্প মর্ত্ত্যলোকে বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলে ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে অহির সংহার সাধন করিলেন। এবং মানবগণ সুমহৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। দেবগণ সোমপান করিতেন, যজ্ঞাদির সময় তাঁহাদিগকে সোমরস প্রদান করা হইত। ইন্দ্রদেব একবার অত্যধিক সোমরস পান করিয়া অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক সংহিতার অলৌকিক কাহিনীসম্বলিত দেবগণের সহিত অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মবিবৃত দেবগণ বিসদৃশ ও ভিন্ন। বৈদিক দেবগণের বৈশিষ্ট্য এই—তাঁহাদের সকলেরই পশ্চাতে বিরাট অনন্তের ভাব বর্ত্তমান—অন্য কথায় বলিতে গেলে—তাঁহারা একই সত্তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি—সত্তা হিসাবে সকলেই এক কিন্তু প্রকাশের তারতম্যে বিবিধ। এক গাথায় ইন্দ্রদেব মহাগুণশীল অতিমানবরূপে বর্ণিত হইয়াছেন—অন্যত্র তাঁহাকেই আবার সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বপ্রোত বলিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে। এই প্রকার এক এক দেবতাতে ক্রমশঃ ঈশ্বরত্ব আরোপ করাকে ম্যাক্সমুলার "Henotheism" নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন ব্যাবিলীয় ও গ্রীসীয় ধর্ম্মকাহিনীতে দেবতাদের বিপুল সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাবিলনে "মোলক" নামক কয়েকজন দেবতার উপাসনা প্রচলিত

ছিল। 'মোলকগণের কলহে "Jehova" নামক মোলক্ শক্তিমান্ হইয়া শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন ও অপর সকল মোলকের উপাসনা বিলুপ্ত হইয়া গেল। গ্রীস ধর্ম্মও এই প্রকারে "Zeus" পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিকধর্ম্মে এই প্রকার বিপ্লবের কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। বৈদিক ঋষিগণ এক মহান্ উদারতার বন্যায় 'ধর্ম্মরাজ্য হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ভাসাইয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা "একম্ সদ্‌বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" এই সমন্বয় বার্ত্তায় সকল দেবতার অন্তর্নিহিত অখণ্ড একত্বের অনুভূতি লাভ করিয়া সকলকেই সমানভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কোন বিশিষ্ট সমাজের আলোচনায় প্রতীচীন (Subjective) ও পরাচীন (Objective) নানা অন্ধ সংস্কার আমাদিগকে যথার্থ সত্যানুসন্ধান হইতে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। কোনও সমাজের সমালোচনা করিতে আমাদিগকে তাহার অন্তঃসত্ত্বার সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়—তদ্ভাবভাবিত হইয়া তাহারই আদর্শ ও ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর করিয়া বিচার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। অন্যথা বুদ্ধির একদেশদর্শিতা ও দেশ, জাতি ও শিক্ষাগত সংস্কার ভিন্নসমাজের কদর্থ করিয়া সত্যালোচনার পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখে। বৈদিক সমাজকে বুঝিতে হইলে বৈদিক সাধনা—যাহা তৎকালীন সমাজে ওতপ্রোত ছিল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়, নতুবা সামাজিক সাধনা ও আদর্শের বোধহীনতা সমাজ সম্বন্ধে ধারণা কুহেলিকাচ্ছন্ন করে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের শ্রুতিতে আছে—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ—" সুতরাং বৈদিক যুগেই জাতিভেদ প্রচলিত ছিল—প্রমাণিত হয়। জাতিভেদে চারিবর্ণ যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক সত্যদ্রষ্টা, সাধ্যায় ও শাস্ত্রানুশীলন রত ও আইন প্রণেতা ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের উপর পরমার্থের সংরক্ষণ নিমিত্ত দেশরক্ষা ও অন্তর্বহিঃ বিপ্লব দমনের ভার ছিল। বৈশ্য অর্থনৈতিক ও শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। শূদ্র সম্ভবতঃ বিজিত দাসরূপে পারিবারিক শ্রমজীবীতে পরিণত হইয়াছিলেন অথবা অসভ্যতা প্রযুক্ত-

বুদ্ধি ও নীতির কিঞ্চিন্মাত্রও বিকাশ না হওয়ায় প্রথমতঃ আর্যসমাজ-তন্ত্রের ভিতর স্থান প্রাপ্ত হন নাই। এই জাতিভেদ প্রথা কোন সমাজ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নহে—প্রত্যেক সমাজেই এই চারিটি কর্ত্তব্য ও তদনু-যায়ী চারিটি বর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু অপরাপর সমাজে এই অনুষ্ঠানগুলি ভোগাধিকারের প্রেরণা হইতে সম্পাদিত হয় আর ভারতীয় সমাজে এই-গুলি স্বধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সম্পাদিত হইত। অপরাপর সমাজে ভোগাধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কলহ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে—যেমন প্রাচীন রোমে পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের বিবাদ, মধ্যযুগে পোপের অবাধ ধর্ম্মাধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নব্য ইউরোপে ধনজীবী ও শ্রমজীবীর (Capitalists and Labourers) কলহ জনিত সামাজিক বিপ্লব। আর্য্যঋষিগণ এক অভিনব উপায়ে চারিটি বর্ণের ভিতর স্বাধি-কার প্রমত্ততার পরিবর্ত্তে বৈরাগ্য জন্মাইয়া দিয়া সকল প্রকার সামাজিক ভোগাধিকার লইয়া বিবাদ ও অন্তর্দাহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। এই বর্ণভেদের পশ্চাতে বৈরাগ্য ও ত্যাগমূলক আশ্রম ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না দিলে আর্য্য সমাজতন্ত্র অৰ্দ্ধেক বুঝা হইবে। সমস্ত সমাজ যেমন চারিটি বর্ণে বিভক্ত ছিল, ব্যষ্টিজীবন তেমনি এক অভিনব নিয়মের ভিতর দিয়া—Under Psycho-Ethical discipline-সংগঠিত হইত। ব্যষ্টিজীবন চারিভাগে বিভক্ত ছিল—ব্রহ্মচর্য্য জীবন মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, কঠোর সংযম ও গুরুভক্তির ভিতর দিয়া গঠিত হইত,—গার্হস্থ্যে বিবাহ করিয়া সমাজসেবা ও বলিষ্ঠ পুত্রকে বর্ণাশ্রমানু-যায়ী শিক্ষিত ও উপযুক্ত করিতে হইত, বানপ্রস্থে নির্জ্জনে ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস করিয়া শেষ অবস্থায় সাংসারিক যাবতীয় সম্বন্ধ পরিহার পূর্ব্বক আপনার ব্যষ্টিগত অস্তিত্ব অনন্ত সত্তায় ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইত। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন—

'It was this special disciplines of the Asrams which as long as they were faithfully persued by the so-called higher castes developed an ideal of spiritual democracy unknown to the rest of the world.'

আমরা এইবার আর্য্যগণের সামাজিক বিস্তৃতির কথা আলোচনা করিব। যে প্রণালীতে তাঁহারা ধীরে ধীরে অনার্য্য জাতি সমূহকে সাধনায় ও সভ্যতায় উন্নত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—তাহা এক অভিনব ও বিস্ময়কর ব্যাপার। জগতের ইতিহাসে সামাজিক বিস্তৃতি দুই প্রকারে সাধিত হইয়াছে। কোন জাতি অবাধ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ও কোন জাতি রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন দ্বারা বিজাতীয়গণের উপর আপন আপন অধিকার স্থাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মোন্মত্ত আরবজাতি বলপ্রয়োগে পারস্য দেশে অবাধভাবে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা বিজিত জাতির স্বভাব প্রসূত অন্তঃপ্রেরণা ও ধর্ম্মভাবকে বিনষ্ট করিয়া যে অবৈজ্ঞানিক সমীকরণ (Equation) সম্পাদন করিয়াছিলেন—তাহাতে পারস্য জাতির বৈচিত্র্যময় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন দ্বারা প্রাচীন রোমীয়গণ বিজিত দেশ সমূহে বলপ্রয়োগে আপনাদের শিক্ষা ও সভ্যতার অবাধ প্রচলন করিয়া বিজিত জাতি সমূহের আনুশীলনিক আত্মহত্যা (Cultural Suicide) সম্পাদন করাইয়াছিলেন এবং আধুনিক যুগে স্পেনদেশীয়গণ কর্ত্তৃক স্বার্থাধিকারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, পেরু মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংসের সহিত আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ চিরকালের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু আর্য্যগণ ভাবাবেগ ও আধ্যাত্মিকতার এক বিচিত্র প্রণালী দ্বারা (by a strange process of idealisation and spiritualisation) আর্য্যভাবাপন্ন করিতেন। তাঁহাদের প্রণালী সর্ব্বতো ভাবে গঠনমূলক ছিল। অনার্য্য সামাজিক বর্ণভেদের উপর আপনাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ছাপ দিয়া সমগ্র বিজাতীয় সমাজকে আর্য্য নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়া চালিত করিয়া বিভিন্ন রীতিনীতি থাকা সত্বেও চিন্তাপ্রণালীর ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন এবং কোন প্রকার বহিঃবিপ্লব ব্যতীত সমগ্র অনার্য্য সমাজ আর্য্যসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া উন্নত হইয়া উঠিত। এই ভাবে আর্য্যভাবাপন্ন করিতে গিয়া আর্য্যগণ যেমন অনার্য্য জাতির ভিতর আপনাদের মহান্ সাধনা প্রবিষ্ট করিয়া দিতেন সেইরূপ অনেক অনার্য্য রীতিনীতি ও

দেবতাকেও আপনাদের ছাঁচে গঠিত করিয়া আর্য্যসমাজে স্থানদান করিতে বাধ্য হইতেন।

ঋগ্বেদে বশিষ্ঠদেবের সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে। এইরূপ স্থানে স্থানে উল্লিখিত অর্ণবোপোত সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দ্বারা মিশর, আসিরীয়া, বাবিলন, আরব প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সহিত বৈদিক ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের অকাট্য প্রমাণ বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 'History of Indian Ship-building and Maritime activity' তে লিখিয়াছেন— India thus began her sea borne trade with the very begining of recorded time and the trade of the Rigveda was very probably carried on with countries on the west like Chaldea Babylon and Egypt. প্রসিদ্ধ আসিরীয় তত্ত্বজ্ঞ Dr Sayce সংলগ্ন বাবিলন রাজ্যের রাজা "Urbugus" এর রাজধানী 'Ur' নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখণ্ড ভারতীয় "Teak" (সেগুন) বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া অনুমান করেন খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাবিলনের বাণিজ্য সম্বন্ধ বর্তমান ছিল। তিনি বলেন—প্রাচীন বাবিলনে মসলিন অর্থে সিন্ধু শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। ডাক্তার Hewett এর মতে এই প্রকারের সেগুন কাঠ মালাবার উপকূল হইতে নীত হইত। মিশর তত্ত্বজ্ঞগণ প্রমাণ করিয়াছেন ভারতবাসী মিশরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, মূল্যবান প্রস্তর, চন্দন কাষ্ঠ ও বানর ভারতবর্ষ হইতে মিশরে রপ্তানী করা হইত। Heeren Lassen প্রভৃতি পণ্ডিত প্রমাণ করেন—জগত ইতিহাসের শৈশব হইতে আরবদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। ডাক্তার Caldwell বলেন— It appears certain from notices contained in the Vedas that the Aryan of the age of Solomon practised Foreign trade in ocean going vessels.

প্রাচীন জগৎ সভ্যতায় ভারতবর্ষের দান পণ্ডিত মণ্ডলীকে যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিতেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণই যে মিশরে

উপনিবেশ স্থাপন করিয়া মিশরীয় সভ্যতার পত্তন করিয়াছিলেন পোকক্, কর্ণেল অল্কট প্রভৃতি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এম্, ব্লুমেনবাক্ মিশর-বাসীর মাথার খুলির সহিত বাঙ্গালীর খুলির সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণই নীলনদের নামকরণ করিয়াছিলেন। According to Lenormant the bas relief of the temple of Deir-el Bahari at Thebes represent the conquest of the land of Pun by Hatasu উহা নিঃসন্দেহ ভারতবাসীর মিশর অভিযানেরই কথা। বাবিলন ও আসিরীয়ায়ও যে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল তাহারও অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক জ্যারন্‌স্‌জারণা বলেন "কালডীয়, বাবিলনীয় ও কোলচিস্‌গণ ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' কালডীয় 'কুলদেবতা' শব্দের অপভ্রংশ। আসিরীয়া রাজ্যের রাজগণের নামের সহিত ভারতীয় নামের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান টাইগ্রাস ও ইউফ্রেতিস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেই প্রাচীন বাবিলনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা ও উহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশে পারস্যের সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল। মিষ্টার পোকক্ বলেন—'The Parasoos, the people of Parusoo Ram those worriors of Axe have penetrated into and given a name to Persia they are the people of Bharat and to the principal stream that pours its waters into the Persian Gulf they have given the name of Eu-Bharat es (Euphrat-es) the Bharat Chief চীনদেশেরও সভ্যতা বহু প্রাচীন। মনুসংহিতা ও মহাভারতে চীনদেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ চীনদেশীয় সূর্য্যোপাসনা, ভাষা ও রাশিচক্র প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের সাদৃশ দেখিয়া ভারতবর্ষকেই চীন সভ্যতার আদিভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। রাজস্থানে টডসাহেব লিখিয়াছেন— The genealogists of China and Tartary declare themselves to be the decendants of Awar (আয়ুর) Son of the Hindu King Purur Dawa এতদ্ব্যতীত প্রাচীন জগত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিকট কত ঋণী এই সম্বন্ধে সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত জ্যারণ্‌স্-

জারণা বলেন—"It is there (India) we must seek not only for the cradle of Brahmin relgion but for the cradle of the high Civilisation of the Hindus which gradually extended itself in the west to Ethiopia, to Egypt to Phoenicia in the east to Siam to China and to Japan, in the South to Ceylon to Java, to Sumatra , in the north Parsia to Chaldea and to Cholchis, whence it came to Greece and to Rome and at length to the remote abode of the Hyperboreans

---

ঝড়ের তরী

(ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য)

ওগো আমার নায়ের মাঝি
ওগো পারের মাঝি
এই বাদলে ডাকছি তোমায়
কোথায় তুমি আজি ।
মেঘের পরে মেঘ করেছে
বইছে প্রবল বায়
ভাবের গাঙে ঢেউ উঠেছে
লাগ্‌ছে তরীর গায় ।
আকাশ মাঝে ঐ যে বাজে
গভীর ঘটার রব
চমক লাগে গুমর্‌ শুনে
হই যে নীরব শব ।
আর না হেরি কোথায় কাকে
শুধুই আঁধার ময়
এবার বুঝি ডুব্‌লো তরী
সদাই আমার ভয় ।
তাইত তোমায় ডাক্‌ছি ওগো
কোথায় তরীর মাঝি
নেওগো বেয়ে অপর পারে
হাল ছেড়েছি আজি ।

মনুষ্যত্বের সাধনা

(৮)

অকারণ-পুলক।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

কেন এ আনন্দ কিসের আনন্দ কে জানে? বৃন্দাবনে যখন প্রথম বংশীধ্বনী হইয়াছিল ব্রজকুমারীগণ উৎকর্ণা হরিণীর ন্যায় বংশীধ্বনী শুনিয়া নানা জনে নানা ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। কিসের ধ্বনি কোথা হইতে আসিতেছে কিছুই জানেন না তথাপি অকারণ-পুলকে তাঁহাদের প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরাধিকা যখন রতন-মন্দির, গুরু-গঞ্জনা, লোকাপবাদের ভয় ও দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, সকলই ত্যাগ করিয়া দ্বিপ্রহরা ঘোরা বর্ষা রজনীতে গহন কাননে বংশীধরের উদ্দেশে ছুটিয়াছিলেন তখন এই অকারণ-পুলক তাঁহার পথের সঙ্গী হইয়াছিল। এই অকারণ পুলকের স্পর্শমণি যখন চিত্তকে স্পর্শ করে তখন কোন দুঃখই আর ভয়াবহ হয় না কোন সুখই আর স্পৃহনীয় হয় না।

যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে।

এই অকারণ-পুলক ত্যাগের কষ্টি পাথর। জগতে শত শত ত্যাগের সুবর্ণ এই কষ্টি পাথরের নিকষে মেকি বলিয়া ধরা পড়ে। যখন দারুণ কর্ত্তব্য ভারে পীড়িত মানব শ্রান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলে 'এত যে করিলাম কি তাহার ফল হইল?' তখনই ধরা পড়ে মহৎ কর্ত্তব্য প্রেমের মধ্যে তাহার আত্মপ্রেমও কিছু সংগুপ্ত ছিল; কর্ত্তব্য সেবায় অকারণ-পুলকে যাহার প্রাণ ভরপুর, ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিবার তাঁহার অবসর কোথায়, অন্যের কাছে যতই কেন শ্রদ্ধা লাভ হোক না কেন যতক্ষণ না নিজে শ্রদ্ধা লাভ করা যায় তত ক্ষণ অকারণ-পুলকের সন্ধান মিলে না সেই জন্য দেখা যায়, কেহবা বহুজনের সম্মানেও আনন্দিত নহেন আর কেহ বা অসম্মানেও পরম

আনন্দে থাকেন। লোকহিতাকাঙ্ক্ষী যখন 'লোকে কিছু বুঝিল না' বলিয়া ক্ষোভ করেন, তখনই বুঝা যায় তাঁহার পরার্থে কৃত মঙ্গল কর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা কামনার যে সামান্য ছায়া ছিল ক্ষোভ তাহা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আবার যখন 'আমি ক্ষুদ্র এ সম্মান কি আমার শোভা পায়?' এই সঙ্কোচের ভাব দেখা যায় সেই সঙ্কোচই আত্ম সঞ্চয়ের পরিচয় দেয়। বিনয় বচন বিনয়ীর ভূষণ হইতে পারে, কিন্তু সেই অকারণ-পুলকের তরঙ্গ ইহাতে নাই—যে তরঙ্গে সম্মান দাতা ও গৃহীতা একই হইয়া সরল শিশুর মত হাসিমুখে এক আনন্দই উপভোগ করেন। কর্ম্মের দুর্গম পথে নানা বিতর্কে তখনই চিত্ত বিক্ষেপ ঘটে, যখন এই অকারণ-পুলক পথের সঙ্গী হয় না।

যদি তোর আপন হতে অকারণে,
দিবারাত সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে তুই তর্ক করে কথায় কথায়,
করবি রে নানা খানা।
ষোল আনা আদায়।

বুঝা গেল, ত্যাগে এতটুকু খাদ ও অকারণ-পুলকের নিকষে গ্রাহ্য হয় না। বংশীধ্বনী মধুর, এটী চিরদিনের বিখ্যাত কথা। কিন্তু বংশীধ্বনী যে কেবল মধুর তাহা নয়, বজ্রাঘাত তুল্যও বটে।

'আমার ধৈর্য্য হেমশালাগার,
গুরু গৌরব সিংহদ্বার,
ধরম কপাট ছিল তায়,
বংশীরব বজ্রাঘাত
পড়ে গেল অকস্মাৎ
সমভূমি করিল তাহায়।"

শ্রীরাধিকা বলিতেছেন 'সখি আমার ধৈর্য্য রূপ হেম অট্টালিকা, কুল-গৌরব ও গুরুজনের ভয় তাহার সিংহ দ্বার। লোক কর্ম্ম তাহার কপাট ছিল। কিন্তু বংশীরববজ্রাঘাতে সে সমস্ত চূর্ণ হইয়া একেবারে সমভূমি হইয়া গেল। বজ্রাঘাতের মত বংশীধ্বনী কখন যে কাহার বুদ্ধি

ও পাণ্ডিত্যের অভিমান, কুল গৌরব এবং লোক ধর্ম্মের প্রবল বাধা চূর্ণ করিয়া ফেলে কে তাহা বলিতে পারে? সে বজ্রাঘাত এমন সমভূমি করিয়া দেয় যে এতটুকু ইষ্টক স্তূপও তাহাতে মাথা উচু করিয়া থাকিতে পায় না। শ্রীমদ্ভাবতে আছে, ব্রজকুমারীগণ কৃষ্ণকামনায় কাত্যায়নী অর্চ্চনার পর স্নানার্থে যমুনায় অবগাহন করিলে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাঁহাদের লৌকিক লজ্জার শেষ বন্ধন স্বরূপ বসনগুলিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশু যেমন সর্ব্বরিক্ত হইয়া জননীর ক্রোড়ে আসে সেইরূপ সর্ব্বরিক্ত না হইলে আনন্দরূপা জননী তাঁহাকে অঙ্কে, গ্রহণ করেন না। এমন সর্ব্বরিক্ত হইতে হইবে, যে বৈষ্ণব শাস্ত্রকর্ত্তা রূপগোস্বামী বলিয়াছেন "স্বানন্দ সুখানুভূতি" যদি "কৃষ্ণ সেবার" বিঘ্ন হয়, ভাবের সে বিলাসিতাটুকু বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৯)

কর্ম্ম ও অকর্ম্ম।

সেই জন্য কর্ম্মের বাহিরের বিচারের বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয় যে কোনটী কর্ম্ম কোনটী বা অকর্ম্ম, কোনটী ত্যজ্য কোনটী গ্রাহ্য, কোন কর্ম্ম বন্ধন ছেদনের অস্ত্র কোনটী বা নূতন বন্ধন। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী মনের নিকষে কেবল ইহার পরীক্ষা—আর কোন বিচারকই তাহার বিচার করিতে পারেন না। কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিচার সম্বন্ধে গীতা এক কথায় বলেন—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকেঽয়ং কর্ম্মবন্ধন।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঠিক এই কথাটীই আর একভাবে লেখা হইয়াছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য আত্মসুখেচ্ছা কেবল,
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য ধরে প্রেমমহাবল।

"যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধন স্বরূপ। অতএব হে কৌন্তেয় স্বার্থ কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল যজ্ঞার্থেই কর্ম্ম আচরণ কর।"

অন্যত্র ভগবদুক্তিতে—

"মদর্থমপি কর্ম্মানি কুর্ব্বণ সিদ্ধিমবাপ্সসি।"

কিম্বা—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা।"

"আমার জন্য কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই কর্ম্মের স্বার্থকতা লাভ করিবে।"

"ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মে সমর্পানের জন্য কর্ম্ম করেন পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না সেইরূপ কর্ম্মজনিত কোন দোষই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

এই সকল উক্তি একত্র মিলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে "যজ্ঞার্থে" "কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য" "মদর্থে" বা "ব্রাহ্মণ্যাধায়" সবই যে এক, তাহা বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। যজ্ঞ ব্যাপারটী কি? না আহুতি দেওয়া। মানব যখন বিন্দুমাত্র আত্মসঞ্চয় না রাখিয়া কেবল কোন এক মহান্ ভাবের প্রেরণায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তখনই সে যজ্ঞের জন্য কর্ম্মাচরণ করে। তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম যাহা স্বার্থ মূলক, যাহা ফলের আশায় ক্ষণিক উত্তেজিত আবার নিরাশায় ম্রিয়মান অবসাদগ্রস্ত করে—যাহা কৃপণের ধন গণনার ন্যায় নিয়ত লাভের অঙ্কগণনার মাদকতায় মানবচিত্ত বিমোহিত এবং ক্ষতি পূরণের নব আশায় এমন ভাবে জড়িত করে যে চেষ্টা করিয়াও তাহা হইতে মুক্তিলাভ দুঃসাধ্য হয়,—সেইরূপ কর্ম্মই বন্ধন স্বরূপ।

"কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য ধরে প্রেমমহাবল।"

আপনার ভারে পীড়িত কাম দুর্ব্বল, কিন্তু কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য ধারণের স্পর্দ্ধা যাহার সে প্রেমমহাবল। মনস্তত্ত্ববিদ্‌ বলেন মনের এমন গূঢ় অংশ আছে, যাহা বুদ্ধির আলোকে সকল সময় প্রকাশ পায় না, আমাদের নিজের ভাব নিজের ইচ্ছা নিজের নিকট প্রচ্ছন্ন অজ্ঞাত থাকে। স্বপ্ন

অনেক সময় সেই মনের আভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে। এই জন্য স্বপ্নের অর্থ সহজবোধ্য নয়, যেন রহস্যময় প্রহেলিকার মত। সেইরূপ কবিতা যেন সমগ্র জাতির স্বপ্ন, তাই কবিতা ও অনেক সময় রহস্যময় প্রহেলিকা। কবি সাধারণ জীবনে ব্যক্তি মাত্র হইলেও যখন তিনি কবি তখন সমগ্রের প্রকাশ স্বরূপ। একের অঙ্গুলী আঘাতে যখন বহু হৃদয় ঐক্য তানে বাজিয়া উঠে, বীণা বাদক তখনই "কবি" আখ্যা লাভ করেন। কবি,—কবি, ইহাই মাত্র তাঁহার পরিচয়। তাঁহার কাব্য জগতের সম্পত্তি—ব্যক্তির ভাবে সে সম্পত্তির কেহই অধিকারী নহে। বহুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব বোধ ডুবাইয়া সমগ্রের সহিত এক হইয়া তিনি যখন কবির স্বরূপ প্রাপ্ত হন তখন তো তিনি উপাধি পরিচয়ে চিহ্নিত ব্যক্তিমাত্র থাকেন না। "সোনার তরী" কবিতার স্বপ্ন প্রহেলিকার মধ্যে এই ভাবই আমাদের মনে আসিয়া লাগে। "রাশি রাশি ভারা ভারা" কর্ম্ম রাশির সোনার তরীতে স্থান হয় কিন্তু একটী মাত্র ব্যক্তির তাহাতে স্থান হয় না। দ্রৌপদীর অন্নস্থালী জগতের সমস্ত প্রাণীর ক্ষুধা শান্তি করিতে পারে কিন্তু তিনি নিজে আহার করিলেই সে স্থালী শূন্য হইয়া যায়।

কোনটী কর্ম্ম কোনটী অকর্ম্ম সে সম্বন্ধে সকলেরই কতকগুলি সাধারণ ধারণা আছে। কিন্তু গীতায় ভগবদুক্তিতে সে ভাবে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিচারিত হয় নাই। গীতা বলেন—"এই কর্ম্ম যোগের কোন বিশেষ ক্ষেত্র নাই।

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত।"

সকল ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

"যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না সেইরূপ ব্যক্তিত্ব বোধ জনিত ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মে সমর্পনের জন্য কর্ম্ম করেন, কর্ম্ম জনিত কোন দোষই তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

যাহার ব্যক্তিত্ব বোধ জনিত অহংজ্ঞান নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি

স্বার্থাশ্রিত লাভালাভ বোধে কর্ম্মে লিপ্ত হয না, তিনি এই সকল লোককে হনন করিয়াও হনন করেন না এবং তজ্জনিত ফলে নিবদ্ধ হন না ।

ত্যাজ্যং দোষ বদিত্যেক কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মণীষিনঃ ।
যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ।

"কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্মে দোষ ঘটিবে বলিযা তাহা ত্যাগ করিতে বলেন কিন্তু অপর মনীষিগণ যজ্ঞ দান ও তপস্যা রূপ কর্ম্ম অত্যাজ্য বলেন ।

"যজ্ঞ দান ও তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ ।
যজ্ঞ দান তপশ্চৈব পাবননি মনীষিণাম ।

যজ্ঞ দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম পবিত্যাজ্য নহে ।—অবশ্য কর্ত্তব্য কেননা যজ্ঞে দান তপস্যাই মনীষিগণের চিত্ত পবিত্র করে ।

যজ্ঞের অর্থ আত্মোৎসর্গ দান—কর্ম্মবর্জ্জিত জীবনসম্বল প্রতিদান কামনা না রাখিয়া দান, তপস্যা কৃচ্ছ সাধন ।

"লা মিজারেব্‌লে" ভিক্টর হুগো আত্মোৎসর্গের একটী চিত্র দিয়াছেন । ভগিনী সিমপ্লিস্ শৈশবে কুমারী ব্রত গ্রহণ করিয়া পরসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন । তাঁহার কথোপকথন, রোগীকে শোকাকে সন্ত্বনা দান বা ভগবৎ-গুণকীর্ত্তন, তাঁহার বিচরণ ধর্ম্মমন্দিরে অথবা রোগী কি সন্তপ্তের গৃহে তাঁহার হস্ত দুইখানি স্বার্থের কামনা সংশ্লিষ্ট কোন কর্ম্মেই কখনও দূষিত হয নাই, জীবনে তাঁহার জিহ্বায় কখনও কোন অসত্য বচন উচ্চারিত হয় নাই । জিন ভ্যালজিন্ পুলিসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থে যে গৃহে লুক্কায়িত হইয়াছেন ভগিনী সিমপ্লিস তথায় কোন হতভাগিনীর শবশয্যার পার্শ্বে উপাসনারত । ইন্‌স্পেক্টর জ্যাভার্ট পশুপ্রকৃতি হইয়াও সম্ভ্রমবশতঃ সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না, দুয়ার হইতে জিজ্ঞাসা করিল—

"ভগিনী, ওখানে কি আপনি একা আছেন ?"

ভগিনি উত্তর দিলেন "হাঁ ।"

"আর কাহাকেও দেখিয়াছেন ?" "না ।"

ভিক্টর হুগো বলিতেছেন, "ইন্‌স্পেক্টর জ্যাভার্ট যদি সম্মুখেও জিন ভ্যালজিনকে দণ্ডায়মান দেখিত, তাহা হইলেও সে তাঁহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইত, কেননা ভগিনী সিমপ্লিস্ কখনও মিথ্যাকথা বলেন না ।"

পরে ভিক্টর হুগো আবার বলিতেছেন "হে ভগিনী, আজ তুমি স্বর্গে তোমার সঙ্গিনী কুমারীগণের সহিত ভগবানের স্তুতিগানে আনন্দমগ্ন রহিয়াছ, এবং সেখানে তোমার চিরজীবনের ব্রতভঙ্গস্বরূপ ঐ দুইটী মিথ্যা কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।"

ভগিনী সিম্‌প্লিসের আত্মোৎসর্গের প্রসঙ্গে আরও বহু প্রসঙ্গ মনে আসে। এখানে ধাত্রী পান্নার কথাটাই কেবল উল্লেখ করিব। উদয়পুরের রাণার জীবনরক্ষয়িত্রী ধাত্রী পান্নার কাহিনী কে না জানেন? রাজ্যলোলুপ বনবীর শিশু উদয়সিংহের প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে পান্না রাজবংশধরের রক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া হত্যাকারীর নিকট রাজপুত্রের সমবয়স্ক নিজ পুত্রকে রাজপুত্র বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়াছিল। এমন কে জননী আছেন, যিনি এই ঘটনা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া না উঠিবেন। ভগবান্ যে শিশুরভার বিশেষ করিয়া জননীর উপরেই অর্পণ করিয়াছেন, সেই অনন্যগতি একান্ত মাতৃনির্ভর পরায়ণ শিশুকে জননী যদি নিজহাতে হত্যাকারীর হস্তে তুলিয়া দেন, সে জননীকে, জগৎ রাক্ষসী ভিন্ন আর কি আখ্যা দিতে পারে? যে আত্মোৎসর্গ জগতের এবং নিজের মাতৃহৃদয়ের নিকট এই রাক্ষসী আখ্যা গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, সে যজ্ঞ, সে দান ও সেরূপ তপস্যার প্রকৃতি নির্ণয় করাও সুকঠিন।

তুমি ও আমি।

(আনন্দ চৈতন্য)

তুমি,—অনন্ত মহিমা-পূর্ণ অনন্ত সাগর,
আমি,—বাসনা শৈবাল-পূর্ণ ক্ষুদ্র সরোবর।
তুমি,—গুণাতীত নিরঞ্জন ব্যক্ত চরাচর,
আমি,—রিপুতপ্ত সান্ত সদা দেহের ভিতর।

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

ধর্ম্ম।

(২)

(শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত বি, এ,)

তাই ব'লে 'সখের ধর্ম্মে'র দায়িত্ব-জ্ঞান নেই, এমনটা কেউ মনে করো না। বরঞ্চ এমন টনটনে দায়িত্ব-জ্ঞানের নাড়ী তুমি আর কোথাও বড় একটা দেখ্‌তেই পাবে না। দেশের ছেলে হয়েও যদি তুমি নেহাৎই এর প্রমাণ চাও, তবে হাতে-কলমে আর ক'টা তোমায় দেবো? ব্রত-পার্ব্বণ বা পূজোর দিনে দু'মিনিট কাল খান কয়েক বাড়ী একটু চোখ মেলে ঘুরে এলেই তুমি সব বুঝ্‌তে পারবে। দেখ্‌তে পাবে,—একদিকে যেমন অগ্রাণ মাসের রবিবারে নাটাই ব্রতে একুশটির জায়গায় কচুরপাতা বিশটি এনেছ বলে, বাড়ীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী বয়স্ক ছেলে বা মেয়েকে ঠেঙ্গিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর বাহির কচ্ছেন, অপরদিকে তেম্নি আবার শ্যামামার পূজোর জন্যে বাড়ীর ছোট বড় সকলের, মায় আত্মীয়-কুটুম্বের সংখ্যা গুণে গুণে, দুর্দ্দিনে ধার করেও বেছে বেছে জোয়ান তিনটি কাল পাঁঠা আনা হয়েছে। তবে 'মধু অভাবে 'গুড়ং দদ্যাৎ'-বিধি না আছে এমন নয়। কিন্তু মধুই হোক, আর গুড়ই হোক্, পণ্ডিত ঠাকুর বা পুরুত ঠাকুর পূজোর যে ফর্দ্দ দাখিল করেছেন, তার অবমাননা করবে, এত বড় দশ কণ্ঠ কি ভূ-ভারতে কেউ আছে? ঐ যে বগলে দেখ্‌ছো তাল-পাতায় গোল করে লেখা, ওরই নাম শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে তবে দেওয়া হয়েছে এই ফর্দ্দ। কেবল কি এই? ঐ ফর্দ্দের তালিকা দেওয়া দ্রব্য-সম্ভারকে অবলম্বন করেই যে পূজোর দেবতা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নিয়ে আবির্ভূত হবেন। সুতরাং এর কি আর ব্যতিক্রম হবার যো' আছে? এদিক্ ওদিক্ করেছ কি সবংশে নির্ব্বংশ হয়েছ!! আর যদি হুঁসিয়ার হয়ে ঠিক ঠিক ফর্দ্দ মেনে চল, তবে কোন ভয় নেই। মরে বার আনার খাটিয়ার শুয়ে শ্মশানে পৌঁছ্‌বার আগেই

চোঁচা স্বর্গে গিয়ে উঠবে। যা' হোক্, এইটুকু বিধিবাদ মেনে জিনিষ পত্র সব পূজোর ঘরে বা চণ্ডীমণ্ডপে পৌছিয়ে দিলেই বাড়ীর কর্ত্তা খালাস। অনেকের ত সেখানে ঢুকবারই অধিকার নেই। কারণ কিছুকাল পরেই যে সেখানে জগৎ-পিতা বা জগন্মাতার আবির্ভাব হবে। যাদের অধিকার আছে, অর্থাৎ যাদের ঐ শাস্ত্র পূজোর ঘর ঢুকতে নিষেধ করেনি নি, তা'রাও জিনিষ-পত্রের বিলি-ব্যবস্থা করে ও ঘরে যত না ঢুকেন ততই মঙ্গল। তখন কর্ত্তৃপক্ষও সেদিকে আর ততটা তাকাতেও পারেন না। একে ত দায়িত্বের লেঠা ঢুকে গেলে সেদিকে ফিরে মনটা দেওয়াই মুস্কিল, তাতে আবার সময়েরও যে অভাব পড়ে যায়। এতকাল ধর,—মাকে তিন বৎসর তিন দিন ধরে বাইজীর গান শুনিয়েছি, এখন দিন কাল বদ্‌লে গেলে কি হয়, একদিন ত অন্ততঃ ঐ রকম গান শোনান চাই? নৈলে বাড়ীর ছোকরাদেরও মন ভেঙ্গে যাবে, দেশের লোকের কাছেও ছোট বনে যেতে হবে। পিতৃ-পুরুষের নাম রক্ষাও ত চাই?—আর পূজো?—সে ত ঠাকুর ঘরে হচ্ছে, যথাসময়ে মন্ত্রের ফোঁটা পরে আশীর্ব্বাদ নিলেই হবে'।

তুমি সর্ব্বত্রই এই একই হাল দেখবে, এমন বলতে পারিনে। বাইজীর গান, যাত্রাগান বা কবিগান ছেড়ে, ঈশ্বর বা ঈশ্বরী কীর্ত্তন-গানও ভালবাসেন। তিলককেটে, নামাবলী গায়ে, জপের মালা হাতে ভক্তবৃন্দ দের বা দেবীর সঙ্গে কীর্ত্তন শুনতে বসেন। ভক্তি দেখে চমকে উঠনা ভায়া। ঐ পাশের বাড়ীর কাঙ্গালী ধোপা কি বলে শোন। "পূজো বাড়ীর কর্ত্তা নাকি ভারি কৃপণ। তবে আনন্দের দিনে বাড়ীটা একেবারে নীরব থাকবে, লোকেও সাত কথা নিয়ে কাণাকানি করবে, তাই একটা ব্যবস্থা করেছেন। মা ত বৈষ্ণবী। হরিনামই ভালবাসেন। বাড়ীর ছোকরা বাবুরা এ সব পছন্দ করেন না। তা'রা অন্যপাড়ায় থিয়েটার দেখ্‌তে গেছেন।"

তবেই হ'ল, ধর্ম্ম এলেন আচারে। এই আচারকে আবার খুব আঁকড়ে ধরে থাকার নাম হ'ল নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা। এটা যিনি যত দেখাতে পারেন, তাঁর তত ভক্তি, তিনি তত ভক্তিমান্। বেঁচে থাকতে তুমি তাঁর

বুদ্ধিশুদ্ধির যত অপবাদই কর না কেন, মৃত্যুর পর তিনি যে একেবারে First grade promotion পেয়ে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুদেবের ডান্ পাশে seat পাবেন, এটা তুমি বিশ্বাস না কল্লেও তিনি খুব ভাল রকমই জানেন। তার কারণও আছে। এই ঈশ্বর বা বিষ্ণুদেবকে ভক্তি কর্ত্তে গিয়ে তাঁর জন্যে তিনি না করেছেন কি? সমাজ ঘর, মন্দির বা সপ্তাহান্তে রবিবারে হরি-সভা,—এতে অবকাশ মত তিনি যোগদান করেছেন। উৎসবের চাঁদার খাতা খুলে দেখ, তাঁর নাম পাবে। তারপর শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে তিনি বিলাত-ফেরতের সঙ্গে কখনো মেলামেশা করেন নি। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল,—এরা চিরদিনের অপবিত্র জাতি কখনো এদের তিনি স্পর্শ করেন নি। ষষ্ঠী পূজো হ'তে আরম্ভ ক'রে পঞ্চম বর্ষায় বালিকার বিবাহ ব্যবস্থা তিনি যথাশাস্ত্র পালন ক'রেছেন। এখন তুমি বুঝে বল দেখি কি ক'রে তিনি বৈকুণ্ঠে স্থান পাবার অধিকারী নন্? ঈশ্বর সব দেখ্‌তে পান, আর এত বড় মোটা কাজগুলি তাঁর চোখে পড়বে না? তোমরা বল কি?

এই আচারে ধর্ম্ম কি করে দেশে ঢুকেছে, কবেই বা ঢুকেছে, সে বিচার বা ইতিহাসের আলোচনা এখানে কর্‌ব না। যখন যে ভাবেই ঢুকে থাকুক্, দেশে ধর্ম্ম কিন্তু সাধারণের মধ্যে এই আচার নিয়েই চল্‌ছে। ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ কেউও কখনো কর্‌তে পারে না সত্য, কিন্তু ধর্ম্মই যে দেশের সকল বিষয়ের, সকল কার্য্যের, সকল চেষ্টার, সকল সফলতার একমাত্র প্রাণ, তার পথে ভুল করে চল্লে বা তার খেই হারিয়ে ফেল্লে, কেবল যে দেশটা ধর্ম্মশূন্য, সুতরাং প্রাণহীন হয়ে পড়্‌বে, এমন নয়; সঙ্গে সঙ্গে ইহকালেরও সকল উন্নতির আশা একেবারে চুরমার্ হয়ে যাবে। একি চোখের উপর দেখা যাচ্ছেনা? দেশে ধর্ম্ম বা নীতি সম্বন্ধে প্রতিমাসে যত বক্তৃতা, যত লেখা-লেখি হচ্ছে, সেগুলি একত্র কল্লে বুঝি বা ধর্ম্ম-স্বরূপ স্বয়ং ভগবানও অবাক্ হয়ে যাবেন। অথচ এই দেশটার যে দিকেই তাকাও দেখ্‌বে, ধর্ম্ম যিনি, তিনি দুপ্‌টি মেরে পড়ে রয়েছেন, আর বাইরে ঢাক, ঢোল চেঁচামেচি, যত সব বিকারের রোগীর হাত, পা-খিঁচুনি। দেখে দেখে, শুনে শুনে, স্বতঃই বল্‌তে ইচ্ছা

হয়, ধর্ম্ম ধর্ম্মতেই লুকিয়ে আছেন; দেশের সর্ব্বঘটে তাঁর পূজোর আয়োজন হয় নি। আর যতদিন এটি না হবে, ততদিন ধর্ম্মের কি কথা, কোন বিষয়েই এদেশের আশা নেই। সবাই পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির হবেন, এমন আশা করা যায় না সত্য, কিন্তু ধর্ম বা সত্যের পথকেই আদর্শ রেখে, তারই পথে ঠিক ঠিকভাবে চলবার একটা সাধারণ ঝোঁকই কি আমাদের দেশে সর্ব্ববিধ জাগরণের একমাত্র উপায় নয়?

বাংলাদেশের যুবকবৃন্দের উপর দেশের অনেক কল্যাণ নির্ভর করে। স্বামীজি একথা নানাস্থানে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। ঠাকুরের ভাবও ধীরে ধীরে তাঁদের ভিতর প্রকাশ পাচ্ছে, এও বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এখন যদি তাঁদের অবস্থা আলোচনা করতে অগ্রসর হই, তবে বোধহয় সেটা অসঙ্গত হবে না। আর আমার বিশ্বাস আছে, যদি যথার্থ কথা বলতে গিয়ে বাধ্য হয়ে আমাকে দু'একটা তীব্র কটাক্ষ করতে হয়, তবে তার জন্য তাঁরা যেন কাবে চটে উঠবেন না। আমি অন্তরের সঙ্গে তাঁদের কার্য্যকারিতা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বলেই তাঁদের কথা তাঁদের কাছে বলতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। সত্য বটে, দোষ দেখিয়ে, কষোবক্তা দ্বারা কা'কেও পথে আনা যায় না; কিন্তু Addison এর to correct by indulgenceই ভাল? দেশে যাঁরা আদর্শ যুবক, তাঁদের কাছে আমার কিছুই বল্‌বার নাই; বরং শিখবারই আছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কয়টি নিয়ে? কাজেই কথা আমাকে সাধারণ ভাবেই বলতে হবে।

পুরাণে আছে, প্রহ্লাদ ভারি হরিভক্ত ছিল। বাপ হিরণ্যকশিপু একে গোঁয়ার, তার আবার হরির সঙ্গে করেছে ঝগড়া। ছেলেকে ডেকে বল্লে,—"হুঁসিয়ার থা'কব তা কর এসে যায় না। কিন্তু ও ব্যাটার চেলাগিরি করু দেখ্‌লে, ছেলেই হও আর যেই হও বাপু, দরকার হলে জান্ নিয়ে তবে ছাড়্‌বো। এখন বুঝে চল।" প্রহ্লাদ ডরাবার ছেলে নয়। হরি বলেই চেঁচাতে লাগ্‌লো। ফলে এই হ'ল যে, উল্টে বাপের জানটাই গেল।—তা' এ হ'ল পুরাণের প্রহ্লাদ। কেই বা দেখেছে। ব্যাখ্যা করে যা' একটু বুঝতে পার। যদি

সত্যিকার প্রহ্লাদ দেখ্‌বে, ত দেখ আমাদের বাংলা দেশে। শত শত ঘরে শত শত প্রহ্লাদ এসে হাজির হয়েছেন। তবে শত শত হিরণ্য-কশিপুও সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন কিনা, সে হিসাবটা জানা না থাক্‌লেও, একেবারেই যে ফিরছেন না, তা' কিন্তু হলপ্‌ করে বলা যায় না। ফলও হচ্ছে তেঁয়ি। নৃসিংহদেবের নখাঘাতে শতধা বিদীর্ণ না হলেও এতাদৃশ বংশদুলাল প্রহ্লাদকুলের আকস্মিক অন্তর্ধানে (পলায়নে?) বা বিবেক বৈরাগ্যের দাপটে যে অনেকে হিরণ্যকশিপু পিতাই শোকে, দুঃখে, ঋণদায়ে বা দুর্ভিক্ষের কবলে খুবই জর্জ্জরিত হচ্ছেন, তাতে আর সন্দেহ না'ই।

'হুজুগে' ধার্ম্মিকদের আবার রকমারি আছে। ঠাকুর বলেছেন, —কাম-কাঞ্চন ত্যাগ"। ধার্ম্মিকেরা তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ফস করে ধরে ফেল্লেন,—এ ত সোজা কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? বে' কর্ত্তে হবে না।"

ঠাকুর আবার বলছেন,—"কলিতে নারদীয়া ভক্তি।—ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে, তা সে বাপই হোক, আর যেই হোক্‌, তার কথা না শুনলে পাপ হয় না। তার সাক্ষী প্রহ্লাদ, ভরত, বিভীষণ।" ধার্ম্মিকেরা মাথা নেড়ে, বুঝ্‌লেন,—"এ ত আরো চমৎকার কথা। ধর্ম্মকার্যে বাধা? কারও কথা শুনবার দরকার না'ই।' তবে স্বামিজী মাঝখানে এসে গোল বাধিয়েছেন। বলছেন, 'কেবলদে তোর ভক্তি মুক্তি, ও ত মহাস্বার্থপরতা। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা। দেশ মহাতমঃতে ডুবে রয়েছে, একে টেনে তুলতে হবে। মহাবীর হতে হবে। দরিদ্র নারায়ণদের সেবায় প্রাণ মন ঢেলে দিতে হবে।'—হরি, হরি বলে এইবার সেরেছে! পশ্চাৎ কেও না ভায়া' পেছনে! তাকিয়ে দেখ, প্রহ্লাদের দল শূন্য, সব পালিয়েছে।

'হুজুগে' ধর্ম্মের আরও লক্ষণ আছে। যেই ধর্ম্ম এসে ঘাড়ে চাপ্‌লেন, শুনি দেখ্‌বে, ধার্ম্মিকেরা মাথায় তেল দেওয়া বন্ধ করছেন, খালি পা, জামা বা চাদর অদল বদলে গায়ে বিরাজ কচ্ছে। দেশে যে দিন পড়েছে, তাতে শরীর ধারণের জন্যে যে খাদ্য নেহাৎ দরকার, পনর

আনা লোকের ভাগ্যে তাও জুটছে না। ধার্ম্মিকেরা আবার তারই থেকে কমিয়ে কমিয়ে শাক, পাতা-চচ্চড়ির ব্যবস্থা কচ্ছেন, আর ব্রহ্মচর্য্য পালন কচ্ছেন। ফলও ব্যবস্থা মতই হচ্ছে—কঙ্কালসার দেহ, কোটরাগত চক্ষু, বিষাদময়, উৎসাহশূন্য মুখ, ফোক্‌লা দাঁতে কথা বলা। আবার মাঝে মাঝে যখন করুণস্বরে 'হা প্রভ' বলে আর্ত্তনাদ করে উঠেন, তখন হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেরই বলতে ইচ্ছা হয়,—'আহা, বেচারীর কি ব্যামো হয়েছে গা? অমন কচ্ছে কেন'।

এই হুজুগের আবার এম্নি আশ্চর্য্য শক্তি যে, যখন যে রংএ মেশাবে, তখন সেই রংএই মিশবে। এই হ'ল জ্ঞান, পরক্ষণেই ভক্তি তার পর আবার কর্ম্ম, না হয় হ'ল যোগ। কখন্ কখন্ একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানও উদয় হয়। গিরগিটীর তবু রং চেনা যায়, কিন্তু হুজুগের রং চেনবার যো'টি নেই। যখন যার পাল্লায় পড়েন, তখন তারই হয়ে যান।

ঠাকুরের একটি গৃহস্থভক্ত একদিন একটী যুবককে জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন,—"মানুষ যে কে, তা মানুষ জানে না। এ তুমি মানো কি না?" যুবকটি ভাল উত্তর দিতে পারেন নাই। তাই দেখে, ভক্তটি নিজেই বলেন,—"এই দেখ না, মানুষ বহুরূপী হয়ে বেড়াচ্ছে। মায়ের কাছে এক রকম, বাপের কাছে আর এক রকম, আত্মীয়দের কাছে এক রকম, আবার বন্ধুদের কাছে আর এক রকম। সারা দিন রাত্ কত রকমই না মানুষ হচ্ছে। এত যার রূপ, তার প্রকৃত রূপ কোন্‌টি? আর যদি প্রকৃত রূপটিই তার না জানে, তবে মানুষ কচ্ছে কি?" যুবকটি চুপ্ করে রইলেন। ভক্তটি বল্লেন,—"তবে উপায় কি? হাত, পা, নাক, মুখ—সব মানুষের একই রকম আছে, কিন্তু ভিতরের সত্তা পৃথক। ঐ সত্তাভেদেই ভিন্ন প্রকৃতি হয়। ভারত কখনো ঋষিশূন্য হয় নি। ভাগ্যক্রমে, ব্যাকুলতার জোরে এইরূপ কোন ঋষির সাক্ষাৎ পেলে তিনি দর্শন মাত্র তোমার সত্তা বলে দিতে পারেন। তখন তোমার পথ ধরে তুমি চলতে পার। নতুবা শুধু এটা ভাল, সেটা ভাল খুঁজে বেড়ালে কি হবে? ভাল ত কতই। তোমার পক্ষে কোন্‌টি ভাল, তা চাই না?"

হুজুগ ছেড়ে নিজকে চিন্‌বার চেষ্টা করা কি প্রত্যেক বুদ্ধিমান যুবকের কর্ত্তব্য নয় ?

কথা ত হ'ল ঢের। এখন চাই কি ?—উৎসব, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, প্রসাদ বিতরণ—সব বন্ধ করে দিতে হবে ? মঠ, মন্দির, সমাজ-ঘর, হরি-সভা ভেঙ্গে ফেল্‌তে হবে ? কুলগুরুদেব ত্যাগ কর্‌তে হবে ? ব্রত, নিয়ম, প্রতিষ্ঠা, পূজা, যাগ-যজ্ঞ তুলে দিতে হবে ? আচার নিষ্ঠার কি কোন মূল্য বা প্রয়োজন নাই ? যুবকগণ কি ধর্ম্মাধিকার হতে বঞ্চিত ? —এক কথায় সাফ্ জবাব এই দিতে চাই যে, যিনিই দেশের ধর্ম্মের দিকটা বেশ করে তলিয়ে চিন্তা করেছেন, তিনিই বলতে বাধ্য হবেন যে, না এর একটিও নষ্ট করতে হবে না। এর সবই সুন্দর, সবই পবিত্র, সবই উদার, সবই সত্য অর্থাৎ ধর্ম্মময়। কেবল এই কেন, যদি সত্যের জন্যে, প্রেমের প্রেরণায় যথার্থ ধর্ম্মানুরাগ কোন মহাপুরুষ দেশের প্রচলিত মতবাদগুলির সঙ্গে আরও কতকগুলির কখনো প্রতিষ্ঠা করেন, তবে সেগুলিও সত্য, সেগুলিও গ্রাহ্য হ'বে। কারণ সত্য শুধু নিজেই সত্য নন, তিনি যাঁকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হন, তিনিও তেম্নি সত্য, তেম্নি ধর্ম্মময় হয়ে থাকেন। আরও কথা এই যে, সত্য যিনি তিনি চির-স্বাধীন, তিনি কি কোন নির্দ্দিষ্ট মত বা পথকে ধরে থাকতে পারেন ? বিচার কল্লে তোমাকে মান্‌তেই হবে, হয় তিনি সকল মতবাদের অতীত, না হয় ত তিনি অনন্তরূপে অধিষ্ঠিত। ভেবে দেখ, এ দুই-ই এক। আর এক বলেই ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সত্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ক'রে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন,—"যত মত তত পথ"। তবে কিনা যদি কেও কাঁধে গামছা রেখে, পাড়াময় গামছা খোঁজে, এবং হল্লা করে অনর্থ ঘটায়, তবে সেটা যেমন একদিকে হাসির বিষয় হয়ে পড়ে, তেম্নি আবার অনুতাপের বিষয়ও হয় বটে। তাই ত এত আলোচনা।

প্রত্যাবর্ত্তন।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ)

রাজধানীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল—রাজকুমারকে পাওয়া যাইতেছে না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাজকুমার সমুদ্রতীরবর্ত্তী উদ্যানে তমালকুঞ্জের বেদীতে বসিয়া ধ্যান করিতেন। অদ্য প্রাতঃকালেও প্রহরী তাঁহাকে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। অনেক বেলা পর্য্যন্ত তিনি যখন প্রাসাদে ফিরিলেন না তখন তাঁহার খোঁজ আরম্ভ হইল। বেদীর উপর তাঁহাকে পাওয়া গেল না। উদ্যান তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, তিনি নাই। রাজধানীতে যে সকল পরিচিত বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে তাঁহার যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তিনি কোন বাড়ীতেই যান নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল তথাপি রাজকুমার ফিরিলেন না। রাজা প্রমাদ গণিলেন। রাণী মাথায় করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আচার্য্য যদুনন্দন এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি শৈশব হইতে পরম যত্নসহকারে রাজকুমারকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন। কুমারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর শ্রদ্ধা ও উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আচার্য্য তাঁহার নিকট অনেক আশা করিতেন। কুমারের আকস্মিক তিরোধানে তিনি পুত্র শোকাহতের ন্যায় কাতর হইলেন।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রতিবেশীরা দেখিল আচার্য্যের দ্বারদেশে বাহির হইতে তালা বন্ধ রহিয়াছে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন গেল, তথাপি আচার্য্যের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। লোকে ভাবিল, আচার্য্য বোধ হয় তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছেন।

আচার্য্য গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সংকল্প করিয়াছিলেন, যতদিন কুমারের উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না ততদিন তিনি গৃহে ফিরিবেন না। দুই বৎসর ধরিয়া তিনি কুমারের সন্ধানে নানা দেশ ঘুরিলেন,—কত নিবিড় অরণ্য ও বিজন মরুভূমি পার হইলেন, কত বিশালকায় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিলেন, কত নদনদী উত্তীর্ণ হইলেন, কোথাও কুমারের সংবাদ

পাইলেন না। একদিন সন্ধ্যাবেলা এক নূতন নগরে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যদেব শ্রান্তদেহে ধর্ম্মশালার অনুসন্ধান করিতেছিলেন এমন সময় দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার দিকে কে আসিতেছে। ঐ ব্যক্তি— কুমার নয় কি? আচার্য্য আরও অগ্রসর হইলেন। এ যে কুমার! কুমারও আচার্য্যকে চিনিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া আচার্য্যের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। আচার্য্য কুমারকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া গেল।

নগরে একটী ক্ষুদ্র গৃহে কুমার বাস করিতেন, কুমার আচার্য্যকে সেই গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া আচার্য্য কুমারের তিরোভাব বৃত্তান্ত জানিলেন। কুমার উদ্যান মধ্যে চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ একদল লোক আসিয়া তাঁহাকে বাধিয়া ফেলিল। উদ্যানের নিভৃত উপকূলে একটী ক্ষুদ্র তরণীর উপর তাহারা কুমারকে তুলিল এবং তরণী বাহিয়া গিয়া সমুদ্র মধ্যস্থ জাহাজে উঠিল। জলপথে বহু দিন এবং স্থলপথে কিছুদিন অতিক্রম করিয়া তাহারা এই নগরে উপস্থিত হইল। জাহাজে উঠিয়াই তাহারা কুমারের বন্ধন খুলিয়া দেয় এবং কুমারকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু কেন তাহারা কুমারকে ধরিয়া আনিয়াছে এবং কোথায় কুমারকে লইয়া যাইবে তাহা কিছুতেই বলে নাই। এখানে আসিয়া কুমার জানিতে পারিলেন কেন তাহাকে আনা হইয়াছে। এখানকার রাজার পুত্র নাই। কুমারের বংশমর্য্যাদায় প্রলুব্ধ হইয়া রাজা মনে করিয়াছিলেন কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। রাজা নীচকুলোদ্ভব বলিয়া তিনি কুমারের পিতার নিকট এ প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। এজন্য বল প্রয়োগ করিয়া কুমারকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। কুমার কিন্তু রাজার প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। রাজা যখন দেখিলেন, অনুনয় বিনয়ে কোন ফল হইল না, তখন কুমারের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে কুমারের বাসের জন্য একটী ক্ষুদ্র কুটীর দেওয়া হইয়াছে, রাজার আদেশে কুমারকে অতি হীন রকমের আহার ও পরিচ্ছদ দেওয়া হয়। নগরের মধ্যে কুমার যথেচ্ছ বেড়াইতে পারেন।

কিন্তু নগবেব বাহিবে তাঁহাব যাইবাব আদেশ নাই। কিন্তু কিছুতেই কুমাবেব সংকল্প বিচলিত হয় নাই।

আচার্য্য দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন,—যে কুমার রমণীয় রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিতেন, নানা সুস্বাদুভোজ্য আহার করিতেন, এখানে তাঁহাকে বন্দীর ন্যায় বাস করিতে হইতেছে, কদন্ন আহার করিতে হইতেছে, মলিনবেশ পরিধান করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহা ভাবিয়া আচার্য্যের আনন্দ ও গৌরবে হৃদয় স্ফীত হইল যেহেতু এত কষ্টেও কুমার ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই। তিনি দেখিলেন তাঁহার শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই কুমারের নিকট এইরূপ আচরণই তিনি আশা করিতেন।

আচার্য্য তাঁহার সহিত কয়েকটী মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ আনিয়াছিলেন তাহার সাহায্যে কুমারের শিক্ষায় অগ্রসর হইলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কুমারকে উপদেশ দিতেন,—শারীরিক দুঃখকষ্টে বিচলিত হইতে নাই, শরীর ক্ষণস্থায়ী, জীবন দুঃখবহুল,—এই শারীরিক দুঃখকষ্ট ছাড়াইয়া যে অনন্তকালস্থায়ী অমৃতলোক বিদ্যমান আছে তাহা লাভ করিতে যত্নবান হওয়াই মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য।

প্রত্যহ বৈকালে কুমার আচার্য্যের সহিত বেড়াইতে যাইতেন। একদিন আচার্য্যের শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ ছিল, আকাশের অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না, কুমার একাই ভ্রমণ করিতে গেলেন। ফিরিবার সময় পথিমধ্যে অকস্মাৎ প্রবলবেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। আশ্রয়ের জন্য কুমার পথিপার্শ্বস্থ একটি বাটীর বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্বামী কুমারকে দেখিতে পাইয়া গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন এবং কুমারকে সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া শুষ্কবস্ত্র পরাইলেন। গৃহস্বামীর নাম সার্ব্বাক। তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সার্ব্বাক তাঁহার স্ত্রীর সহিত কুমারের পরিচয় করাইয়া দিলেন। অনেকক্ষণ বৃষ্টি ছাড়িল না। সার্ব্বাক নানা বিষয়ে কুমারের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বাকের সৌজন্য, পাণ্ডিত্য, বাক্‌পটুতা ও তাঁহার স্ত্রীর অমায়িক ব্যবহারে কুমার চমৎকৃত হইলেন। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় কুমার সারাপথ এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

ক্রমে সার্ব্বাকের সহিত কুমারের আলাপ আরও ঘনিষ্ঠ হইল। সার্ব্বাক একদিন কুমারকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া নানাবিধ নবাবিষ্কৃত যন্ত্র দেখাইলেন। কোন যন্ত্রের সাহায্যে অতিক্ষুদ্র বস্তু অতিবৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর আকাশের গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। কোন যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের অবিকল প্রতিকৃতি কাগজের উপর অঙ্কিত হইয়া যায়। কুমার আরও জানিলেন যে ইঁহারা শীঘ্রই এরূপ যন্ত্র সকল আবিষ্কার করিবার আশা করেন যাহার সাহায্যে অশ্ব অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেগে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাওয়া যাইবে, নিমেষের মধ্যে শতক্রোশ ব্যবধানে সংবাদ পাঠাইতে পারা যাইবে। তাঁহারা ইহাও আশা করেন যে শীঘ্রই তাঁহারা আকাশে উড়িতে পারিবেন।

রাজার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কুমার যে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এজন্য সার্ব্বাক কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কিন্তু আচার্য্য যদুনন্দনের প্রাচীন আদর্শ সার্ব্বাকের ভাল বোধ হইল না। সার্ব্বাক কুমারকে বলিতেন, আচার্য্য তোমাকে যে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে তোমার মানসিক বৃত্তি সকলের বিকাশ লাভে বাধা উপস্থিত হইবে। এই দেখ না আমরা কেমন নূতন যন্ত্র, নূতন কৌশল সকল আবিষ্কার করিতেছি। ভগবান আমাদিগকে যে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন, এইরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হয়। আর তোমার আচার্য্য তোমাকে শিক্ষা দিতেছেন; মন স্থির করিয়া এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাক, কিছু দেখিও না, কোন বাহ্যবিষয় চিন্তা করিও না, সেই দুই হাজার বৎসর আগেকার লেখা প্রাচীন পুঁথি তোমাকে অভ্যাস করাইতেছেন। এ সকলই মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির অপব্যবহার। এই বিশাল বিচিত্র জগতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া, নিত্য নূতন সত্য ও কৌশল আবিষ্কার করিয়া জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য বাড়ান, ইহাই ত বুদ্ধির সদ্ব্যবহার।

কুমার একদিন আচার্য্যকে এই সকল নূতন যন্ত্রের কথা বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—কৈ আপনি ত আমাকে এ সকল কিছুই শিখাইতেছেন না? আচার্য্য কহিলেন, বৎস, শিখিবার বিষয় দুইটী আছে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। জীবন ধারণের জন্য বহির্জগতের জ্ঞান আবশ্যক, ঈশ্বর লাভ

করিবার পক্ষে অন্তর্জগতের জ্ঞান বিশেষ সহায়ক। বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশী আলোচনার দোষ এই যে এদিকে বেশী ঝোঁক হইলে ক্রমশঃ মানবের চিত্ত বিলাস ও বাহ্য সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধারণতঃই আমাদের মন ইন্দ্রিয় সুখে অনুরক্ত। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কার এই বহির্মুখী প্রবৃত্তিকে ইন্ধন যোগায়, তাহাতে চিত্ত ক্রমশঃ আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গিয়া পড়ে। আমি শুনিয়াছি এই সকল দেশের অধিকাংশ লোক ভোগসুখের চেষ্টাতেই চিরজীবন কাটাইয়া দেয়, এ জীবন যে অল্প দিনের জন্য এবং পরলোকে অক্ষয় সুখ লাভই যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ইহা তাহারা ভুলিয়া যায়। এজন্য ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং।

শঙ্করাচার্য্য তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

বিদ্যাহিকা ?—ব্রহ্মগতিপ্রদা যা।

আমাদের দেশে চিরকালই বাহ্যজগতের জ্ঞান অপেক্ষা অধ্যাত্ম বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধেও আমাদের বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি সকল গ্রন্থ ত সঙ্গে আনিতে পারি নাই। অতিশয় মূল্যবান কয়েকটী মাত্র গ্রন্থই আমি সঙ্গে আনিয়াছি। যে জ্ঞান সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, তোমাকে সেই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

আচার্য্য বুঝিলেন যে এ সকল কথায় কুমারের মন সরিল না। তিনি ক্রমশঃ কুমারের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। আহার ও পরিচ্ছদের অসুবিধার কথা আজকাল প্রায়ই কুমার উল্লেখ করেন। কুমারের একটী পিতৃদত্ত বহুমূল্য অঙ্গুরীয় ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কুমার একদিন মূল্যবান পরিচ্ছদ আসবাব প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন।

সার্ব্বাক একদিন কুমারকে বলিল, দেখ, তোমার আজ যে বিপদ হইয়াছে, আচার্য্যের শিক্ষাই তাহার কারণ। ভগবান মানুষকে চক্ষু দিয়াছেন, চক্ষু দিয়া মানুষ এই বিচিত্র জগৎ দেখিবে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তোমার আচার্য্য তোমাকে বলিলেন তুমি চক্ষু মুদিয়া সমুদ্রের

তীরে বসিয়া থাক। ফলে আমাদের সৈনিকেরা তোমাকে ধরিয়া আনিল। এখনও তোমার আচার্য্য তোমার উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিতেছেন না। সেই সকল পুরাতন বুজরুকি অভ্যাস করাইতেছেন। কেবল তোমাকে অতীতের কথাই বলিতেছেন। যাহা অতীত তাহা ত' আর ফিরিবে না। তাহার জন্য এত মাথা ঘামান কেন? আমার বোধ হয় তোমার বলা উচিত যে আমি আর আপনার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে চাহি না। ইহাতে তাঁহার মনে কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তোমার মনুষ্যত্ব রক্ষা করা তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি অপরে মনঃকষ্ট পায় তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই।

কিছুদিন হইতে কুমারের মন ও আচার্য্যের প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। কুমারের আজকাল বিলাস প্রিয় প্রবৃত্তি দেখিয়া আচার্য্য কুমারের জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। আহারে সংযম ও শুচিতা রক্ষা করিলে চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হইবে, বিলাসী লোকদের সাহচর্য্য বর্জ্জন করিলে কুমারের বিলাস প্রবৃত্তির হ্রাস পাইবে ইহাই আচার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি কুমারের ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ও সার্ব্বাকের গৃহে ভোজন করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কুমার ভাবিলেন আচার্য্য অযথা তাঁহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

একদিন কুমার আচার্য্যকে বলিলেন আপনি যে ভাবে আমাকে শিক্ষা দিতেছেন এ শিক্ষা আমার ভাল বোধ হইতেছে না।

আচার্য্য কহিলেন, এ শিক্ষার তুমি কি দোষ দেখিতেছ এবং কোন শিক্ষা তোমার ভাল মনে হয় বল। এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে।

কুমার কহিলেন, আপনি সেই প্রাচীন শাস্ত্রই আমাকে শিখাইতেছেন। যাহা অতীত যে অবস্থায় আর ফিরিয়া যাওয়া যাইবে না তাহাকে এত জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করা ভুল।

আচার্য্য কহিলেন অতীত যুগে ফিরিয়া যাইবার কোন কথা হইতেছে না। কথা এই যে প্রাচীন শাস্ত্রগুলি ভাল না খারাপ? যদি ভাল হয় তাহা হইলে সেই শাস্ত্র আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

কুমার কহিলেন, আমার এত সব বিধি ব্যবস্থা ভাল লাগে না। অমুক কাজ করিবে, অমুক কাজ করিবে না, অমুক জিনিষ খাইবে, অমুক জিনিষ খাইবে না, মানুষ কি একটা কল যে তাহাকে প্রত্যেক খুঁটি নাটি নিয়ম অনুসারে চালাইতে হইবে, তাহাকে এত বন্ধন দিয়া বাঁধিতে হইবে?

আচার্য্য কহিলেন, মানুষ কল নয় কিন্তু মানুষ স্বভাবতঃ প্রবৃত্তির দাস। সেই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ প্রায়ই নিজের 'শ্রেয়ঃ' পরিত্যাগ করিয়া 'প্রেয়' বরণ করে। প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ এই সকল নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মানবের শ্রেষ্ঠ অংশকে খর্ব্ব করা ইহাদের উদ্দেশ্য নহে এবং ইহারা করেও না। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সকল প্রকার বিলাস ত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনা দ্বারা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর নিয়ম করিয়া তাঁহারা কোন দুরভিসন্ধি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস্য নহে। শাস্ত্রের মর্য্যাদা স্বয়ং ভগবান কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।

কুমার কহিলেন, আমি এ সকল মানি না। আমি এক্ষণে বড় হইয়াছি। কি ভাল কি মন্দ তাহা নির্ণয় করিবার আমার ক্ষমতা হইয়াছে। এই প্রাচীন মতে শিক্ষা লাভ করা আমি ভাল মনে করি না। আপনার আর কষ্ট করিয়া আমাকে এই ভাবে শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব আপনার এখানে থাকা অনাবশ্যক।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আচার্য্য তাঁহার প্রাচীন গ্রন্থ কয়টি বাঁধিয়া লইলেন এবং ধীরে ধীরে কুমারের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আচার্য্য যাইবার সময় ভাবিলেন, 'এবার সত্যই কুমারকে হারাইলাম।

প্রথম প্রথম কুমারের খুব আনন্দেই সময় কাটিল। এখন তিনি যেমন ইচ্ছা বেশ করিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা খাইতে পারেন, যেমন খুসী জীবন

যাপন করিতে পারেন। কেহ আর তাঁহার জীবন প্রতিপদে বাঁধিয়া দিবে না, জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ মানিয়া তাঁহাকে আর চলিতে হইবে না। সার্ব্বাকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়া গেল। সার্ব্বাকের নিকট তিনি বিবিধ কাব্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করিলেন। ফলতঃ এক্ষণে কি আহার বিহারে, কি চিন্তা ও আদর্শে কুমার সর্ব্বাংশে সার্ব্বাকের অনুরূপ হইলেন। আচার্য্য কুমারের নিজস্ব প্রকৃতি রক্ষা করিবার জন্য এত যত্ন করিয়াছিলেন, সেই নিজস্ব প্রকৃতির চিহ্ন মাত্র রহিল না।

কুমারের পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া রাজা আশান্বিত হইলেন, এইবার কুমার রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে রাজি হইতে পারেন। কুমারের মত জানিবার জন্য তিনি একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন। কুমার সার্ব্বাকের সহিত পরামর্শ করিলেন। সার্ব্বাক বলিলেন,—আমি ত ইহাতে আপত্তির কোন কারণ দেখিতেছি না। রাজা ত এক্ষণে তোমাকে জোর করিতেছেন না সুতরাং তোমার আত্ম সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রাজকন্যাকে বিবাহ করিলে তোমার প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, মূল্যবান বেশ ভূষা, দাস দাসী, ঐশ্বর্য্য সকলই হইবে,—একদিন এ দেশের রাজাও হইতে পার। ঐশ্বর্য্য, সুখ ভোগ ও প্রভুত্বই ত জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং তুমি আর কোন ইতস্ততঃ করিও না। রাজাকে জানাও যে তোমার মত আছে।

যথাসময়ে রাজার নিকট সংবাদ পৌঁছিল। রাজা নিরতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। রাজকন্যার শুভবিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল।

আজ কুমারের বিবাহ। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গের সময় কুমার শুনিতে পাইলেন রাজপ্রসাদ হইতে সানাইয়ের ধ্বনি প্রভাত-বায়ুতে ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ মিষ্টধ্বনি কুমারের কর্ণে আজ বিসদৃশ শুনাইল কেন? কুমারের মনে হইল সানাই যেন করুণ সুরে বলিতেছে,—দাসত্ব, অন্তরের দাসত্ব, চিরকালের জন্য দাসত্ব,—ঐশ্বর্য্যের লোভে, ভোগসুখের লোভে চিরদিনের মত হৃদয় বিক্রয় করা হইল। পিতার বহুদিনের আশা আজ বিফল হইতে চলিল, আচার্য্যের আজন্ম সাধনা আজ ব্যর্থ

হইতে চলিল। সানাই যেন এই কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার তাহাকে বলিতে লাগিল। কুমার আর ঘরের মধ্যে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, গৃহ হইতে বাহির হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে সে যদি কোনরূপে জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়। আর কি উদ্ধারের কোন উপায় নাই? আজ তুমি কোথায় আচার্য্যদেব? একবার আসিয়া দেখ তোমার প্রিয়শিষ্য আজ ব্যাকুলভাবে তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে তুমি ভিন্ন কে আর তাহাকে এই বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার করিবে?

অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে কুমার নগরের এক নির্জ্জন পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। এধারে তিনি পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই। এক বিস্তৃত মাঠ, মাঠের পর ঘনবিন্যস্ত তরুশ্রেণী। রৌদ্র কিছু প্রখর হইয়াছিল। শীতল স্থানে উপবেশন করিবেন বলিয়া তিনি তরুশ্রেণী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তরুশ্রেণীর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র কুটির। কুটিরের সম্মুখে পরিষ্কার প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ, চারিদিকে জুঁই, বেলা, প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কুমারের মনে হইল সকল ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে তিনি যদি আজ এইরূপ একটি শান্তিপূর্ণ কুটিরে আশ্রয় পাইতেন। এমন সময় কুটিরের দ্বার খুলিয়া কে বাহিরে আসিলেন। এ কি! কুমার ত স্বপ্ন দেখিতেছেন না? এ যে তাঁহার আচার্য্যদেব! সেই চন্দনচর্চ্চিত প্রশস্ত ললাট, মস্তকের পশ্চাতে সেই স্থূল শিখাগুচ্ছ, সেই ধীর প্রসন্ন ঈষৎ করুণ দৃষ্টি। না, এত ভুল হইবার নয়।

আর একবার কুমার আচার্য্যের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলেন। কুমারকে সাদরে তুলিয়া আচার্য্য কহিলেন, বৎস, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছি।

পরিশিষ্ট।

কুমার হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় রাজা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি যাহাকে তাহাকে সন্দেহ করিয়া নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ রাজার অত্যাচারে পূর্ব্ব হইতেই চঞ্চল ছিল, এক্ষণে তাহারা বিদ্রোহী

হইল। রাজা নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। বিদ্রোহী প্রজাগণ সার্ব্বাককে তাহাদের নেতা নির্ব্বাচন করিল। সার্ব্বাক শাসনদণ্ড গ্রহণ করিল। রাজ্যে অশান্তি মিটিবার পর কুমার আচার্য্যের সহিত সার্ব্বাকের নিকট উপস্থিত হইলেন। কুমারের গৃহ ফিরিবার ইচ্ছা জানিয়া সার্ব্বাক বহু উপহার দিয়া কুমারকে বিদায় দিলেন।

দীর্ঘকাল পরে কুমার পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শঙ্কা)—আচ্ছা, এই যুক্তি অনুসারেই যোগিগণ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রতি যথোচিত ভাবে মুদিতা ভাবনা করিয়া, পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ত ?

(সমাধান)—(যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে বলি—) তাঁহারা প্রবৃত্ত হউন না কেন। যাহারা মৈত্র্যাদির দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করেন তাঁহারাই ত যোগী।

মৈত্র্যাদি চতুষ্টয় উপলক্ষণমাত্র। (অর্থাৎ তজ্জাতীয় আরও অনেক বস্তুর বোধক)। গীতার (ষোড়শাধ্যায়োক্ত), সেই চারিটি, অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি প্রভৃতি দৈবীসম্পদকে এবং (ত্রয়োদশাধ্যায়োক্ত) অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, প্রভৃতি জ্ঞানের সাধন সমূহকে, এবং জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, প্রভৃতি অবস্থার নির্ণায়ক শ্লোক সহ প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে উদ্ধৃতম্

যে সকল ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করিয়া সূচনা করিতেছে, কেননা ইহাদিগের দ্বারা (শাস্ত্রবিহিত শুভফলদায়ক কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ) শুভবাসনা এবং (শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ ফলদায়ক কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ) অশুভ বাসনা, যে সকল বাসনাকে মলিন বলা হইয়াছে, সকলেই বিদূরিত হয়।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, শুভ বাসনা ও অনন্ত, এক ব্যক্তির দ্বারা তাহাদিগের সকলগুলির অভ্যাস করা অসম্ভব। সেই হেতু সেই সকল শুভ বাসনা অভ্যাস করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা ত নিরর্থক।

(সমাধান)—না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, উক্ত শুভ বাসনা সমূহ যে সকল অশুভ বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে, তাহাও অনন্ত, এবং তাহাদের সকলগুলি একই মনুষ্যে থাকা অসম্ভব। যথা আয়ুর্ব্বেদে যত প্রকার ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহাদের সকল গুলিই ত একই মনুষ্যের পক্ষে সেবন করা সম্ভবপর হয় না। আর সেই সকল ঔষধ দ্বারা যে সকল রোগ বিনষ্ট হয় তাহা একই ব্যক্তির দেহে থাকিতেও পারে না। তাহা হইলে প্রথমে নিজের চিত্তকে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে যতগুলি মলিনবাসনা পরিলক্ষিত হইবে, তখন, তাহাদের বিরোধী (উচ্ছেদক) ততগুলি শুভবাসনার অভ্যাস করিতে হইবে। যেমন কেহ, পুত্রমিত্র কলত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, তাহাদের প্রতি বৈরাগ্য বশতঃ, সেই পীড়ার ঔষধ স্বরূপ, সংন্যাস গ্রহণ করে, সেইরূপ, বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলাচারমদ প্রভৃতি মলিন বাসনার দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া লোকে তাহাদের উচ্ছেদক—বিবেক অভ্যাস করিবে। জনক সেই বিবেক বর্ণনা করিয়াছেন:—বাসিষ্ঠ রামায়ণ, উপশমে প্রকরণ, ৯ম অধ্যায়

অস্থ যে মহতাং মূর্দ্ধ্নি তে দিনৈ নিপতন্ত্যধঃ।

হন্ত চিত্ত মহত্তায়াঃ কৈষা বিশ্বস্ততা তব॥ *

আজ যাহাদিগের স্থান মহদ্ব্যক্তিদিগের মস্তকের উপর, কয়েকদিন

* মূলের পাঠ এইরূপ—"হতচিত্ত মহত্তায়াং কৈষা বিশ্বস্ততা তব"—রে পোড়া মন, রাজ্যাদিবৈভবোৎকর্ষে, হায় তোর (এইরূপ) বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকার।

মধ্যেই তাহাদের অধঃপতন হইবে। হায় চিত্ত, মহত্ত্বার (রাজ্যাদি বৈভবোৎকর্ষের) প্রতি তোমার এই বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকার।

ক ধনানি মহীপানাং ব্রহ্মণঃ ক জগন্তি বা,

প্রাক্তনানি প্রযাতানি, কেয়ং বিশ্বস্ততা তব *। ২৩

(ব্রহ্মার—পূর্ব্ববর্ত্তী হিরণ্যগর্ভের।

তোমার এ বিশ্বস্ততা—আমি মরিব না এইরূপ বিশ্বাস।)

মহীপতিদিগের ধন (রাশি আজ) কোথায়? ব্রহ্মার যে জগৎবৃন্দ পূর্ব্বে ছিল, তাহারাই বা কোথায় গিয়াছে? (হে চিত্ত) তোমার এ বিশ্বস্ততা কি প্রকার?

কোটয়ো ব্রহ্মণো যাতা গতাঃ সর্গপরম্পরাঃ

প্রযাতাঃ পাংসুবদ্ভূপাঃ কাধৃতির্মম জীবিতে। † ২৪

কোটি কোটি ব্রহ্মা চলিয়া গিয়াছে, কত সৃষ্টিরাজি চলিয়া গিয়াছে, কত মহীপাল ধূলির ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। আমার এই জীবনের উপর আস্থা কি প্রকার—

য়েষাং নিমেষণোন্মেষৌ জগতাং প্রলয়োদয়ৌ

তাদৃশাঃ পুরুষা নষ্টা মাদৃশাং গণনৈব কা॥ ‡

[মূলের পাঠানুসারে অর্থ এই প্রকার—

(আভাস) আচ্ছা জনক, তুমি ত রাজা, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি সকলকেই স্ববশে রাখিতে পার, তোমার এপ্রকার অবিশ্বাসের কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন যাদের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হয় সেইরূপ পুরুষগণ থাকিতে আমার ন্যায় (ক্ষুদ্র জীব) ত গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না।]

যাঁহাদের চক্ষুর নিমীলন উন্মীলনে জগৎসমূহের প্রলয় ও উদয় (সৃষ্টি) হয় সেইরূপ পুরুষগণও বিলুপ্ত হইয়াছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের আবার গণনা কি। ইতি।

* মূলের পাঠ—'তব' স্থলে 'মম'।

† মূলের পাঠ—"ব্রহ্মণাং কোটয়ো"।

‡ মূলের পাঠ—"যেষাং নিমেষণোন্মেষৈঃ", ও তাদৃশাঃ পুরুষাঃ 'সন্তি'।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, এইরূপ বিবেক ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্ব্বে উদিত হয়, কেননা, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি সাধন ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। আর আপনার এই গ্রন্থে যাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, তাঁহারই পক্ষে জীবন্মুক্তি লাভের জন্য বাসনাক্ষয় প্রভৃতি সাধনের বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। অতএব অকস্মাৎ এই নৃত্যের কারণ কি? (অর্থাৎ এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উত্থাপনের হেতু কি?)

(সমাধান)—ইহাতে দোষ হয় না। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইবার পরেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ,—এই সুসিদ্ধ রাজপথেই জনসাধারণে চলিয়া থাকে আর জনকের যে অকস্মাৎ সিদ্ধগীতা * শ্রবণমাত্রেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা প্রভূত পুণ্যফলে আকাশ হইতে ফল পতনের ন্যায়। তাহার পর চিত্তের বিশ্রামলাভের জন্য (জনক) এইরূপ বিবেকাভ্যাস করিলেন। সুতরাং অকস্মাৎ অনবসর-নৃত্য হয় নাই, উপযুক্ত সময়েই হইয়াছে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা এইরূপ হইলেও, এই বিবেক ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। তখন মলিনবাসনার অনুক্রম বা প্রবাহ নিবৃত্ত হওয়ায় শুদ্ধ বাসনাভ্যাসেরও ত প্রয়োজন নাই,—

(সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, জনকে সেই মলিন-বাসনার প্রবাহ বা অনুক্রম নিবৃত্ত হইলেও, যাজ্ঞবল্ক্য, ভগীরথ প্রভৃতিতে সেই মলিন-বাসনার প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার প্রতিবাদী উষস্ত কহোল প্রভৃতির প্রভূত বিদ্যামদ রহিয়াছে, (দেখা যায়), কেননা, তাঁহারা সকলেই (পরস্পরকে তর্কে) পরাজয় করিবার নিমিত্ত কথায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দেখা যায়।† যদি বল তাঁহাদের যে বিদ্যা ছিল তাহা ব্রহ্মবিদ্যা নহে, তাহা অন্য কোনও বিদ্যা, তবে বলি, তাহা বলিতে পারনা, কেননা, কথা প্রসঙ্গে যে সকল প্রশ্ন ও উত্তর করা

* বসিষ্ঠ রামায়ণের উপশম প্রকরণে ৮ম অধ্যায়ের ৯ হইতে ১৮ সংখ্যক শ্লোক সিদ্ধগীতা নামে অভিহিত হয়।

† বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ, ৫ম।

হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বল, তাঁহাদেব প্রশ্নোত্তর ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক হইলেও, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান বাস্তবতঃ ব্রহ্মজ্ঞান মাত্র, তাহা সম্যগ্ জ্ঞান নহে, তবে তদুত্তরে বলি, একপ বলিতে পাবা যায় না, কেননা তাহা হইলে তাঁহাদের বাক্য হইতে আমাদিগেরও (ইদানিন্তনদিগেরও) যে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে তাহাকেও অসম্যগ্ জ্ঞান বলিতে হয়। যদি বল, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান সম্যগ্জ্ঞান হইলেও, তাহা পবোক্ষজ্ঞান মাত্র, তদুত্তরে বলি, তাহা বলিতে পার না, কেন না, দেখা যাইতেছে যে মুখ্য অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়েই বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হইয়াছে যথা:—(বৃহদা উপ ৩।৪।১) (যাজ্ঞবল্ক্যোহি হোবাচ) 'যৎ সাক্ষাদ-পরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ ইতি)" তিনি সম্বোধন পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর সর্ব্বদেহেব অভ্যন্তরস্থ আত্মা তাঁহার স্বরূপ আমার নিকট ব্যাখ্যা কব।

যদি বল পূজ্যপাদ শঙ্কবাচয্য আত্মজ্ঞানীব বিদ্যামদ থাকে একথা স্বীকার কবেন না, কেননা তাঁহার "উপদেশ সাহস্রী" নামক গ্রন্থে আছে—(প্রকাশ প্রকরণ, ১৩)

"ব্রহ্মবিত্ত্বং তথা মুক্ত্বা স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ * ।"

এবং "আমি ব্রহ্মবিৎ" এইরূপ অভিমান যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আত্মজ্ঞ, অন্য কেহ নহে।

আব, 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে'ও আছে—

ন চাধ্যাত্মাভিমানোঽপি বিদুষোঽস্ত্যাসুরত্বতঃ

বিদুষোঽপ্যাসুরশ্চেৎস্যান্নিষ্ফলং ব্রহ্মদর্শনম্ ॥† (প্রথমাধ্যায়, ৭৫ শ্লোক)

---

* এই শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ—"যো বেদালুপ্ত দৃষ্টিত্বমাত্মনো ঽকর্ত্তৃতাং তথা,"। রামতীর্থ পদ যোজনিকা ব্যাখ্যায়—এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যিনি, "আমি ব্রহ্মবিৎ" এইরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, আপনাকে বেদবর্ণিত কেবলমাত্র আত্মাকে চেতন-রূপে দ্রষ্টা বলিয়া এবং অকর্ত্তা বলিয়া জানেন তিনিই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ; যিনি 'আমি ব্রহ্মবিৎ' বলিয়া অভিমানের লেশমাত্র রাখিয়াছেন তিনি ব্রহ্মবিৎ নহেন।

† এই শ্লোকের অবতরণিকায় সুরেশ্বরাচার্য্য বলিতেছেন—

তত্ত্বজ্ঞানীর অধ্যাত্মাভিমান (তত্ত্বজ্ঞান জনিত অভিমান)ও নাই, কেননা তাহা অসুর যোগ্য মোহজনিত, (গীতায় বর্ণিত আসুরী সম্পদের অর্থাৎ দর্প ও অভিমানেরই অন্তর্ভূত)। তত্ত্বজ্ঞানীরও যদি আসুরভাব থাকে তবে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল বলিতে হয়।

তদুত্তরে আমরা বলি না ইহা দোষ নহে কেননা উদ্ধৃত স্থলে, যে তত্ত্বজ্ঞান (পরিপাক লাভ করিয়া) জীবন্মুক্তি প্রদান করে, এবং তাহাতেই পর্য্যবসিত হয় সেই জীবন্মুক্তি লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল কথা বলা হইয়াছে। আর আমরাও জীবন্মুক্ত পুরুষে বিদ্যামদ থাকে একথা স্বীকার করি না।

"স্যাদ্বিবিধাত্মাভিমানাদিতি চেন্নৈবম্। যস্মাৎ"। টীকাকার জ্ঞানোত্তম ব্যাখ্যা করিতেছেন—"আচ্ছা জীব ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হইলেও, 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি ক্ষত্রিয়' এইরূপে জাতি প্রভৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ শরীরের অভিমান হইতে ত ভেদের (ভেদজ্ঞানের) সম্ভাবনা হইতে পারে, এবং তাহা হইলে (সেই ভেদজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য) অধিকারী ব্যবস্থানুসারে কর্ম্মব্যবস্থাও করিতে হয়"—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না কেননা, বিদ্বানের অর্থাৎ তত্ত্ববিদের অধ্যাত্মাভিমান অর্থাৎ শরীরাদির অভিমান নাই, কেননা তাহা অসুরোচিত মোহজনিত বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং দেহাদি বিষয়ক অভিমানের নিবৃত্তির জন্য অধিকারী ব্যাবস্থার কথা ত দূরের কথা। তাহা হইলে দেহাদি বিষয়ক অভিমান সিদ্ধির জন্য জ্ঞানীতেও মোহ থাকে একথা স্বীকার করিতে হয়। এই হেতু বলিতেছেন—"তাহা হইলে বলিতে হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানকে বিদূরিত করিতে পারে না, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তত্ত্বজ্ঞানীতে মোহ থাকিতেই পারে না"—সুতরাং বিদ্যামদ প্রসঙ্গে এই প্রমাণটি এস্থলে অসংলগ্ন হওয়াতে, বোধ হয়, মুনিবর বিদ্যারণ্য কর্তৃক ইহা সংযোজিত হয় নাই।

সমালোচনা।

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস এম, এ।)

এ বৎসরের "প্রবাসী"র ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় "সর্ব্বব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদ, স্পিনোজা ও শঙ্কর" নামক ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে স্পিনোজার সর্ব্বব্রহ্মবাদ ও আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ এই দুইটী দার্শনিক মতের তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্করের মতের মধ্যে কয়েকটী বিরোধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রবন্ধ-শেষে—"আর ব্রহ্ম। যে জীব তাঁহা হইতেই আসিয়াছে সেই জীবের মধ্যে তাঁর স্থান নাই, তাহা হইতে তিনি চিরবিচ্ছিন্ন। জীবত্ব যখন কাটিল তখন তো কেবল ব্রহ্ম। আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম—মধ্য একটা বিকট স্বপ্ন। স্বপ্নের মায়াফল ভক্ষণ জনিত বদ্‌হজ্‌মি। মায়া কি? ... চুপ্"—এই কয়েকটী বিদ্রূপাত্মক কথায় মায়াবাদের উপর কটাক্ষ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

ধীরেন্দ্রবাবু মায়াবাদে যে কয়েকটী আপত্তিজনক যুক্তি উত্থাপন করিয়া বিরোধ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন আমরা এক হিসাবে তাঁহার সেই উত্তম প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচনা করি। তাহার কারণ এই যে, আচার্য্য শঙ্কর যে মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে যতপ্রকার যুক্তি মানুষের মনে স্বভাবতঃই প্রবল হইয়া উঠে, সেই সকল, সত্যানুসন্ধিৎসা প্রণোদিত হইয়া নির্ভীকভাবে আলোচনা করা সত্য পথের প্রত্যেক পথিকেরই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক এপ্রকার আলোচনা মাসিক পত্রাদির ভিতর দিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট যত প্রকাশিত হয় মায়াবাদের সত্যাসত্য বুঝিবার পথ ততই সহজ হইয়া উঠে।

অবশ্য এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল, কেবল যুক্তির (conceptual thinking) উপর দাঁড়াইয়া যে বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দ্বারা যে মায়াবাদ সত্য কি অসত্য তাহা চিরকালের জন্য নিশ্চিত

রূপে স্থির হইয়া সকল বিবাদের অবসানে তাহা সত্য বলিয়া ঘোষিত অথবা অসত্যের দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমায় কলঙ্কিত হইয়া দর্শন ও সাধন জগতে চিরদিনের জন্য হেয় বলিয়া গণ্য হইবে, সে আশা করিয়া এই প্রবন্ধে ধীরেন্দ্রবাবুর যুক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি না। তবে বিচার দ্বারা এক পক্ষ প্রবল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া গেলে সেই মতই যে ঠিক এইরূপ একটা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (intellectual conviction) হইতে পারে,—ইহা যাঁহারা যথার্থ বিচারপ্রিয় তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং, মায়াবাদের সপক্ষে অথবা বিপক্ষেই হউক, এইরূপ নিরপেক্ষ যুক্তিমূলক আলোচনা দ্বারা একটা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানলাভ হইবে—এই আশায়ই বর্ত্তমান আলোচনার অবতারণা।

ধীরেন্দ্রবাবু মায়াবাদে যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিতে গেলে প্রথমেই এই একটা মস্ত গোল উপস্থিত হয় যে, তিনি মায়াবাদে যে সকল কথা শঙ্করের সিদ্ধান্ত বলিয়া দেখাইতেছেন তাহা বা তন্মূলক কথা আচার্য্য কোন্ গ্রন্থে কোন্ স্থানে বলিয়াছেন তাহা প্রবন্ধের মধ্যে অথবা পাদ-টিপ্পণীতে উল্লেখ করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা আদৌ করেন নাই। কাজেই তাঁহার যুক্তির যৌক্তিকতা বিবেচনা করিতে গেলে দারুণ অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই অসুবিধার নমুনা স্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধ হইতে দুই একটী জায়গা নিম্নে উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি—

১। "তাঁহার (অর্থাৎ শঙ্করের) এক বহুর স্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মে ভেদ বা বহুত্বের স্থান নাই"—এই কথাগুলি খুব সম্ভব ধীরেন্দ্র বাবু শঙ্করের সিদ্ধান্ত * বলিয়া ধরিয়া লইয়া পরে অন্যান্য কথাগুলি বলিয়াছেন। কিন্তু 'এক বহুর স্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়' এই কথার মূল

---

* এই বহুস্পর্শে একের নষ্ট হওয়াটা বাস্তবিক (really) নষ্ট হওয়া—ইহাই ধীরেন্দ্রবাবুর অর্থ নয় কি? যদি এই অর্থে তিনি কথাগুলিকে শঙ্কর-সিদ্ধান্ত না ধরেন তবে 'ব্রহ্মে ভেদ বা বহুত্বের স্থান নাই' এই কথাদ্বারা দোষ দেখান কাহার?

অথবা এই রকমের অর্থ আসে এমন ভাবের কথা শঙ্করের কোন্ গ্রন্থে কোথায় আছে তাহার উল্লেখ না করিয়া কোন রকম প্রত্যুত্তরের অবসর রাখেন নাই।

২। "ইহা (অর্থাৎ শঙ্কর-মতে যে একত্ব) বহুকে অস্বীকার করিয়া বহুর বাহিরে এক কল্পিত একত্ব"—এই কয়েকটী কথাতেও আগের মতই গোলমাল দেখা যায়।

'বহুকে অস্বীকার' এই কথা বলাতেই যখন শঙ্কর মতের বিরুদ্ধে সব আপত্তি উঠিতেছে, তখন সেই বহুকে শঙ্কর কি অর্থে অস্বীকার করিয়াছেন, অথবা বন্ধ্যার ছেলের মত একেবারেই অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন কি না, তাহা গ্রন্থ প্রমাণ সহিত পরিষ্কারভাবে না বলিয়া মোটামুটী একটা ভাসা-ভাসা রকমে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—"বহুর বাহিরে এক কল্পিত একত্ব"।

যাহা হউক আর দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া আসল কথায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ধীরেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"এই মায়া কি পদার্থ তার ব্যাখ্যা নাই, এবং ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া এই মায়া বা অবিদ্যাস্পর্শে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইয়াছে।"

এই কথাগুলির অর্থ আমরা যাহা বুঝিতে পারিলাম তাহা এই—মায়াবাদে ব্রহ্ম বাস্তবিক পক্ষে যদি অদ্বৈত হন, তবে তাহার অতিরিক্ত মায়া বলিয়া যে কোন রকমের একটা কিছু থাকিলেই ত আবার দ্বৈতের কথাই আসিয়া পড়িল। তবে ব্রহ্ম অদ্বৈত বলিয়া মানা যায় কিরূপে?

বোধহয় এইরূপ একটা কিছু অভিপ্রায় করিয়াই ধীরেন্দ্রবাবু আবার বলিতেছেন,—"সুতরাং জগৎকারণের একত্ব, অনন্তত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব সকলই ব্যাহত হইতেছে।"

আমরা কিন্তু এই স্থলে ধীরেন্দ্র বাবুর যুক্তির সারবত্তা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

মায়াবাদী যখন রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত ধরিয়া ব্রহ্ম ও জগতের

বিচার করিতে বসেন, তখন সেই দৃষ্টান্ত কতদূর সঙ্গত বা সেই ভ্রমস্থলটীকে দৃষ্টান্তরূপে প্রয়োগ করিবার কতটা যৌক্তিকতা আছে (অর্থাৎ সেই analogyর কতটা strength এবং কতদূর তাহার scope বা প্রসার) —সেই যথার্থ বিচারের স্থানে তিনি যখন কোন আপত্তি উঠান নাই তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে ধীরেন্দ্রবাবু সেই দৃষ্টান্ত মানিয়া লইয়া আপত্তি করিতেছেন। কাজেই সেই দৃষ্টান্তটী পরিষ্কার করিলেই তাহার উক্ত আপত্তি কতদূর সঙ্গত তাহা বুঝা যাইবে।

এক খণ্ড রজ্জুকে যখন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তখন সেই সর্প একটা কিছু জিনিষ বলিয়াই আমাদের জ্ঞানে ভাসমান হয় এবং সেই ভাসমান সর্প যখন রজ্জু নয় তখন অবশ্য রজ্জু হইতে অতিরিক্ত একটা কিছু বলিয়াই ভ্রম হয়। অথচ রজ্জুর অতিরিক্ত সর্প বলিয়া যখন ভ্রম, তখন তাই বলিয়াই কি রজ্জুর রজ্জুত্ব বাস্তবিক পক্ষে (really) ব্যাহত হইয়া পড়ে বা সত্য সত্যই রজ্জু ছাড়া সর্প বলিয়া একটা দ্বিতীয় পদার্থ চিরকালের জন্য রজ্জুর পাশে খাড়া হইয়া উঠে?

অবশ্য ধীরেন্দ্র বাবু যদি বলেন যে—তিনি যখন বলিতেছেন, 'অবিদ্যা বা মায়াস্পর্শে শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইতেছে'—তখন অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হওয়া মানে বাস্তব (reality) ব্যাহত হওয়া নয়, কেবল জ্ঞানে সাময়িক একটা গোলমাল হওয়া,—তবে মায়াবাদীর তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে, অবিদ্যা বা মায়াস্পর্শে অদ্বৈত ব্রহ্ম বাধ্য হইয়া তাঁহার অদ্বৈতত্ব ত্যাগ করিয়া প্রকৃত পক্ষে (অর্থাৎ চিরকালের জন্য, সাময়িক নয়) আবার দ্বৈত হইয়া পড়েন তবেই মায়াবাদী তাহা অস্বীকার করিবেন।

এইরূপ অস্বীকার করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে মায়াবাদী বলিবেন যে, সামান্য একটা রজ্জু যা' জড় অর্থাৎ নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না—তাহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইলেই যখন সেই আরোপিত সর্প রজ্জুর রজ্জুত্বের ক্ষতি করিতে পারিতেছে না দেখিতেছি, তখন চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম—যিনি স্বয়ং প্রকাশ হইয়া নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাতে ভ্রমকল্পিত যে জগৎ সে কেমন করিয়া তাঁহার

অদ্বৈততত্ত্বের নাশ বা ক্ষতি করিবে? ধীরেন্দ্রবাবু অবিদ্যাস্পর্শে শুদ্ধাদ্বৈতে অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাহতত্ব দেখাইতে যাইয়া এত বেশী ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি আচার্য্য শঙ্করের একটা মোটা কথা—যাহার উপর সমস্ত মায়াবাদ দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে—অদ্বৈতবাদের সেই মহা প্রতিজ্ঞাটী (grand postulate) মোটেই লক্ষ্য করেন নাই।

আচার্য্য শঙ্কর সত্য ব্রহ্মেতে জগৎ অধ্যস্ত বা কল্পিত বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, যে বস্তুতে যাহার অধ্যাস বা আরোপ হয় সেই বস্তু তাহার গুণের বা দোষের দ্বারা অনুমাত্রও সম্বন্ধ (অর্থাৎ real বাস্তব) হয় না *।

এইরূপ গীতার ভাষ্য করিতে যাইয়াও একস্থলে তিনি বলিতেছেন,—† "মিথ্যা জ্ঞান পরমার্থ বস্তুকে দূষিত করিতে সমর্থ নয়। মরু-মরীচিকার জল যেরূপ তদ্‌গত স্নেহের দ্বারা ঊষর দেশকে পঙ্কীকৃত করিতে পারে না সেইরূপ অবিদ্যা বা মায়াও ক্ষেত্রজ্ঞের (অর্থাৎ অসংসারী পরমেশ্বরের বা ব্রহ্মের) কিছুই (অর্থাৎ বাস্তবিক) করিতে পারে না।"

ইহার কিছু পূর্ব্বেই আবার আচার্য্য বলিয়া আসিয়াছেন,—‡ "অবিদ্যা কর্ত্তৃক অধ্যস্ত ধর্ম্মের দ্বারা লোকে কাহারও উপকার কিংবা অপকার দৃষ্ট হয় নাই।" অতএব ধীরেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বের ঐ সকল কথায় আচার্য্য শঙ্কর কেন স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, অবিদ্যা বা মায়াস্পর্শে শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইতেছে?

আসল কথাটা এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধীরেন্দ্রবাবুর মত প্রতিবাদীরা—কল্পিত বস্তুর দ্বারা অকল্পিত বস্তু কলুষিত হইতেছে—ইহা না দেখাইতে

---

* আচার্য্যের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের অধ্যাস ভাষ্য—

"যত্র যদধ্যাস স্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অনুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে"।

† গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায় "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য।

‡ "ন হি কশ্চিদপি লোকে অবিদ্যাধ্যস্তেন ধর্ম্মেণ কস্যচিদুপাকরোঽপকারো বা দৃষ্টঃ।"

পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শঙ্করের পারমার্থিক অকল্পিত ব্রহ্মবস্তুর অদ্বৈতত্বকে অপারমার্থিক কল্পিত মায়াস্পর্শে ব্যাহত করিতে যাওয়া কি নেহাৎএকটা জোরজবরদস্তির ব্যাপার নয়?

ধীরেন্দ্রবাবু মায়াবাদে একটা বিরোধ তুলিতে গিয়া বলিতেছেন—"একদিকে জগৎ-ব্যাখ্যায় ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হইতেছে, অন্য দিকে এই কিছু অবোধ্য (irrational), সুতরাং জগৎ কারণের একত্ব, অনন্তত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব সকলই ব্যাহত হইতেছে।"

আমরা তাঁহার এই কথাগুলির যা অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই—'অদ্বৈত ব্রহ্ম' ত মায়াবাদীর আছেনই, তা ছাড়া জগৎটা কোথা হইতে আসিল বা কেন আসিল এই রকমের একটা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মায়াবাদী যখন মায়া বলিয়া একটা কিছুকে টানিয়া আনেন—অথচ এই মায়া বা একটা কিছুকে যখন ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলেন না, তখন কাজেই, এই একটা কিছু বা মায়া ব্রহ্মের অতিরিক্ত হইয়া ব্রহ্মের (যিনি অদ্বৈত) পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যায়। সুতরাং, তখন ব্রহ্ম অদ্বৈত না থাকিয়া দুই হইয়া পড়েন এবং তাঁহার অতিরিক্ত একটা মায়া পদার্থ দাঁড়াইয়া দুইজনের মধ্যে ব্যবধানের একটা সীমা রেখা টানিয়া অনন্ত ব্রহ্মকে শান্ত করিয়া দেয়। আর তা ছাড়া মায়া বলিয়া জ্ঞেয় জড় একটা কিছু ব্রহ্মের অতিরিক্ত হইয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপও হইতে পারেন না।

এই যদি ধীরেন্দ্রবাবুর কথার অর্থ হয়—তবে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমরা মায়াবাদীর একটা সোজা কথা বলিয়া লইতে চাই। কথাটা এই,—মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক (real) বাস্তব অকল্পিত সত্যবস্তু, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত অথচ ঠিক তাঁহারই মত পারমার্থিক বাস্তব অকল্পিত আর কোন বস্তু হইতে পারে না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় কল্পিত বস্তু হইতে পারে।

এই রকমের কল্পিত মায়া—রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের জায়গায় সর্প যেমন ভাবে দ্বিতীয় অতিরিক্ত (অথচ রজ্জুর মত অতটা সত্য নয়) বস্তু—অনেকটা সেই রকমের অতিরিক্ত দ্বিতীয় একটা কিছু। কিন্তু তা

বলিয়াই ব্রহ্মের মত পারমার্থিক (ultimately real) একটা দ্বিতীয় কিছু হইতে যাইবে কেন ?

এই কথাটাই সংক্ষেপে বলিতে গিয়া মায়াবাদী বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—অর্থাৎ অদ্বিতীয় পারমার্থিক (ultimately real) সত্য ব্রহ্ম এবং জগৎ ব্রহ্মেতে কল্পিত বলিয়া মিথ্যা (অর্থাৎ apparent or dependent reality)

এখন ধীরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি যখন বলিতেছেন যে, মায়াটা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া ব্রহ্মের একত্ব ইত্যাদি ব্যাহত হইতেছে—তখন ব্যাহত কথাটার অর্থ কি এই যে, চিরকালের জন্য বাস্তবিক পারমার্থিক ভাবেই (really) দুইটী বস্তু এবং ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর একটা কিছু দাঁড়াইয়া (অথচ যে একটা কিছু মায়াকে মায়াবাদী কল্পিত বলেন) ব্রহ্মের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া অনন্ত তাঁহাকে শান্ত করিয়া দিতেছে, অথবা রজ্জুতে যেমন সেই সময়ের জন্য রজ্জুর অতিরিক্ত আর একটা সর্প বলিয়া কিছু ভাসে সেই রকমের কিছু কালের জন্য মায়া বলিয়া একটা দ্বিতীয় কিছু ব্রহ্মের অতিরিক্ত হইয়া ব্রহ্মকে অনন্ত ইত্যাদি থাকিতে দিবে না ?

যদি 'একত্বাদি ব্যাহত হইতেছে' এই কথাগুলির দ্বিতীয় অর্থ—ধীরেন্দ্রবাবুর অভিপ্রেত হয় তবে মায়াবাদীর তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই এবং তাহা স্বীকার করার দরুণ তাঁহার মতে কোন বিরোধও উপস্থিত হইবে না—যেহেতু, তিনি ব্রহ্মের একত্বাদি বাস্তব বা পারমার্থিক (ultimately real) অর্থেই বলিয়া থাকেন।

আর যদি প্রথম অর্থই ধীরেন্দ্রবাবুর অভিপ্রেত হয় তবে মায়াবাদী বলিবেন যে রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্তের বেলায় কল্পিত সর্প যেমন চিরকালের জন্য বাস্তবিক এক অতিরিক্ত পদার্থ হইয়া খাড়া হইতে বা চিরকালের জন্য রজ্জু ও সর্পের মাঝখানে সীমা রেখা সূচক একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, সেই রকম ব্রহ্মে কল্পিত মায়া চিরকালের জন্য পারমার্থিক (ultimately real) একটা দ্বিতীয় পদার্থ এবং সেইজন্য ব্রহ্মের সীমা নির্দ্দেশক একটা পদার্থ হইয়া অনন্ত ব্রহ্মকে শান্ত করিয়া দিবে এমন কথা বাধ্য হইয়া মায়াবাদীকে বলিতে হইবে কেন ?

তিন রকমে বস্তু সান্ত হয়—যেমন দেশ, কাল, এবং তুল্য সত্তাযুক্ত অতিরিক্ত বস্তুর দ্বারা। ইহার একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ—আকাশের কথা বলা যাইতে পারে। দেশতঃ আকাশ অনন্ত—যেহেতু দেশের দ্বারা আকাশের বাস্তবিক পরিচ্ছেদ হয় না (অর্থাৎ বলা যায় না যে আকাশ এইটুকু বা এই পর্য্যন্ত)।

এই সকল কথার সোজা অর্থ এই যে, যে বস্তুর দ্বারা অন্য বস্তুকে সান্ত বলিতে হয় সেই বস্তু সেই বস্তু হইতে বাস্তবিক (really) ভিন্ন একটা পদার্থ হওয়া চাই। সেই ভিন্ন বস্তু হইতে যে বস্তুকে সান্ত বলা যায় সেই বস্তুর বুদ্ধি বিনিবর্ত্তিত হইলেই সেই ভিন্ন বস্তুটী যাকে সান্ত বলিতেছি তাহার অন্ত হইবে। মোট কথা এই যে, যে একটা কিছুকে ধরিয়া কোন বস্তুকে সান্ত বলিতে হইবে সেই একটা কিছু বাস্তব (real) একটা কিছু হওয়া চাই। তাহা হইলেই সেই বস্তুটি বাস্তবিক (really) সান্ত হইবে, নচেৎ নয়। কাজেই মায়া যখন কল্পিত বস্তু অর্থাৎ বাস্তবিক (real) একটা কিছু নয় বলিয়া মায়াবাদী বলিতেছেন—অথচ সেই কথার বিরুদ্ধে ধীরেন্দ্র বাবু যখন কিছু বলিতেছেন না—তখন কেন এই কল্পিত একটা কিছু মায়ার জন্য অদ্বৈত ব্রহ্ম বাস্তবিক দুই এবং বাস্তবিক (really) সান্ত হইবেন? এই কথাটাই আচার্য্য শঙ্কর অতি পরিষ্কার করিয়া তাঁহার তৈত্তিরীয়োপনিষদ ভাষ্যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদে মায়াকে ধরিয়া ধীরেন্দ্রবাবু যে প্রধান দুইটী দোষ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—আমরা তাঁহারই যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার অন্যান্য দোষগুলি সেই রকমের সাংঘাতিক নয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাই না।

তবে প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বিচার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। তিনি মায়াবাদ দার্শনিক ভাবে বিচার করিতে গিয়া অনেক কথা এরূপ আল্‌গা-আল্‌গা ভাবে (loosely) ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাঁহার আপত্তির অর্থই ভাল বুঝা যায় না বলিয়া উত্তর দেওয়া বড় কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া এই রকমের একটা ভাবগম্ভীর দর্শনের

মত আলোচনা করিতে গিয়া বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সেইভাবে গ্রন্থ প্রমাণ সহ দার্শনিকভাবে না লিখিয়া শঙ্করের মায়াবাদের প্রতি কতটা সুবিচার করিয়াছেন তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়! সে যাহা হউক তাঁহার মত চিন্তাশীল লেখকের নিকট হইতে আমরা আরও ভালরকমের খাঁটী বিচার আশা করি বলিয়াই সেই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই কয়েকটি কথা বলিয়া রাখিলাম।

মনুসংহিতা—দেবনাগর অক্ষরে ৺কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কৃত চিরপ্রভা ঠিকার বঙ্গানুবাদ সহ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় লিখিত সংস্কৃত ভাষায় ভূমিকা সহ—কলিকাতা ১৩নং লক্ষ্মীদত্ত লেনস্থ শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিচিত্র ভারতীয় সমাজের আদি গুরু গ্রন্থ হিন্দুমাত্ররই পাঠ্য। মূল্য ২৸০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ঋষিয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে শ্রীমাখনলাল তোড় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে এই পাঁচালীখানি রচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা জনসাধারণে প্রভুর সমন্বয় ভাব প্রচারে সাহায্য হইবে। মূল্য।০ আনা মাত্র।

গান্ধী না অরবিন্দ! (প্রতিবাদ)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তিকা—মূল্য ৵০ আনা।

নিরুপদ্রব অসহযোগীতা ও মহাত্মা গান্ধী—নীরববন্ধু প্রণীত। মূল্য /১৫ পয়সা।

চরকা শিল্প শিক্ষা প্রণালী—শ্রীমতী কুমুদিনী সিংহ প্রণীত—প্রকাশক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন। ১০৯ নং অপার সারকুলার রোড কলিকাতা। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ইহাতে সহজে চরকা শিখিবার উপায় বর্ণিত আছে। এই পুস্তিকা পাঠে অনেকেই এই কার্য্যে উৎসাহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

উপাসনা—৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত কর্ত্তৃক রচিত দেবদেবীর গান।

"লক্ষ্মীনিবাস" ১ নং লক্ষ্মীদত্ত লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অকাজের কাজ—শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত। বর্ত্তমান ভাবোপযোগী গল্প পুস্তিকা। প্রকাশক—শ্রীসত্যরঞ্জন বসু—ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল সিনডিকেট, ১১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—মূল্য দুই আনা।

গাঁয়ের কথা—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য দুই আনা। প্রাপ্তি স্থান পূর্ব্ব। প্রাচীন পল্লীসমাজের সুখচ্ছবি লেখক বর্ত্তমান পল্লী সমাজের সহিত তুলিত করিয়া তাহার যথার্থ কঙ্কাল স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন। "তোমার ক্ষেত্রে ফসল নেই, মাঠে গরু নেই, তোমার নদী নালায় জল নেই, তোমার চার কোটী ভাই 'লাঙ্গলা-চাষা' তারা আজ নিরন্ন উলঙ্গ হয়ে বসে আছে—আশা উৎসাহ নেই, আহা বলবার কেউ নেই, ভাগ্য-বিড়ম্বনার কাছে হার মেনে সকল জ্বালার অবসান করছে। কেউ বা সয়তানীর নূতন নূতন পথ খুঁজে খুঁজে সমাজের গায়ে দুষ্ট-ব্রণের মত শুধু অস্বস্তি আর যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে।"

এক্ষণে এই মৃত্যুর করাল কবল হইতে মাতা জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার মত উপযুক্ত কর্ম্মী কে?—"কর্ম্ম জীবনের মধ্যে মৃত্যুর অধিকার নাই এ বিশ্বাস যাহার আছে।" "মর জগতে অমর" সেবক তিনিই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষসত্য মৃত্যুকে কি করিয়া, কাহাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ তুচ্ছ করিবে তাহা লেখক দেখাইতে ভুলিয়াছেন। সেই অবলম্বন আমাদের পরমাত্মীয় পরম প্রেমাস্পদ আত্মা।

পল্লী স্বরাজ—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত—প্রাপ্তি স্থান পূর্ব্ব। এই পুস্তিকায় গ্রাম ও সমাজ-জীবন, কৃষকের অধিকার, প্রজাতন্ত্রের নূতন দিক, আমাদের নীরব প্রজাতন্ত্র, নূতন সংস্কার, শিল্প-জীবনে নূতন আদর্শ, কলকারখানা, সমূহ-তন্ত্র (communalism) অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর পরস্পরের সদ্ভাবের ও সমবায়ে প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের কল্যাণ বিধানের দ্বারা যে শিল্পপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করা, ধর্ম্মগোলা, পল্লীভাণ্ডার, গাঁতি বা একযোগে কৃষিকর্ম্মের নিমিত্ত কৃষকগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিতে গঠিত করা, গৃহ শিল্প বা ছোট

কারখানা, সাধারণ ইলেকট্রিক ঘর, গ্রাম্য পাটের কল, গ্রাম্য স্বায়ত্ত কর-স্থাপন, টাকা জমাইবার টিকিট, পঞ্চায়েতের আশা, কথকতা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অতি সুচারুরূপে বুঝাইয়াছেন। আদর্শ পল্লীজীবন পরিনতির জন্য পল্লী পরিষদের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। ইহার কর্ত্তব্য বিভাগ,—"(ক) গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি জীবন নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করণ, (খ) স্বাস্থ্য রক্ষা, (গ) শিক্ষা (কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়), (ঘ) ধর্ম্ম (যাত্রা, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি) (ঙ) বিচার (গ্রাম্য বিচারসমূহের নিষ্পত্তি), (চ) বন জঙ্গল পরিষ্কার এবং জল সরবরাহ, (ছ) মনুষ্য এবং গোমহিষাদির জীবন বীমা, (জ) জল সেচন, বাধ রক্ষা ও নির্ম্মাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদনদী সংস্কার, রাস্তা নির্ম্মাণ, (ঝ) ক্রয় বিক্রয়, বাণিজ্য; শস্য গোলা রক্ষা, মূলধন সংগ্রহ, এবং (ঞ) আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া, ব্যায়াম। এইরূপ সমবায় কর্ম্মজীবনের পরিণতিতে নবযুগের আবির্ভাব করিবে। মূল্য দুই আনা।

দারিদ্রের আহ্বান—(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান পূর্ব্ব। ইহাতে ভারতের ভয়াবহ মৃত্যু সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার আলোচিত হইয়াছে। মূল্য দুই আনা।

মহিলাশিক্ষা গোষ্ঠী।

অনুষ্ঠান পত্র।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

দরিদ্র মাতৃভূমিতে অর্থাভাবে কি গবর্ণমেণ্ট এবং কি দেশনেতৃগণ কেহই অন্নজল স্বাস্থ্য প্রভৃতি আশু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিরও অভাব মোচনে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহাদের আন্দোলন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করা সময়ের অপব্যয় মাত্র। অথচ আবার এদিকে জনসাধারণের ও কুলললনাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগরিত করিবার পূর্ব্বেও অন্নজল ও স্বাস্থের অভাব কোনও প্রকারেই দূর হইতে পারে না। এক্ষেত্রে উপায় কি?—

উপায় যত স্বাভাবিক উপায়ে ও অনাড়ম্বরে পারা যায় সকলকে শিক্ষিত করিয়া লইবার চেষ্টা করা। উৎসাহী ত্যাগী দেশসেবক কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে অতি অল্পমাত্র ব্যয়েই জনসাধারণকে শিক্ষিত করা অসম্ভব নহে বটে কিন্তু কুলললনাগণের অবস্থা ভিন্নরূপ। দেশে অবরোধ প্রথা আছে। সে কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজে অল্পব্যয়ে শিক্ষা বিস্তার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সত্যই অসম্ভব—যে ভাবে বিষয়টা আমরা ভাবিয়া আসিতেছি সে ভাবে ভাবিতে থাকিলে সত্যই অসম্ভব। আবার এই অসম্ভবই সম্ভব হয় যদি আমরা নূতন ভাবে ভাবিতে—নূতন চোখে বিষয়টাকে দেখিতে পারি। আমরা যদি ঐ অবরোধবাসিনাগণের উপর নির্ভর করিতে —তাঁহাদের বিশ্বাস করিয়া এই ভারটা তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি। এই উদ্দেশেই মহিলাশিক্ষা গোষ্ঠির প্রস্তাব লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি। আমার বক্তব্য এই যে মায়েদের সামান্যা জ্ঞান করিবেন না। শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা যে কর্ত্তব্য বোধ জাগাইতে হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি সেটা তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াই আছে। সেইটাকে উদ্দীপনা করুন—অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই করিয়া—লইবেন।

গোষ্ঠী অর্থে—Club। ইহারই স্থাপনার দ্বারা তাঁহাদের অন্তঃপুর মধ্যেই একত্রিত হইবার জন্য আহ্বান করা হউক—সেখানে শিক্ষিতা জাগা মেয়েদেরই মুখে দেশের সমাজের পৃথিবীর সংবাদ শুনিতে থাকিলে শীঘ্রই তাঁহারা জাগিয়া উঠিবেন। অশ্রদ্ধাতেই তাঁহাদের মন মরিয়া গিয়াছে। মেয়েদের মধ্যে যাহারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন তাঁহারা যদি শ্রদ্ধার সহিত আপনাদের স্বাধীন চিন্তার অংশ দিতে পারেন তাহা লইলে গৃহীতার মনও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিবে। তখন শীঘ্রই আপন আপন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নূতন নূতন পথ আবিষ্কারে বিদ্যার্থীনীরা নিজেই চেষ্টা আরম্ভ করিবেন। তারপর বাড়ীর পুরুষদের উৎসাহে যদি তাঁহারা বঞ্চিতা না হন, তবে দরিদ্রের হীন আয়োজনের মধ্যেই এই দরিদ্র দেশে বাঙ্গালার নারী-শক্তি গঠিত হইয়া যাইবে। নীরব গোপন কার্য্যই পরিণামে বিপুল ফল প্রসব করিবে।

সংবাদ।

১। কলিকাতা রামকৃষ্ণমিশন ছাত্র নিবাসের ১৯২০ সালের কার্য্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। ইহার আরম্ভ ক্ষুদ্র হইলেও ব্রহ্মচারী অনাদি চৈতন্যের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সৎ চেষ্টায় ইহা শীঘ্রই একটি বালকগণেব চরিত্রগঠনের আদর্শ স্থান হইবে সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট আশা করিতে পারি। যাঁহারা ইহার বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১১৯।১ করপোরেসন ষ্ট্রীট কলিকাতায় পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। গত বর্ষে সাধারণ ছাত্র ছাড়া সাতটি গরিব ছাত্রের ভরন-পোষণ ও শিক্ষার ভার লওয়া হইয়াছিল—আর্থিক উন্নতির সহিত আরও দরিদ্রছাত্রেব ভবন-পোষণ ও শিক্ষাব ভার লওয়া হইবে।

২। মহীশূর রাজ্যেব অন্তঃপাতী বাঙ্গালোব নগরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্র-নিবাসেব ১৯১৯—২০ পর্য্যন্ত কার্য্যবিবরণী আমরা পাঠ করিয়া বিশেষ অশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গাব মহাশয়ের কার্য্য-তৎপরতায় ইহারও বিস্তৃতি আমবা শীঘ্র আশা কবিতে পারি।

৩। কটক রামকৃষ্ণ সেবকসম্প্রদায়েব দশম বর্ষেব কার্য্যবিবণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

৪। চণ্ডিপুর (মেদিনীপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও মঠেব ১৯২০ সালেব কার্য্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

৫। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ (প্রেসিডেণ্ট) এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ (ভাইস প্রেসিডেণ্ট) বিগত অক্ষয়তৃতীয়ায় মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র নিবাসেব গৃহ প্রবেশ কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের নিবেদন।

আসাম কুলিগণের সাহায্য।

বিগত ১৯২০ সালে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও বন্যা পীড়িত জনগণের সাহায্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সাধারণের নিকট হইতে মোট

২৩৯৪৫৷৶১৫ পাইয়াছিল। সহৃদয় দাতাগণের কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রদত্ত সাহায্য যেন মেদিনীপুর জেলায় ব্যয়িত হয়।

ঐ টাকার মধ্যে ১৪৬০৪৶০ গত বৎসর পুরী জেলায় কানাস্‌ গারিসাগোদা ও ভুবনেশ্বরে, কটক জেলার জেনাপুরে এবং মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল ও তমলুকে দুর্ভিক্ষ ও বন্যা পীড়িত লোকদিগের সাহায্যকল্পে ব্যয় করা হয় এবং স্থির থাকে যে, অবশিষ্ট ৯৩৫১৷১৫ টাকায় গত চৈত্র ও বৈশাখে মেদিনীপুর জেলায় দরিদ্র চাষীদিগকে বীজধান ক্রয় করিয়া দিয়া সাহায্য করা হইবে। কিন্তু তমলুক প্রভৃতি স্থানে ঐ সময়ে অনুসন্ধান পূর্ব্বক দেখা গিয়াছে যে চাষীরা তাহাদের প্রয়োজন মত বীজ ধান্য ইতিপূর্ব্বেই যোগাড় করিয়া লইয়াছে এবং তাহাদিগকে ঐরূপ সাহায্য করিবার এখন আর কোনও প্রয়োজন নাই। মেদিনীপুর জেলাতেই ঐ টাকা ভবিষ্যতে অন্য কোন জনহিতকর কার্য্যে আবশ্যক মত ব্যয় করা যাইবে এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিতে না করিতেই আসামের চা বাগানের কুলীদের সমূহ অভাব ও দুরবস্থার কথা এবং খুলনা জেলার দারুণ অন্নকষ্টের সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক কর্তৃপক্ষদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সেইজন্য ঐ টাকা এই সকল কার্য্যে ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাদিগের হস্তে ঐ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা মিশনের উক্ত সংকল্প নিশ্চয় অনুমোদন করিবেন এইরূপ ভাবিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া গোয়ালন্দ ও চাঁদপুরে সেবক পাঠাইয়া উক্ত টাকা হইতে দুর্দ্দশাপন্ন কুলীদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইতিমধ্যে ৪৫০ জন কুলীকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া গোয়ালন্দ হইতে নৈহাটীতে পাঠান হইয়াছে। চাঁদপুরেও কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—সবিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।